নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

সুকন্যা

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা-৯

NAPOLEON BONAPARTE
by
Sukanya



প্রথম করুণা সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৫৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রাকর
এইচ. পি. রায় এ্যাণ্ড কোম্পানী
৭৩/এ, আমহার্স্ট রো
কলকাতা-৯

নিবেদন

'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। ইতিপূর্বে প্রকাশিত দু'টি সংস্করণে তথ্যগত সামান্য ভুল ছিল। এবার সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও জানানো দরকার। আমার আর যে-কটি বই আছে (নূরজাহান, ক্লিওপেট্রা, কুমারী রাণী এলিজাবেথ), সেগুলি যথার্থ ইতিহাস, না উপন্যাস—এই নিয়ে কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আমার একটিমাত্র উত্তর—ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রই আমার অবলম্বন। নীরস ইতিবৃত্তি সরলভাবে বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোথাও ঐতিহাসিক তথ্য ও চরিত্র বিকৃত করি নি। কতদূর সফল হয়েছি, তা বিচার করবেন পাঠক-পাঠিকা।

সুকন্যা



Emperor of the French

"…I am not only the soldiers' Emperor; I am the Emperor of the workers and peasants…I am the man of the people…"

লেখিকার অন্যান্য বই—

খড়ির লিখন

বৈশাখী বসন্ত

নূরজাহান

ক্লিওপেট্রা

কুমারী রাণী এলিজাবেথ

পৃথিবী যাহার নাম

আলোর ঠিকানা নেই

সমুদ্রদ্বীপ আন্দামান

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট



রোমের রাজা-নেপোলিয়নের বড়ো সাধের



জোসেফাইন—যাঁর রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও বুদ্ধিদীপ্ত
সৌজন্যে নেপোলিয়ন মুগ্ধ ছিলেন

কর্সিকার মেয়ে ল্যাটিজিয়া রোমালিও। প্রতিদিনের মতো সেদিনও গেছেন গির্জায় ভার্জিন মা মেরীর কাছে প্রার্থনা জানাতে। মনের মধ্যে তখন কত বাসনা, কত ইচ্ছা। হঠাৎ সৃষ্টির ব্যথায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন ল্যাটিজিয়া। অজাতশিশু তার আগমনবার্তা ঘোষণা করছে মায়ের সর্বদেহে, প্রতি লোমকূপে। ল্যাটিজিয়া বাড়ি আসবার জন্য ব্যস্ত হলেন। গির্জা থেকে বেশি দূর নয়। মাত্র মিনিট খানেকের পথ। ল্যাটিজিয়া বাড়ি এলেন। কিন্তু দোতলায় নিজের শোবার ঘরে যাবার সময় পেলেন না। একতলায় একটা সোফার ওপর বেদনাহত গা এলিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে, তখনো দুপুর হতে বাকি, ল্যাটিজিয়ার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। পুত্রসন্তান। নবজাতকের মাথায় জড়ানো রয়েছে মায়ের গর্ভস্থ ঝিল্লী। একটু অস্বাভাবিক, তবে কর্সিকার লোকেদের বিশ্বাস, নবজাতকের দেহে এমনটি নাকি ভালো, সৌভাগ্যের চিহ্ন।

ছেলেটি বলতে গেলে ভার্জিন মেরীর দোর ধরা ছেলে। যিনি ব্যাপটাইজ করতে এলেন, তিনি তো বলেই ফেললেন, "ছেলের নামের সঙ্গে নিশ্চয়ই 'মেরী' কথাটা থাকবে, বিশেষ করে বাপের নাম যখন চার্লস মেরী বোনাপার্ট··· !"

মা-বাবা কিন্তু ছেলের নামের সঙ্গে "মেরী" শব্দটা যোগ করতে চাইলেন না। ছেলের নাম ওরকম মেয়েলি হলে চলে! বিশেষ করে যে যুগে বাচ্চাটি জন্মেছে! যে ছেলেকে কিনা গর্ভে বহন করে ল্যাটি-জিয়া যোদ্ধা স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটে উঠেছেন পাহাড়ের চুড়োয়, দুর্গে! কানের পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে গেছে শত্রুপক্ষের গুলির ঝাঁক!

"না না, ও সব নরম মেয়ে-মেয়ে নাম নয়। আমার ছেলের নাম থাক নেপোলিয়ন। আমার কাকার নামে নাম। মনে নেই, আমার সেই কাকা কত বড় বীর ছিলেন! ফরাসীদের সঙ্গে কত লড়াই করেছেন···!"

চার্লস (কার্লো) বোনাপার্ট মৃদু হেসে কাকার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কী সুন্দরী তাঁর স্ত্রী ল্যাটিজিয়া ! শরীরটা ছোট্ট, হাল্কা, মাত্র পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। গায়ের রং মোমের মতো সাদা কোমল লাবণ্যে মাখা। দুটি গভীর বাদামী চোখ, টানা তীক্ষ্ণ নাক, মাথায় একরাশ বাদামী চুল, লম্বা চিবুক, হাসিতে মুক্তোর ঝিলিক, ব্যবহারে, ভাবে ভঙ্গীতে লজ্জাশীলা…। মাত্র পাঁচ বছর হল চার্লস ল্যাটিজিয়ার বিয়ে হয়েছে। ল্যাটিজিয়ার বয়স তখন চৌদ্দ, চার্লস-এর বয়স আঠারো। চার্লস দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, ইটালীর পিসা ইউনিভারসিটির ছাত্র, পাঠ্য বিষয় ছিল আইন…।

"ঠিক আছে, ছেলের নাম নেপোলিয়নই থাক, আমারও খুব পছন্দ"…চার্লস স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

সে বছরটা ছিল ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ। নেপোলিয়নের জন্ম তারিখ ১৫ই অগাস্ট।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন ল্যাটিজিয়া-চার্লসের দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম সন্তানের নাম জোসেফ বোনাপার্ট।

এরপর একে একে আরও কয়েকটি সন্তান এসেছে ল্যাটিজিয়ার কোলে। কর্সিকার মেয়েরা বহু-সন্তানবতী হওয়া চরম গর্বের বিষয় মনে করত। মায়েদের বহু সন্তান না হলে কার্সিকাকে বাঁচাবে কারা ! স্বদেশের বিপদে কারা হাল ধরবে ! জনসংখ্যা বাড়াতে হবে বৈকি !

ফ্রান্স থেকে প্রায় এক শ মাইল দুরে ইটালীর পশ্চিমে আর সার্ডিনিয়ার উত্তরে ভূমধ্যসাগরে কার্সিকা দ্বীপ। চারিদিকে সমুদ্রের ঢেউ খেলানো নীল জল, তার মাঝে পাহাড়-পর্বতে ঢাকা চিরহরিৎ কর্সিকা দ্বীপ। দ্বীপটির প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে পাইন, বাদাম আর জলপাই গাছ। আর প্রচুর আঙুর লতা। সব মিলিয়ে ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়।

কিন্তু কর্সিকার জীবনে শান্তি নেই। শান্তি থাকবে কি করে ! সে কি স্বাধীন ! কর্সিকা প্রথমে ছিল জেনোয়ার অধীন। জেনোয়ার অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে কর্সিকাকে মুক্ত করবার জন্য কত না

লড়াই করতে হয়েছে স্বদেশভক্ত নেতা পাসকেল পায়োলীকে। শেষ পর্যন্ত পায়োলী কর্সিকাকে জেনোয়া সরকারের হাত থেকে অনেকটা মুক্ত করেছিলেন। পায়োলীর সব কাজে শিষ্য ছিলেন চার্লস বোনাপার্ট। কর্সিকার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন যখন প্রায় সফল, ঠিক সেই মুহূর্তে পায়োলী খবর পেলেন, জেনোয়া সরকার নাকি কর্সিকাকে ফ্রান্সের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করেছে। ফ্রান্সের তদানীন্তন সম্রাট পঞ্চদশ লুইয়ের সঙ্গে সেই মর্মে একটা চুক্তিও নাকি হয়ে গেছে। চুক্তি হয়েছে ভার্সাই প্রাসাদে, ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মে।

যেমন চুক্তি তেমনি কাজ। ফরাসী সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে কর্সিকা দ্বীপের অধিকার নেবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। তোড়-জোড় চলল কর্সিকাতেও। উজ্জ্বল চক্ষু, আঁটোসাঁটো কর্সিকাবাসীরা অত বিনয়ের ধার ধারে না। তারা উত্তেজিত হল। বিদেশী শক্তির কাছে তারা কিছুতেই মাথা নোয়াবে না, মাথা নোয়াতে দেবেন না তাদের নেতা পায়োলী, পায়োলীর সঙ্গী চার্লস বোনাপার্ট। পায়োলী দৃপ্ত কণ্ঠে সমবেত কর্সিকাবাসীদের আহ্বান জানালেন—"বিদেশীর হাত থেকে আমাদের স্বদেশভূমিকে রক্ষা করতে হবে। হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু…।"

১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাস। কয়েকটি ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ এগিয়ে এল কর্সিকার অন্তর্গত ব্যাস্টিয়াতে। পায়োলীর সুদক্ষ নেতৃত্ব সেদিন ফরাসী সেনাবাহিনীকে হঠে যেতে বাধ্য করল। প্রায় পাঁচ শ'র মতো ফরাসী সৈন্য কর্সিকার যোদ্ধাদের হাতে বন্দী হল। পরাজিত সেনাপতি নভেসিল লজ্জায় অপমানে পদত্যাগ করলেন। তবে ফরাসীরা ছেড়ে কথা বলল না। পরের বছর আরও বেশী সংখ্যায় সেনাবাহিনী নামল কর্সিকা উপকূলে। পায়োলী আর চার্লস আবার তৈরী হলেন। ল্যাটিজিয়ার গর্ভে তখন নেপোলিয়ন। কোলে শিশু জোসেফ। পায়োলীর আহ্বানে চার্লস যখন রোটোণ্ডো পাহাড়ের শীর্ষে এক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন, ল্যাটিজিয়াও সঙ্গে গেলেন। মনে মনে স্মরণ করলেন ভার্জিন মা মেরীকে। গর্ভস্থ সন্তানের যেন

কোন অমঙ্গল না হয়, মা মেরীর আশীর্বাদে সে যেন ভালোভাবে সুস্থ দেহে পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়।

কর্সিকাবাসীরা এবারও দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ যুদ্ধ করল ফরাসী সেনাবাহিনীর সঙ্গে। তবে এবার আর ওদের আটকানো গেল না। কর্সিকার যোদ্ধাদের তুলনায় ফরাসী সৈন্যের সংখ্যা অনেক—অনেক গুণ বেশী। বীরত্ব দেখাবার, প্রাণ বিসর্জন দেবারও তো একটা সীমা আছে। পায়োলী শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করলেন। ফরাসী কর্তৃপক্ষ শান্তি স্থাপন করতে রাজী হল, কথা দিল কর্সিকার কারোর ওপর কোন অত্যাচার হবে না, তবে পায়োলীকে যেতে হবে ইংল্যাণ্ডে, সেখানে তাঁকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হবে। পায়োলীর দিক থেকে ইংল্যাণ্ডে যেতে কোন আপত্তি ছিল না। জেনারেল পায়োলী তাঁর কিছু সঙ্গীসাথীকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজে উঠলেন। চার্লস আর ল্যাটিজিয়া ভারাক্রান্ত মনে বিদায় জানালেন তাঁদের প্রিয় নেতা ও বন্ধুকে। কর্সিকার মাটি থেকে উপড়ে নেওয়া হল কর্সিকার জাতীয় পতাকা। তার বদলে সেখানে উড়তে লাগল সাদা লিলিফুল আঁকা নীল রঙের পতাকা, ফরাসী পতাকা।

পায়োলীকে বিদায় জানিয়ে চার্লস আর ল্যাটিজিয়া ফিরে এলেন আজাক্‌চিও-তে, আর সেখানেও মাত্র কিছুদিনের মধ্যে, নির্দিষ্ট মুহূর্তের কয়েক দিন আগে ভূমিষ্ঠ হলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। কর্সিকানরা উচ্চারণ করত নাবুলিওন।

বাচ্চাটি কিন্তু তেমন স্বাস্থ্যবান নয়। কেমন রুগ্ন, শুকনো চেহারা। ল্যাটিজিয়ার মন খারাপ। নিজের বুকভরা দুধ ঢেলেও ছেলের চেহারা ভাল হচ্ছে না দেখে ল্যাটিজিয়া একটি স্বাস্থ্যবতী ধাই রেখে দিলেন। ধাইটির দুটি বাচ্চা মারা গেছে, সুতরাং তার বুক তখনও শিশুর উপযুক্ত পেয় অমৃতে ভরপুর। নেপোলিয়নের পেট ভরে উঠতে লাগল মা ও ধাই-মা, উভয়ের বুকভরা স্নেহে। শীর্ণ চেহারা ছেলের দেহে অচিরে স্বাস্থ্যের জৌলুস নাবল। কর্সিকার জলহাওয়াও এই ব্যাপারে সাহায্য করল।

নেপোলিয়ন ক্রমে বড় হলেন। ব্যবহারে দুর্দান্তপনা, উদারতা দুই-ই ছিল। ভাইয়ে-ভাইয়ে খেলা হত ওর চুল টেনে, এর ঘাড়ে রদ্দা মেরে। জোসেফ প্রায় দিনই হেরে যেতেন ছোট ভাইয়ের কাছে। ল্যাটিজিয়া একটা ঘর খালি করে দিয়ে বলেছিলেন "যাও, ঐ ঘরের মধ্যে যত পার খেলাধুলো, হৈ চৈ কর…।" অবাধ্য হলে মায়ের হাতের চড় চাপড়টা খেতেন।

পাঁচ বছর বয়সে নেপোলিয়ন স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখানে নান বা সন্ন্যাসিনীরা পড়াতেন। ছেলে-মেয়ে দু-ই পড়ত। সেখানে কিছু-দিন থেকে নেপোলিয়ন ভর্তি হলেন ফাদার রেকোর স্কুলে। ফরাসী অধিকারে গেলেও তখনও সেখানে ফরাসী ভাষা চালু হয়নি। ইতালীয় ভাষার মাধ্যমেই যা কিছু শিক্ষা, যা কিছু শেখানো হত। নেপোলিয়ন বড় হতে লাগলেন পুরোপুরি ইতালীয় আবহাওয়ায়।

স্কুলে ভর্তি হবার পর নেপোলিয়নের যে বিষয়টি সব চাইতে বেশী পছন্দ হল, সেটি হল অঙ্ক। যত শক্ত অঙ্ক, নেপোলিয়নের বুদ্ধিতে তত ধার। আরও বড় হয়ে নেপোলিয়ন ভালোবেসেছিলেন ইতিহাস, এ ছাড়া রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং অতীত কালের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের জীবনী-সাহিত্য।

ছেলেদের চরিত্র গঠনে মা ল্যাটিজিয়ার ব্যক্তিত্ব অনেকখানি কাজ করেছিল। পুরো কর্সিকান চরিত্র নিয়েই যাতে ছেলেরা বড় হয়, ল্যাটিজিয়া সেদিকে পুরো লক্ষ্য রাখতেন। ছেলেদের প্রায়ই বলতেন, "শুকনো রুটি খাও কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু পাঁচ জনের কাছে সে দারিদ্র্যকে জাহির করো না। যত অসুবিধাই হোক, বাইরের লোককে ইনিয়ে-বিনিয়ে জানাতে যেও না।…।"

আত্মমর্যাদা ছিল কর্সিকানদের সব চাইতে বড় সম্পদ। আর তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে-কোন অপমান, আঘাতের প্রতিশোধ নেওয়া। এই প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারটি মাঝে-মাঝে বংশপরম্পরায় বংশধরদের মধ্যেও গড়িয়ে যেত। ছেলেবেলায় নেপোলিয়ন মুগ্ধ হয়ে এই ধরনের কত গল্প-গাথা শুনতেন। এর মধ্যে কত বীরত্ব, কত আস্ফালন।

কখনও গায়ে কাঁটা দিত, কখনও বা স্বপ্ন দেখতেন—তিনি নিজেই বুঝি তাঁদের একজন হয়ে টগ্‌বগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মাঠে, পাহাড়ে, উপত্যকায়। ছেলেবেলায় ভূতের গল্পই কি কম শুনেছেন নেপোলিয়ন! বিশেষ করে মৃত্যু-সংক্রান্ত ভূতুড়ে গল্পের তো শেষ ছিল না। যেমন, কোন বাড়িতে মৃত্যু আসন্ন হলে সে বাড়ির ছাদে একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা ছায়ার মত ভেসে বেড়াত, অথবা সারারাত ধরে প্যাঁচার ডাক শোনা যেত। কখনও কুকুরের কান্নায় চারিদিক ভারী হয়ে উঠত, কখনও বা শোনা যেত, কে যেন দূরে বসে ড্রাম পিটোচ্ছে। সব কিছুই ভূতুড়ে, আর সবই ছিল বড় দুর্লক্ষণ। যেখানে ঐসব দেখা যাবে সেখানে কোন-না-কোন ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত।

ছেলেবেলাটা নেপোলিয়নের এই ভাবেই কেটেছে। বাপ আইন ব্যবসায়ে উপার্জন করছিলেন। আইনের সাহায্যে কিছু লুপ্ত সম্পত্তি উদ্ধার করে অবস্থা ফিরিয়েছিলেন। আরও ওপরে উঠলেন যখন ফরাসী সরকারের নির্দিষ্ট নিয়মে তিনি অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হলেন। কর্সিকার বারো জন অভিজাতকে নিয়ে যে কাউন্সিল হল, তিনি তার অন্যতম সদস্য হলেন। বড় হতে হতে নেপোলিয়ন লক্ষ্য করেছিলেন বাবার বেশভূষায় ক্রমবর্ধমান আড়ম্বর, বাড়ির আবহাওয়ায় সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষণ। এদিকে আরও দুটি ভাই-বোন এসেছে। চার্লস বোনাপার্ট এবার ভাবতে বসলেন বড়ো ছেলে দুটির শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। নেপোলিয়নের বয়স তখন ছয়, দাদা জোসফ তার চাইতে উনিশ মাসের বড়ো। হয় নেপোলিয়ন রোকোর স্কুলেই পড়াশুনো করবেন, তারপর বছর ষোল বয়সে পিসায় গিয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হবেন, আর নইলে, যদি ভালোভাবে লেখাপড়া শিখতে হয় তা হলে নেপোলিয়নকে যেতে হবে খোদ ফ্রান্সে। তবে খরচ! অত খরচ কি করে সামলাবেন চার্লস বোনাপার্ট!

এবার শুরু হল নেপোলিয়নের ভাগ্যের ইতিহাস। কর্সিকার শাসনকর্তা হয়ে এলেন লুই চার্লস রেনে, কাউন্ট অব মার্বো। কাউন্ট মার্বোর সঙ্গে বোনাপার্ট পরিবারের বেশ একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠল।

দুষ্টু লোকে বলে, ল্যাটিজিয়া সম্পর্কে মার্বোর প্রচ্ছন্ন অনুরাগই নাকি এই হৃদ্যতার মূল কারণ। সে যাই হোক, ল্যাটিজিয়ার মূল লক্ষ্য কিন্তু স্বামী ও সন্তানদের মঙ্গল, তাদের উন্নতি। মার্বো খবর দিলেন, ফরাসী দেশে নাকি ব্যবস্থা আছে যে, কোন অভিজাত ফরাসী নাগরিক যদি অর্থের অভাবে পড়েন, তা হলে তাঁর ছেলে-মেয়েরা সেখানে রাজবৃত্তির সাহায্যে ভালো বিদ্যায়তনে পড়াশুনো করতে পারে। চার্লস বোনাপার্ট যদি মনে করেন তাঁর ছেলে-মেয়েরা ফরাসী দেশে শিক্ষা লাভ করবে, তা হলে সেই ব্যবস্থা মার্বো করে দিতে পারবেন। ছেলেদের মধ্যে যদি কেউ সামরিক বিদ্যালয়ে ঢুকতে চায়, ঢুকবে। কেউ যদি জীবনে যাজকবৃত্তি গ্রহণ করতে চায়, তারও শিক্ষায়তন আছে।

চার্লস-ল্যাটিজিয়া হাতে স্বর্গ পেলেন। এখন ভাবনা বড়ো ছেলে দুটির মধ্যে কাকে কি পড়তে দেবেন। ঠিক হল শান্ত নির্বিরোধ ছেলে জোসেফকে দেওয়া হবে যাজকবৃত্তি-শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে। আর দুর্দান্ত, বুদ্ধিমান ছেলে নেপোলিয়ন যাবেন সামরিক স্কুলে। এই সিদ্ধান্তে শুধু ফরাসী ইতিহাসে নয়, গোটা ইউরোপের ইতিহাসে অলক্ষে একটা নামের স্বাক্ষর পড়ল···

জোসেফ আর নেপোলিয়নের যাওয়ার দিন এসে গেল। ফ্রান্সের অ্যাই শহরে যাজক-স্কুলে যাবেন জোসেফ আর নেপোলিয়ন যাবেন ব্রিয়েনের সামরিক স্কুলে। যাত্রার দিন স্থির হল ১২ই ডিসেম্বর, ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ। যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা। ল্যাটিজিয়া দুই ছেলের সব কিছু গুছিয়ে দিলেন। স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী কার কটা শার্ট, তোয়ালে, টাই লাগবে, ঠিক করে সব কিছু গুছিয়ে দিলেন। এসব ছাড়া নেপোলিয়ন নিলেন রুপোর একটি কাঁটা, একটি চামচে, একটি পান-পাত্র, তার গায়ে বোনাপার্ট পরিবারের বংশপ্রতীক। আর নিলেন একটি লাল রং-এর ঢাল, তাতে কোণাকুণি ভাবে আটকানো রুপোর তৈরি তিনটি বন্ধনী, দুটো ছ'কোণা নীল তারকা আর গোটা ঢালটা জুড়ে খোদাই করা একটা রাজমুকুট। ল্যাটিজিয়া দুই ছেলেকে

নিয়ে গেলেন গির্জায় ফাদার সুপিরিয়রের কাছে আশীর্বাদ চাইতে। ছেলে দুটি মা-বাবার কোল ছেড়ে বিদেশ যাচ্ছে। ওদের জীবন যেন সফল হয়, সার্থক হয়…।

তার পরদিন। ১২ই ডিসেম্বর। দু'ভাই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ঘোড়ার পিঠে উঠলেন। সঙ্গে মালবাহী অশ্বতর প্রাণী আর কয়েকজন চেনা জানা লোক কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসবে। তারপর তো জাহাজে উঠে ওদের দুভাইকে একাই যেতে হবে ফ্রান্সের দিকে।

…জাহাজে উঠে নেপোলিয়নের কেবল মনে পড়তে লাগল মা ল্যাটিজিয়ার কথা। আসবার সময় ছেলের কানের কাছে মুখ এনে বলেছিলেন—"কখনও সাহস হারিও না, মুষড়ে পড়ো না" …

নেপোলিয়ন কোথায় ছিলেন কর্সিকার একটা ছোট্ট গ্রামের মতো শহরে, আর কোথায় এলেন ফ্রান্সে একটা চোখ ঝলসানো জগতে। কী সুন্দর ঘরবাড়ি, কী চওড়া ঝকঝকে টানা রাস্তা! ফুলে, গাছে সাজানো বাগান, পার্ক, লেক, তাতে আবার রাজহাঁস চরছে! বাড়িগুলি যেমন বড়ো, তেমনি সাজানো। আর সেই বাড়ির বাসিন্দারা! নেপোলিয়ন সেই সব বাড়ির বাবুদের দিকে তাকাতেন আর তাদের সাজ-পোশাক দেখে মুগ্ধ হতেন। চোখ বড়ো বড়ো করে দেখতেন ওরা কথায় কথায় কেমন সুন্দর কাজকরা, পাথর বসানো নস্যির ডিবে খুলে ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছে, আর তাদের পাশে অপরূপ সাজে সজ্জিতা সঙ্গিনীরা কেমন সেই তালে চম্পাকলি হাতে-ধরে-থাকা প্রজাপতির মতো ছোট্ট হাল্কা পাখা নাড়ছে আর নাড়ছে! ঐ যুগের অভিজাত ঘরের মেয়ে-পুরুষের ঐ ছিল ফ্যাসান। শুধু তাই নয়, মুখে আবার রুশো, মঁতাস্কু, ভলতেয়রের লেখার কত আলোচনা। সব কিছু লোককে দেখাতে হবে, শোনাতে হবে, তবে না ফ্যাসান!

ফ্রান্সে গিয়ে নেপোলিয়ন প্রথম চার মাস কাটিয়েছিলেন অটান কলেজে। এই চার মাস নেপোলিয়ন শুধু ফরাসী শিখেছেন।

শিখলে কি হবে, এতকালের ইতালীয় ভাষায় অভ্যস্ত নেপোলিয়নের মুখে ফরাসী ভাষার উচ্চারণ দুরস্ত হল না। শিক্ষকেরা বিরক্ত হলেন। ক্লাসের সহপাঠীরা ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগল। নেপোলিয়ন যে খোদ ফরাসী দেশের লোক নয়, কর্সিকার লোক, একদিন যে-দেশ কিনা ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল—তা যেন ওখানকার ছাত্র, শিক্ষকেরা ভুলতে চাইল না, বরং নেপোলিয়নকে তারা ক্রমাগত দূরে ঠেলতে লাগল।

একদিন একজন শিক্ষক তো বলেই ফেললেন—"তোমরা, কর্সিকানরা, নিজেদের তো খুব সাহসী বলে জাহির করো তবে—আমাদের সৈন্যদের কাছে হেরে মরেছিলে কেন... !"

নেপোলিয়ন উত্তর দিয়েছিলেন, "কারণ আমাদের এক-একজনের বিরুদ্ধে আপনাদের দশজন সৈন্য দাঁড়িয়েছিল। কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমি বড়ো হই, এর প্রতিদান কি করে দিতে হয়, আমি দেখাবো... !"

শিক্ষক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন..."তোমাদের সেনাপতি পায়োলী নাকি একজন মস্ত বড়ো পালোয়ান লড়ুইয়ে ছিলেন...তবে... !"

"তিনি ছিলেন না, স্যার, এখনও আছেন। আমিও একদিন তাঁর মতো হব...।" ক্ষোভে, দুঃখে ততক্ষণে নেপোলিয়নের চোখে জল এসে গেছে। এদের মনের মধ্যে কি এতটুকু উদারতা থাকতে নেই...। তাঁকে একা বিদেশী পেয়ে ছেলে-বুড়ো সবাই ঠাট্টা করবে! অপমান করবে... !

এরপর নেপোলিয়ন ভর্তি হলেন ব্রিয়েনের মিলিটারী একাদেমিতে। ভর্তি হলেন ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে। ব্রিয়েন ছিল ফরাসীদেশের শ্যাম্পেন অঞ্চলের একটি অংশ। বনভূমি, পুকুর, বড়ো বড়ো বাগান, কয়েকটা ডেয়ারী ফার্ম নিয়ে ব্রিয়েন ছিল গ্রাম্য সরলতায় ঢাকা সুন্দর একটি শহর। ব্রিয়েনের সবুজ সৌন্দর্যে নেপোলিয়নের মন ভরে উঠল। অনেকখানি জায়গা নিয়ে একাদেমির সীমানা। একাদেমির প্রবেশ-পথে দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখজুড়নো লাইম গাছ...।

এখানে নেপোলিয়নের এক নতুন জীবন শুরু হল। কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা জীবন। সেই ভোর ছ'টায় উঠে, সাদা বোতাম আটকানো নীল ইউনিফর্ম পরে নেপোলিয়নের রোজনামচা শুরু হত। কিছু সময় ফরাসী আইনের ক্লাস করা, তারপর একটু প্রার্থনা। প্রার্থনার পর একে একে অন্য কাজ। সাদা রুটি ও ফল দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে ল্যাটিন, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, ফিজিক্সের ক্লাস করা। এর পর দুর্গ কেমন করে তৈরী করতে হয়, কি করে ম্যাপ চিনতে হয়, আঁকতে হয়, এ সবের ক্লাস।

দুপুরবেলায় স্যুপ, সেদ্ধ মাংস, কিছু মিষ্টি আর অনেকটা জল মেশানো একটু দেশী মদ ইত্যাদি দিয়ে পেটভরা লাঞ্চ। এরপর আবার শুরু হ'ত ক্লাস, যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানান রকম টুকিটাকি শিক্ষা, অবশেষে রাত্রিবেলা সাপার সেরে প্রার্থনা করে ঘুমুতে যাবার ঘণ্টা। এই ছিল ব্রিয়েন একাদেমিতে নেপোলিয়নের দৈনন্দিন রুটিন।

ব্রিয়েন একাদেমির প্রতিটি ছাত্রের একফালি করে জমি নির্দিষ্ট ছিল। ছেলেরা সব্জী ফলাক, ফুল ফোটাক, যা খুশি করুক, কর্তৃপক্ষের এই ছিল নির্দেশ। নেপোলিয়নের প্রাণের চাইতে বড়ো ছিল তার জন্য নির্দিষ্ট ঐ ফালি জমিটা। নেপোলিয়ন সুন্দর বাগান করেছিলেন। দু'পাশের জমি দুটোও নেপোলিয়ন পেয়েছিলেন, জমির চারপাশে বেড়া দিয়েছিলেন। ঐখানে একা বসে তিনি অনেক বই পড়তেন, অনেক কথা ভাবতেন, ওখানেই বিশ্রাম করতেন। সেই দিনগুলিতে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, স্বল্পভাষী, বিমর্ষ। কারণ ছিল। ব্রিয়েনের ছাত্র-সঙ্গীরাও ঠিক অটানের ছাত্রদের মতোই ব্যবহার করত। বরং তাদের ব্যবহারে একটু বাড়াবাড়িই ছিল। নেপোলিয়নের লম্বা কোট দেখে, তাঁর ভুল ফরাসী উচ্চারণ শুনে তাঁকে কর্সিকার ছেলে জেনে ছেলেরা ঠাট্টা তামাসায় নেপোলিয়নকে উদ্ব্যস্ত করে তুলত। উপরন্তু ব্রিয়েনের ছাত্রদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল ফ্রান্সের খানদানী পরিবারের ছেলে। টাকার অহঙ্কারে সব কিছুকে তারা তুচ্ছ মনে করতো। রাজবৃত্তির অনুগ্রহে নেপোলিয়ন পড়ছেন, এটা জানতে পেরে ঐ সব ছেলেরা নেপোলিয়নকে প্রতি কথায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইত।

নেপোলিয়ন বাবাকে চিঠি লিখলেন—"এখানকার ছেলেরা সব-কিছুকে কেবল টাকা দিয়ে বিচার করে, মহত্ত্বের দিক থেকে যে কতটা নীচে পড়ে আছে কি বলবো…। আমি কি এই পয়সার দম্ভে দাম্ভিক ছেলেগুলির কাছে মাথা নীচু করে থাকব…। আমি কি এই জঘন্য জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না…?"

বাবা উত্তর দিলেন, "আমাদের যথেষ্ট টাকা নেই। তাই তুমি যেখানে আছ, সেখানেই থাকবে…।

ব্রিয়েনের মিলিটারী একাদেমিতে নেপোলিয়ন ঐ অবস্থাতেই পাঁচটি বছর কাটিয়ে ছিলেন…।

ততোদিনে ফ্রান্সের আকাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। ফ্রান্সের জন-জীবনে তখন জমাটবদ্ধ অসন্তোষ গুমরে গুমরে উঠছে। একদিকে রাজা-রাণী, অভিজাতশ্রেণী, ঐশ্বরিক মহিমায় দর্পিত যাজক-সম্প্রদায়, সম্পদ-ফেনিল-উচ্ছ্বসিত জীবন। কেবল খাও, দাও, স্ফূর্তি কর। অন্যদিকে লাঞ্ছিত, নিদারুণ অভাবে মুমূর্ষু, সবদিক থেকে বঞ্চিত ফরাসী জনতা। তাদের মধ্যে আছেন বুদ্ধিজীবী রুশো, ভলতেয়র, মঁতাস্কু, দিদেরো এবং আরও অনেকে—যাঁরা কলমের ডগায় দাবীর হুঙ্কার ছাড়ছেন, মনুষ্যত্বের নতুন ব্যাখ্যা করছেন, ধারালো যুক্তির ছেনি দিয়ে যাঁরা আঘাতের পর আঘাত করছেন চার্চের কঠিন দেয়ালে, রাজপ্রাসাদে, ঐশ্বর্য-মণ্ডিত জীবনে। সারা ফ্রান্সের ধুঁকে-থাকা লোকেরা এতদিনে চোখ মেলে তাকিয়ে একটু একটু যেন বুঝতে পারছে, কতদিন ধরে বংশ-পরম্পরায় তারা নিজেদের নিদারুণ অনটন দিয়ে, মনুষ্যত্বের অপমান করে কেমন খাদ্যরস যুগিয়ে গেছে ধনীর দুলালদের, তাদের গায়ে পরিয়েছে ঝকমকে পোশাক, তাদের গাড়ি চলেছে টগ্‌বগিয়ে রাস্তার লোকদের ভীত-চকিত করে…। কিন্তু এবার…! এবার নাকি ঐ ধনী লোকদের যথেচ্ছ চলার পথে বাধা দেবার সময় এসেছে। আর ভক্তি নয়, এবার যুক্তি। যুক্তির সঙ্গে হাত মেলাবে শক্তি।

অন্ধকারের কালো বুক চিরে আলোর রেখা নেমে এল মূক ম্লান চোখের সামনে···। চার্লস ডিকেন্স এই যুগকে বলেছেন—"It was the best of times, it was the worst of times, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us.···" ভালো-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞতা, আলো-অন্ধকার, সব-পেয়েছির দল, আর কিছুই-না-পাওয়ার হতভাগ্যরা একই সময়ে ফ্রান্সের মাটিতে দাঁড়িয়েছিল—, আর "there were a king with a large jaw and a queen with a fair facc, on the throne of France." এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর ছিল এক রাণী। রাজার নাম ষোড়শ লুই, রাণী মারিয়া আতোঁয়ানেত। ষোড়শ লুই মানুষ হিসেবে ভালো, গো-বেচারা। রাণী আতোঁয়ানেত মেয়ে হিসেবে একেবারেই মেয়ে। রাজ্যের কোথায় কোন্ অন্ধকারে কোন্ নিরন্নের দল পেটের জ্বালায় কাঁদছে, অতশত ভাববার তাঁর সময় নেই। বরঞ্চ সে সময়টা লক্ষ লক্ষ টাকার পরিবর্তে নিজের পোশাক, নিজের কেশবিন্যাস আর শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা অনেক বেশী নিরাপদ, অনেক নির্ঝঞ্ঝাট।

বয়স যখন বারো, তখন নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন, সমুদ্রঘেরা দ্বীপে যখন জন্ম তখন তিনি জলের সঙ্গেই নিজের ভবিষ্যৎ বেঁধে দেবেন। তিনি হবেন নাবিক নৌসৈন্য। তবে ল্যাটিজিয়া পছন্দ করলেন না। উপরন্তু নেপোলিয়ন যখন পনেরো বছরে পা দিলেন, বাড়ি থেকে নির্দেশ এলো, এবার তাঁকে ব্রিয়েন ছাড়তে হবে, কারণ তাঁর জায়গায় এবার আসবে ছোট ভাই লুসিয়েন। অতগুলো ভাই-বোন যখন, পালা করে না পড়লে কি করে হবে···। ওদিকে বাবা চার্লস বোনাপার্টের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। রোগা হয়ে গেছেন, দেহে ক্লান্তি, সমস্ত মুখে কালো ছাপ। মা ল্যাটিজিয়ার শরীরও ভালো নেই। শেষ সন্তানটি প্রসবের পর সূতিকাজ্বরে শয্যাশায়ী। শরীরের বাঁ দিকটা কেমন যেন আড়ষ্ট কঠিন।

নেপোলিয়ন নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হলেন। তাঁর জায়গায় লুসিয়েনকে বসিয়ে তিনি নিজে কোথায় যাবেন…! ভাগ্য সহায়, শেষ পর্যন্ত যোগাড়যন্ত্র করে স্থির হল প্যারিস। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর নেপোলিয়ন ব্রিয়েন ছাড়লেন। লম্বা চুল, পেছন দিকে একটা রিবন দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। একটু বিবর্ণ, বিমর্ষ মুখ। নেপোলিয়ন ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বসলেন। পথে কয়েকবার গাড়ি-ঘোড়া পাল্টে প্যারিসে পৌঁছলেন ২১শে অক্টোবর…।

প্যারিসে পা দিয়ে সত্যি কথা বলতে কি, নেপোলিয়ন বেশ কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। একসঙ্গে এত ঐশ্বর্য, আবার তারই তলায় এত দারিদ্র্য আর কখনও চোখে পড়েনি। নেপোলিয়ন অবাক হয়ে দেখতেন, ঐশ্বর্যশালী ভাগ্যবানেরা কেমন করে রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে যান। গাড়ির আগে আগে পাইলট কারের মতো ছুটে চলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর। রাস্তার মাঝে যেন কোন ইতর-হতভাগা এসে না পড়ে। গাড়ির চলার ছন্দে যেন বেসুরো না বাজে। গাড়ির চাকার দু'পাশে কাদা ছিট্‌কে যেতো, ধুলো-বালি ঝরতো, তা লাগলই বা রাস্তার ধারে সিঁটকে-থাকা অভিশপ্ত নিরন্ন লোকগুলোর গায়ে! তারাই তো আবার উল্লাসে চিৎকার করবে যখন গাড়ির ধনী সদাশয় ব্যক্তিটি তাদের দিকে দু'চারটে পয়সা ছুঁড়ে মারবেন! মজা পাবেন, মানুষ নামে ঐ প্রাণীগুলো সামান্য দুটো একটা পয়সার জন্য কেমন লুটোপুটি খায় দেখে…। প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় তখন আলো, স্ট্রীট ল্যাম্প। তার আশে পাশে বুভুক্ষু মানুষের চলমান জীবন…।

প্যারিসের যে মিলিটারি স্কুলটিতে নেপোলিয়ন ক্যাডেট বা সামরিক শিক্ষার্থী হয়ে এলেন তার জাঁকও বড়ো কম ছিল না। যেমন বাড়ি, তেমনি চমৎকার পর্দাঝোলানো সব দরজা জানালা, তেমনি খাবার থাকবার ব্যবস্থা। যাকে বলে একেবারে রাজকীয়। ইউনিফর্মেরই বা বাহার কত! নীল রং-এর ইউনিফর্ম লাল রং-এর কলার, তাতে আবার রুপোলি বিনুনি করা পাড়, হাতে সাদা দস্তানা। যাঁরা পড়াতেন, শিক্ষা দিতেন, তাঁরাও প্রত্যেকে ছিলেন সব জাঁদরেল

সামরিক অফিসার, পুরোপুরি সামরিক আবহাওয়া। নেপোলিয়নের বড় পছন্দ। তবে অপ্রীতিকর ঘটনা সেখানেও যে তু'একটা না ঘটেছে তা নয়, কয়েকবারই নেপোলিয়নকে হাসি ঠাট্টার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

চার্লস বোনাপার্ট ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পাকাশয়ে অসহ্য ব্যথা। চার্লস ডাক্তার দেখালেন। চার্চে গিয়ে ফাদারের আশীর্বাদ চাইলেন, ব্যথার একটু উপশম হয় কিনা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ মুহূর্ত এগিয়ে এল। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে চার্লস বোনাপার্ট মারা গেলেন। পাকাশয়ে ক্যানসার হয়েছিল···।

খবর পেয়ে নেপোলিয়নের চোখে জল এল। বাবাকে তিনি ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। মায়ের কথা ভেবে নেপোলিয়ন অস্থির হলেন।

সামরিক জীবনে নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত বেছে নিলেন গোলন্দাজের জীবন। আর্টিলারি বিভাগে তিনি ভালো ফল করলেন, ভালো শিখলেন। অবশেষে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পদ পেলেন। রীতিমতো সামরিক অফিসার। নেপোলিয়নের বয়স তখন ষোল বছর পার হয়ে পনের দিন---১৭৮৫ খ্রীস্টব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। যাঁরা এই কমিশন বা সামরিক পদ পেলেন, প্রথামতো তাঁদের প্যারেড হল। প্যারেডের শেষে নেপোলিয়ন এবং আর সবাই পদমর্যাদা জ্ঞাপক ব্যাজ পেলেন—রুপোর বাক্‌ল্‌স, চমৎকার চকচকে চামড়ার বেল্ট আর একখানি তরবারি।

তরবারিটি ফ্রান্সের, ধারটা আমার, একেবারেই আমার···নেপোলিয়ন তাঁর তরবারির ওপর হাত বুলিয়ে মন্তব্য করেছিলেন।

নেপোলিয়নের নতুন জীবনের কর্মস্থল হল ফ্রান্সের ভ্যালেন্স শহর। তাঁর রেজিমেণ্টের নাম ছিল লা ফেয়ার। রোন নদীর ধারে, ভ্যালেন্স শহরটি দেখতে বড় সুন্দর। আবার সামরিক শহর হিসেবে কর্সিকার নিকটতম। বাড়ির এত কাছাকাছি থাকতে পারার সুযোগটা নেপো-

লিয়নের খুব পছন্দের হয়েছিল। বাবা মারা গেছেন, মা একা, এত-গুলি ভাই বোন। জোসেফ ল্যাটিজিয়ার বড় ছেলে ঠিকই, কিন্তু দায়িত্ববোধ বেশী নেপোলিয়নের। সংসারের ভয় ভাবনা তিনিই বেশী ভাবেন। ল্যাটিজিয়া এই ছেলের ওপরেই বেশী নির্ভরশীল।

লেফ্‌টেন্যান্ট হিসেবে প্রথম ন' সপ্তাহ নেপোলিয়নকে সৈনিকের যাবতীয় করণীয় কাজকর্ম শিক্ষা করতে হয়েছে। সকাল থেকে আরম্ভ হত চাঁদমারি, হাতের টিপ ঠিক রাখার জন্য ও উন্নত করার জন্য সমানে বন্দুক প্র্যাকটিস করতে হত। বিকেলবেলা হত গোলাগুলি ব্যবহারের ওপর নানা রকম ক্লাস, কোন্ কামানে কোন্ গোলা লাগে, কোন গোলা কীভাবে ছুঁড়তে হয়, কত দূর যায়, এই সব বিষয়ে ক্লাস হত আর এই রুটিন অনুসরণ করতে গিয়ে নেপোলিয়নের মন বিশেষভাবে ঝুঁকে গেল কামান-বন্দুক গোলাগুলির দিকে। অবসর সময়ে শীতকালে নেপোলিয়ন বরফের ওপর স্কেটিং করতেন, অন্য সময় মাঝে মাঝে নাচের আসরে যেতেন। অবশ্য নাচের ব্যাপারে নেপোলিয়ন কোনদিনই তাল মেলাতে পারেননি। লোকের কাছে এজন্যে কম উপহাসের পাত্র হননি। অনেক সময় নেপোলিয়ন দীর্ঘপথ শুধু হেঁটে যেতেন, কিংবা পাহাড়ে উঠে চুপচাপ বসে থাকতেন। অবসর কালে নেপোলিয়ন পড়াশুনা করতেন প্রচুর। এই বই পড়ার মধ্যে কোন শ্রেণীভেদ ছিল না। কোন বাছ-বিচার ছিল না। উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনী, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্লেটোর রেপাবলিক, ভলতেয়র, রুশো—আরও কত কী। এমন কি নাক, চোখ, কান ও দেহের গড়ন দেখে কী ভাবে মানুষের চরিত্র ও মানসিক গঠন বোঝা যায়, তার ওপর পর্যন্ত একখানা বই পড়ে ফেলেন। বইটির নাম 'দ্য আর্ট অব জাজিং ক্যারেক্টর ফ্রম মেনস্ ফেসেস'। লেখক জাঁ গ্যাসপার ল্যাভেটার। নেপোলিয়ন প্রতিটি বইয়ের ভালো ভালো অংশ এক-খানা নোটবুকে লিখে রাখতেন।

এমনি করেই কিছুদিন কেটে গেল। নেপোলিয়ন দেখলেন ও বুঝলেন দেশে দেশে শাসনের নামে কত অন্যায়, কত অত্যাচার—বিচারের

নামে কী অবিচার, রাজার দণ্ড কী নিপীড়ন বয়ে আনে অজ্ঞ, মূর্খ ও সাধারণ প্রজাদের ওপর। নেপোলিয়ন ইংরেজ লেখক জন ব্যারোর লেখা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস পড়ে বুঝেছিলেন মানুষের মনে জাতীয়তাবোধ বড় শক্তিশালী আবেগ, একটু সুযোগ পেলে এই আবেগ আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। আর পড়েছিলেন দেশের যোগ্য শাসনতন্ত্র দিয়ে কেমন করে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বাধা দেওয়া যায়, কেমন করে উপযুক্ত শাসননীতি দিয়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষকে অবিচার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। নেপোলিয়ন এই সব পড়তেন আর ভাবতেন ফ্রান্সের তদানীন্তন রাজা ষোড়শ লুইয়ের কথা, তাঁর সঙ্গী শাসক কর্মচারীদের কথা। শাসননীতির কী অপব্যাখ্যাই না তখন দেশের হাওয়া ভারী করে তুলেছিল। নেপোলিয়ন স্থির করলেন, তিনি নিজে একখানা বই লিখবেন, তাতে তিনি দেখাবেন, রাজা ও তাঁর শাসক-কর্মচারীদের কী কর্তব্য, রাজ্যশাসন বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায়।

নেপোলিয়ন দুর্দশাগ্রস্ত, ক্লিষ্ট, শীর্ণ ফরাসীদেশের শাসনক্ষেত্রে সংস্কার চাইলেন···।

খবর এল বোনাপার্ট পারবারের বন্ধু ফরাসী গভর্নর মার্বো মারা গেছেন। অতএব এতদিন ধরে বিধবা ল্যাটিজিয়া যা কিছু সরকারী বৃত্তি পেয়ে আসছিলেন সব বন্ধ হয়ে গেছে। ল্যাটিজিয়া মহা আথান্তরে পড়ে খবর পাঠালেন নেপোলিয়নের কাছে। নেপোলিয়নও চিন্তায় পড়লেন। তিনি ফ্রান্সে কয়েকজন হোমরা চোমরার দোরে দোরে ঘুরলেন, যাতে তাঁর মা আগের মতোই কিছু বৃত্তি পেতে পারেন। উত্তর মিলল—না, কিছু হবে না। মানুষের এই হৃদয়হীনতা নেপোলিয়নের কাছে অসহ্য মনে হল। আরও যেন বেশী করে বুঝতে পারলেন, কর্সিকার ওপর ফ্রান্সের কী নিদারুণ ঔদাসীন্য, কী ভয়ঙ্কর উপেক্ষা!

মনের জ্বালা মেটাতে নেপোলিয়ন ঠিক করলেন একখানা বই লিখবেন। লিখবেন কর্সিকার ইতিহাস, জেনোয়ার বিরুদ্ধে কর্সিকার

সেই বীরত্বব্যঞ্জক বিদ্রোহের ইতিহাস, স্বদেশভক্ত বীরদের সেই অসম সাহসিক কাহিনী। পায়োলীর কাছে নেপোলিয়ন কিছু তথ্যের জন্য লিখে পাঠালেন। পায়োলী উত্তর দিলেন, ইতিহাস লেখা কোন ছেলে-ছোকরার কাজ নয়। নেপোলিয়নের বড় ইচ্ছায় পায়োলী ঠাণ্ডা জল ঢাললেন, কেন কি জানি···। নেপোলিয়নের সেই অসম্পূর্ণ ইতিহাসের এক জায়গায় লেখা ছিল, কর্সিকার উপযুক্ত নৌশক্তি থাকলে সে কখনই স্বাধীনতা হারাত না।

নেপোলিয়ন কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছিলেন। সাদামাটা ছোট গল্প নয়, রীতিমতো রূপক। দেশের তৎকালীন পটভূমিকায় সেই গল্পগুলি ছিল ব্যাখ্যামূলক এবং ট্র্যাজেডির বেদনায় পূর্ণ। নেপোলিয়ন অনেকগুলি তথ্যমূলক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাঁর সব রচনার মূল সুর ছিল সবার ওপর ন্যায় সত্য, সুশাসন সত্য। দেশের শাসন যদি ন্যায়পথে চলে, তবে দেশের মানুষের মতিগতিও ঐ পথেই যাবে। কারণ যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর ও শোভন, মানুষের মন স্বভাবতই সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। অত্যাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে তো মানুষের মন বিদ্রোহী হবেই।

নেপোলিয়ন তাঁর লেখায় আরেকটি মূল্যবান কথা শুনিয়েছিলেন, তা হল স্বদেশভক্তি, স্বাধীনতার আদর্শ। এ যেন আবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত না হয়। 'আমি বড়, আমিই সব'—এই ধরনের অহংভাব স্বদেশভক্ত নেতাদের বড় সহজে পেড়ে ফেলে।

তথাকথিত ধর্ম বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে নেপোলিয়ন মাথা ঘামাতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন যদি আরেকজনের সুখের জন্য কাজ করে, তা'হলে সেই আচরণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নেপোলিয়ন মনে প্রাণে এই নীতি বিশ্বাস করতেন।

সেবার শীতটা বড়ো জোর পড়েছিল। নদীগুলি বরফে ঢাকা পড়ল, প্রচুর গৃহপালিত পশু মারা গেল, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিল, খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য আকাশছোঁয়া হল। প্রচুর শ্রমিক ছাঁটাই হল। একটু খাওয়ার জন্য চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল।

বছরটা ছিল ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ। সারে নামে একটা ছোট্ট শহরে নদীর বুকে এক-নৌকো ভর্তি গম লুঠ হয়ে গেলো। কিছু সৈন্য পাঠান হল। অফিসারদের মধ্যে একজন ছিলেন নেপোলিয়ন। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন—ঝড় এসে গেছে। বহুদিনের জমেথাকা মেঘ এবার আর বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে না। এবার তার বিরুদ্ধে আক্রোশে আকাশের গায়ে গায়ে ডমরুধ্বনি। ফ্রান্সের জনতা চিৎকার করে উঠল, ফরাসী বিপ্লবের আগুন জ্বলল। বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন মিরাবোঁ, ইতিহাসে সুপণ্ডিত। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস পড়ে নেপোলিয়নের মতো তিনিও বিশ্বাস করেছিলেন, রাজার শক্তি আইন ও পার্লামেণ্ট দিয়ে সীমাবদ্ধ করা উচিত। মিরাবোঁ নিজে সর্বহারা শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, তবুও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, নিরন্ন, লাঞ্ছিত ফরাসী জনগণের পক্ষ নিলেন।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই ফরাসী বিপ্লবীরা ফরাসী সরকারের অত্যাচারের প্রতীক ব্যাস্টিল দুর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঐ ব্যাস্টিলের রুদ্ধ কক্ষগুলিতে কত বছর ধরে কত না বন্দী মানুষের নিরুদ্ধ বেদনা গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদেছে, দেয়ালে মাথা কুটেছে। হাতে-পায়ে শেকলের অবিরত ঘর্ষণে আর্তনাদ করেছে। এর কোন বিচার ছিল না, প্রতিকার ছিল না। রাজার প্রাসাদে, ধনীর বিলাসে সেদিন শুধু দম্ভের উল্লাস। ব্যাস্টিল দুর্গের পতন হল। আকাশ-বাতাসে ধ্বনি উঠল—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। জনগণের স্বার্থেই সমাজের যা কিছু তারতম্য, নইলে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই···। গোটা ফরাসী দেশ বিপ্লবের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল। ইতিহাস দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল।

বিপ্লবীরা সংবিধান সভা আহ্বান করলেন। দেশের বড় লোকদের এত দিনকার স্বেচ্ছাচারিতায় এবার হাত পড়ল। সাধারণের রক্ত নিংড়ে-যে অজস্র স্বাচ্ছন্দ্য, অধিকার তারা ভোগ করে আসছিল, নতুন সংবিধানে তার অনেক কিছু ছেঁটে দেওয়া হল। সব-পাওয়ার দল এতদিনের সুবিধায় এমন বাদ সাধতে দেখে প্রতিবাদ জানাল। এই

প্রতিবাদকারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নেপোলিয়নের চেনাজানা, সঙ্গী-সাথী অফিসারের দল।

নেপোলিয়নের কাছে ফরাসী বিপ্লবের একটা বিশেষ মূল্য ছিল। কারণ এই বিপ্লবের মধ্যে মানুষের যে জয়গান হচ্ছিল, তাতে নেপোলিয়নের মনে হয়েছিল এইবার তাহলে কর্সিকাও ফরাসী নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবে। কর্সিকার অধিবাসীরা পূর্ণ স্বাধীনতার জয়গান গাইবে। নেপোলিয়ন তাঁর সর্বসত্তা দিয়ে ফরাসী দেশের ইতিহাসে এই মহান পরিবর্তনকে স্বাগত জানালেন, বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন। বিপ্লব ও বিপ্লবের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বকে তিনি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করলেন। ফরাসী দেশে নতুন সংবিধান অনুযায়ী নতুন শাসন নীতির অধীনে যে 'সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস্ অব দ্য কনস্টিটিউসন' গড়ে উঠল, নেপোলিয়ন হলেন তার অন্যতম সদস্য ও সম্পাদক। কোন বিদেশীর প্রভাবে বা হস্তক্ষেপে ফরাসী বিপ্লব যেন মিথ্যে না হয়ে যায়। নতুনের জয় হোক···।

বিপ্লবের পরেই ফরাসী দেশে চার্চের যাবতীয় দেবোত্তর সম্পত্তি, টাকা-পয়সা বাজেয়াপ্ত করা হল। জাতীয় সভা থেকে ঘোষণা করা হল—ফরাসী যাজকবর্গ এবার থেকে আর রোমের অধীন নন, এখন থেকে তাঁরা পুরোপুরি ফরাসী সরকারের। এ সব কিছু ঘটতে ১৭৮৯ থেকে সময় গড়িয়ে এল ১৭৯১তে। নেপোলিয়নের বয়স তখন একুশ পেরিয়ে বাইশে যাচ্ছে···।

এই বছরেই নেপোলিয়ন ছুটি নিয়ে আজাক্‌চিওতে নিজের বাড়ি গেলেন। সংসারে তখন বড় অভাব, সুতরাং অনেক হিসেব। মা ল্যাটিজিয়া অসুস্থ। তবু সেই অবস্থাতেই তিনি কেবল ভাবতেন; সংসার কী ক'রে সুষ্ঠুভাবে চালোনো যায়। সন্তানের সংখ্যা, বলতে নেই, কম নয়। মরে হেজে গিয়েও আটটি। জোসেফ, নেপোলিয়ন, লুসিয়েন, লুই, জেরোম—পাঁচ ভাই, আর বোন তিনটি—মেরী অ্যান, পলিন, ক্যারোলিন। এই আট জনের মধ্যে প্রথম দুটি রোজগেরে।

তাও জোসেফের আয়ের কোন স্থিরতা নেই। তার ওপর নির্ভর করা যায় না, রইলেন বাকি নেপোলিয়ন।

নেপোলিয়ন ছোটখাটো দেখতে। উচ্চতা বড় জোর পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি। পাতলা রোগাটে চেহারা। মুখের কাটিং শক্ত, ধারালো। টানা চিবুক, চোখের রং নীল্‌চে ধূসর, গায়ের রং ফর্সা, একটু বিবর্ণ। এর আগের সব ছুটিতে নেপোলিয়ন যখন বাড়িতে এসেছেন, মা'র কাছে এসে মন হাল্‌কা হত। কিন্তু এবারকার সময় ও পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। একদিকে সংসারের নিদারুণ অর্থচিন্তা, অন্য দিকে ফরাসী দেশের ইতিহাসে দিক-পরিবর্তন। একধরনের অস্থিরতা নেপোলিয়নকে অশান্ত করে তুলল···।

তবে ভগবান আছেন, নইলে ল্যাটিজিয়ার এক ঐশ্বর্যবান কাকা মারা যাবেন কেন, আর কেনই-বা সেই কাকার যাবতীয় সম্পত্তি ল্যাটিজিয়া আর তাঁর ছেলেমেয়েরা পাবেন···। সংসারের অর্থ চিন্তা ঘুচল। এদিকে কর্সিকার জনমানসে ফরাসী দেশের নতুন ইতিহাস ধাক্কা মেরেছে। কর্সিকায় তখন ছুটি দল। একদল ফরাসী সংবিধানসভার সমর্থক, আরেকদল এর একেবারে বিরোধী। নেপোলিয়ন সংবিধান-সভার পুরোপুরি সমর্থক ছিলেন এবং সমর্থক ছিলেন বলেই বিরোধী দলের মনোভাব দেখে বুঝতে পারেলেন, ন্যাশনাল গার্ড বা জাতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া ঐ নতুন বিধি-নিয়ম কর্সিকায় চালু করা যাবে না, কর্সিকা পিছিয়ে থাকবে।

নেপোলিয়নের আবেদন-নিবেদনে কাজ হল। কর্সিকায় একটা জাতীয় সেনাবাহিনী তৈরী হল। তাদের ভোটের জোরে নেপোলিয়ন লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল নিযুক্ত হলেন। উঁচুপদে প্রমোশন পেয়ে নেপো-লিয়নের ভাবনা-চিন্তা অনেক বেড়ে গেল। এই সব ভাবনার মূল ছিল যাজক সম্প্রদায়। নতুন সংবিধানে যাজকদের আলাদা সত্তা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হল। কর্সিকাতে এই নিয়ে ছু'দলে বেশ খানিকটা গোলমাল হল, এমন কি প্রায় যুদ্ধ লাগে লাগে। নেপোলিয়ন ধর্মের নামে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে

নষ্ট করতে চাইলেন না, বরং তাঁর জাতীয় সেনাবাহিনীক নিয়ে ধর্মের নামে যা কিছু ভড়ং সব দমন করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। কিন্তু হলে কি হবে, তিনি এই ব্যাপাবে অন্য কোন সঙ্গী-সেনাপতিদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলেন না, বরং তাঁরা বিরোধিতাই করলেন, তার ফলে কর্সিকার আজাকৃচিও দুর্গের অধ্যক্ষ কর্নেল মেইলার্ড ফরাসী দেশের সমর-মন্ত্রী লেজার্ডের কাছে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে পাঠালেন। নেপোলিয়ন নাকি জাতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, নেপোলিয়নের কোর্ট-মার্শাল হওয়া উচিত…।

জোসেফ ভয় পেয়ে নেপোলিয়নকে বললেন—"তুই আর এখানে থাকিস না। যতো তাড়াতাড়ি পারিস, ফ্রান্সে চলে যা। ওরা তোকে প্যাঁচে ফেলার তালে আছে…।" নেপোলিয়ন খুব ভালো করেই জানতেন সৈনিকজীবনে কোর্ট-মার্শাল হওয়া কত বড় অপরাধের প্রমাণ। এ চার্জ কত সাংঘাতিক। এক্ষেত্রে দাদার কথা শোনা সত্যিই দরকার।

নেপোলিয়ন সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হলেন ফ্রান্সে ফিরে যাবার জন্য, আর এর ক'দিন পরেই তিনি প্যারিসের মাটিতে পা দিলেন…। সেখানে যথাস্থানে নেপোলিয়ন যুক্তি দিয়ে এমনভাবে আজাকৃচিওর ঘটনা সব বললেন যে, তাঁর ওপর থেকে কোর্ট-মার্শালের চার্জ তুলে নেওয়া হল।

ততদিনে ফরাসীবিপ্লব গোটা ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইউরোপে অন্যান্য রাজা-মহারাজারা বিপ্লবের ক্রবর্ধমান উগ্রতা দেখে মাথায় হাত দিলেন। কারণ ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ শুধু যে ফরাসী-রাজ্যের চার দেয়ালে আটকে থাকবে, এমন তো কোন কথা নেই। অন্যান্য রাজ্যে তার ছোঁয়াচ লাগতে কতক্ষণ। হাওয়া পালটাতে তো খুব বেশী সময় লাগে না…। ইউরোপের রাজা এবং রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা রীতিমতো ভাবনায় পড়লেন। নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করতে লাগলেন। অষ্ট্রিয়া আর প্রাসিয়া শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল, ফ্রান্স আক্রমণ করল। উদ্দেশ্য—ফ্রান্সে আবার

আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা। অস্ট্রিয়ার মাথা ব্যথার কারণ ছিল, কারণ অস্ট্রিয়ারই মেয়ে ফ্রান্সের রাণী মারিয়া আঁতোয়ানেত।

ইতিমধ্যে বিপ্লবীরা একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এর ওপর ঠিক এই সময় তাদের নেতা মিরাবোঁ মারা যাওয়াতে গোটা ব্যাপারটা যেন আরও গোলমেলে হয়ে গেল। একদিকে নতুন সংবিধান সভার অধিবেশন চলতে লাগল, অন্য দিকে বিপ্লবীরা উগ্র থেকে উগ্রতর হতে থাকল। এমনি একটি দিনে নেপোলিয়ন বিস্ময়ভরা চোখ মেলে দেখলেন, প্রায় পাঁচ-ছ হাজার মানুষ এগিয়ে আসছে সংবিধান অফিসের দিকে। রক্তচক্ষু, শীর্ণদেহ এই বুভুক্ষু জনতার কারও হাতে ছিল বর্শা, কারও হাতে বন্দুক, লাঠি ইত্যাদি। তাদের অনেকের মাথাতেই জড়ান ছিল টক্‌টকে লাল রং-এর কাপড়ের টুকরো। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন ওরা হল জেকোবিন দলের সদস্য, উগ্র বামপন্থী। বিপ্লবকে কেন্দ্র করে তখন তো বিপ্লবীদের মধ্যে অনেক দলই গড়ে উঠেছে। গিরোনডিস্ট দলের কম প্রতিপত্তি ছিল না। আর এই দলাদলির ফাঁকেই বিপ্লবের আদর্শ হয়েছিল বিকৃত, বিপর্যস্ত।

ঐ রুষ্ট জনতা প্রথমে ঢুকল সংবিধান সভাগৃহে। মুখ তাদের বিপ্লবের জয়গান। তাদের সামনে ছিল এক টুকরো তক্তা, তার ওপর পেরেক দিয়ে আটকানো মৃত ষাঁড়ের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড। তক্তার গায়ে লেখা 'ষোড়শ লুইয়ের কলিজা' (*Coeur de Louis XVI*).।

এরপর তারা গেল ট্যুইলারীর প্রাসাদে। সেখানে ছিলেন রাজা ষোড়শ লুই। প্রাসাদের সুপ্রশস্ত, মসৃণ সোপান বেয়ে ঐ রুক্ষ জনতা ওপরে উঠে গেল। মুখে তাদের নানা রকম ধ্বনি। উত্তেজনায় তখন তারা বড় ভয়ঙ্কর।

আশ্চর্য, মারমুখী জনতার যাবতীয় রোষের লক্ষ্য যে রাজা ষোড়শ লুই, তিনি কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না। শান্তভাবে তাদের উপস্থিতি মেনে নিলেন। তাদের সঙ্গে বসে এক গ্লাস মদ খেলেন। ঘণ্টা দুয়েক এইভাবে থেকে জনতা রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করল…।

নেপোলিয়ন জোসেফকে চিঠি লিখলেন "এই সব ঘটনা বেআইনী, অবৈধ···এর ফল বড় সাংঘাতিক···"।

নেপোলিয়নের এই সাবধানবাণী অচিরেই ফলে গেল। জেকোবিন দলভুক্ত বিপ্লবীরা সব কিছু বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে যা খুশী তাই করতে লাগল। সংবিধান সভার কোন কাজ চালাতে দিল না, কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে চাইল না।

বিপ্লবীদের দাবী অনুযায়ী রাজা তাঁর রাণী, ছেলে, মেয়েদের নিয়ে সংবিধান সভায় উপস্থিত হলেন। তাতে অবশ্য মারামারি, রক্তপাত আটকাল না। কে যে কাকে গুলি ছুঁড়ল, কোথা থেকে যে কি হল, কিছুই বোঝা গেল না। শুধু দেখা গেল রাজার নিজস্ব সেনাবাহিনী সুইস গার্ডরা যখন এই ধরনের খুনখারাপি বাধা দেবার জন্য রুখে দাঁড়াল, বিপ্লবী জনতা তখন মারমুখী হয়ে প্রাসাদ লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুঁড়তে লাগল। সুযোগ পেল জাতীয় বাহিনী—ন্যাশনাল গার্ডস। তারা এই সুযোগে রাজপ্রাসাদের জানলা ভাঙল, দরজা ভাঙল, হাতের কাছে যাদের পেল শেষ করে দিল। কত সহজে কী ভীষণ রক্তপাত, তার সঙ্গে যথেচ্ছ লুঠ-তরাজ! নেপোলিয়ন বিষণ্ণ মনে শুধু ভাবতে লাগলেন, সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার বাণী দিয়ে যে বিপ্লবের শুরু, তার এ কী উচ্ছৃঙ্খল চেহারা···।

১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে অগাস্ট মাসে নেপোলিয়ন ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হলেন। এদিকে ফ্রান্সের ইতিহাস ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল। জেকোবিনরা তখন দুর্বার, দুর্মদ। তারা আরও উল্লসে উঠল যখন তারা ভাল্মীর যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও প্রাসিয়ার সম্মিলিত বাহিনীকে হারিয়ে দিল। বাইরের শত্রু, ভেতরের শত্রু সব নিপাত যাক, এই ছিল তখন বিপ্লবীদের মুখের বুলি। বাইরের শত্রু অস্ট্রিয়া-প্রাসিয়া, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভেতরের শত্রু! ভেতরের শত্রু রাজা, রাণী, রাজপরিবারের লোক, রাজ্যের যত অভিজাতের দল। সেখানে যাকে মনে হবে ঐ অভিজাত, বড়লোক, লতায়পাতায় তাদের সঙ্গে বা রাজার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকে ধর আর মার, মেরেই ফেল। একবার তো

নেপোলিয়ন আর তাঁর বোন মেরী অ্যানকে ঘিরে ফেলা হল, তাঁদের গা থেকে নাকি কেমন একটা অভিজাত অভিজাত গন্ধ বেরোচ্ছিল। নেপোলিয়ন নিজের পরিচয় দিয়ে, ঘেরাওকারী বিপ্লবীদের অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সে যাত্রা বেঁচেবর্তে ঘরে ফিরতে পেরেছিলেন।

ভাল্‌মীর যুদ্ধে জয়ী বিপ্লবীরা উৎসাহের চোটে অস্ট্রিয়ার অধীন বেলজিয়ম আক্রমণ করল। হল্যাণ্ড আক্রমণের তোড়জোড় করল। পিডমণ্টের রাজার কাছ থেকে স্যাভয় আর নিস্ কেড়ে নিল। ইংল্যাণ্ড সতর্ক হল।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। সংবিধান সভা নামান্তরিত হয়েছিল ন্যাশনাল কনভেনসন বা জাতীয় সভায়। কনভেনসনের নির্দেশে বিপ্লব এক নতুন চেহারা নিল। নেপোলিয়নের ওপর নির্দেশ এল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কর্সিকার জাতীয় সেনাবাহিনী দিয়ে তিনি যেন সার্ডিনিয়া আক্রমণের অভিযান তৈরী করেন। সার্ডিনিয়া ফ্রান্সের শত্রু, কর্সিকারও শত্রু। নেপোলিয়ন সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি তৈরী হলেন।

ঠিক এই মুহূর্তে কর্সিকার শাসনকর্তা ছিলেন জেনারেল পায়োলী, ইংল্যাণ্ডে বেশ কয়েক বছর নির্বাসনজীবন কাটিয়ে আবার পা দিয়েছেন কর্সিকায়। দুষ্টু লোকে বলে পায়োলী নাকি আর সেই আগের চেহারায় ছিলেন না। তিনি নাকি তখন রীতিমতো ইংরেজ-ভক্ত হয়ে নিজের দেশ কর্সিকাকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন...।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। নেপোলিয়ন ও কোয়েঞ্জা নামে তাঁর এক সহযোগী সেনাপতি তৈরী হলেন সার্ডিনিয়ার সমুদ্রে মাদালেনা ও কাপ্রেরা নামে দুটো দ্বীপ আক্রমণ করার জন্য। জেনারেল পায়োলীর সে রকমই নির্দেশ। অভিযানের চরম দায়িত্বভার অর্পিত হল পায়োলীর অন্তরঙ্গ সুহৃদ কর্নেল সেজারীর ওপর।

২২শে ফেব্রুয়ারী অভিযান শুরু হল। গোড়ার দিকে শুরুটা ভালই ছিল। অদম্য উৎসাহ ও নিপুণ লক্ষ্যে নেপোলিয়ন এগিয়ে

গেলেন এবং যখন নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে শত্রুসেনাকে আক্রমণ করবেন করবেন ভাবছেন, ঠিক সেই সময় সেজার বারণ করে পাঠালেন। আক্রমণ করার উপযুক্ত সময় নাকি আসেনি। মাঝখান থেকে নেপোলিয়ন তাঁর সঙ্গী-সাথী সেনাবাহিনী নিয়ে একটা গোটা দিন আর ছুটি রাত বৃষ্টিতে ভিজলেন, প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বুঝলেন। মূল্যবান মুহূর্তগুলি চলে গেল। তবু সেজারী আক্রমণের নির্দেশ পাঠালেন না। অবশেষে যখন নির্দেশ এল, তখন সোনার সুযোগ চলে গেছে। নেপোলিয়নদের যে জাহাজটি যুদ্ধক্ষেত্রের সব চাইতে কাছে গিয়ে পৌঁছল, সার্ডিনিয়া থেকে ছুটে-আসা গুলিতে সেই জাহাজের একজন নাবিক মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সবকটি নাবিক ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল। তারা কিছুতেই আর ওখানে থাকবে না, যুদ্ধ করবে না, তারা ঘরে ফিরে যাবে। তারা প্রথমে হুমকি দিল, পরে রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ওদের ভাব-সাব দেখে সেজারী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। কোয়েঞ্জার কাছে একটা চিঠি এল—আর যুদ্ধ নয়, এবার বিরতি।

যুদ্ধই হল না, তার আবার বিরতি! এতবড় হতাশা, এতখানি চমক সেনাপতি নেপোলিয়নের জীবনে এতদিন কখনও আসে নি। জয় যেখানে সুনিশ্চিত ছিল, সেখানে এমন ভাবে সব বানচাল করে দেওয়া···! তবে এই ঘটনাটা নেপোলিয়নের জীবনে একটা মস্ত বড় অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর হ'য়ে রইল। তিনি বুঝেছিলেন কোন যুদ্ধ জয়ের পিছনে অধিনায়কের স্থির সিদ্ধান্ত, নিজের ওপর বিশ্বাস, সুযোগের সদ্ব্যবহার, দৃঢ়তা ও সর্বকার্যে শৃঙ্খলা সবচাইতে প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা নেপোলিয়নের সফল সামরিক জীবনের পেছনে অনেকখানি সহায়তা করেছিল।

নেপোলিয়ন তাঁর দলবল নিয়ে ফিরে এলেন। এসে দেখেন তাজ্জব ব্যাপার। জেনারেল পায়োলী তাঁর ওপর তাঁর ভাই লুসিয়েনের ওপর, বলতে গেলে গোটা বোনাপার্ট পরিবারের ওপর রেগে ব্যোম হয়ে আছেন। বোনাপার্ট পরিবারের একদা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পায়োলীর

এই আচরণের পিছনে অবশ্য একটা কারণ ছিল। লুসিয়েন বোনাপার্ট বক্তৃতা দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, লোককে জানিয়েছিলেন, পায়োলী নাকি আসলে ইংরেজদের চর। তাঁর বর্তমান কার্যবিধি সবই নাকি ইংল্যাণ্ডের সমর্থনে। তিনি এখন মনেপ্রাণে ইংরেজ-অনুগত। লুসিয়েনের এই খবর কনভেনসনের অধিবেশনেও ঝড় তুলল। পায়োলীকে গ্রেপ্তার করার আদেশ জারী করা হল।

নেপোলিয়ন তখনও কিন্তু পায়োলীকে এমন কিছু ভাবতে পারছেন না। তিনি উল্‌টে পায়োলীর সমর্থনে অনেক যুক্তি দেখাতে লাগলেন। তবে পায়োলী এসব কিছুই বুঝলেন না, নেপোলিয়নের আনুগত্য তলিয়ে দেখলেন না, তাঁর মহত্ত্ব বিশ্বাস করলেন না। তিনি তখনও কর্সিকার সর্বময় কর্তা-শাসক। সেই জোরে তিনি এক আদেশ জারি করলেন, নেপোলিয়নকে জীবন্ত হোক আর মৃত হোক—বন্দী করা চাই বা দেখামাত্র গুলি করা চাই…।

এবার আর নেপোলিয়নের পক্ষে পায়োলীর প্রতি আনুগত্য রাখা সম্ভব হল না। তিনি পায়োলীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। স্থির করলেন তিনি আজাক্‌চিও আক্রমণ করবেন। পায়োলীকে কর্সিকা ছাড়তেই হবে।

কিন্তু কিছুই হল না। উল্‌টে নেপোলিয়ন মা, ভাই, বোনেদের নিয়ে নিজেদের বাড়ী-ঘর-দোর ছেড়ে শুধু পরিধানের পোশাকটুকু নিয়ে গোপনে ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলেন। পায়োলীর প্যাঁচের সঙ্গে তিনি লড়তে পারলেন না। দুর্ভাগ্যের আঘাতে আঘাতে নেপোলিয়ন বড় হলেন।

কর্সিকা থেকে নেপোলিয়ন তাঁর মা, ভাই-বোনদের নিয়ে এসেছিলেন তুলোঁ বন্দরে। সময়টা ছিল ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাজা ষোড়শ লুই গিলোটিনে প্রাণ দিলেন ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী। ফ্রান্সের শাসনভার চলে গিয়েছে একটা নতুন শাসনসমিতির হাতে। নাম তার কমিটি অব পাবলিক সেফটি বা জননিরাপত্তা সমিতি। বারো

সদস্য নিয়ে এই সমিতি। তাঁদের নেতা ম্যাক্সমিলিয়ন রোব্‌স্‌পীয়ের। এঁদের নীতি ছিল যা কিছু উত্তম, তাই হল সাধারণ তন্ত্রের আদর্শ। অতএব যা অবৈধ অন্যায়, খারাপ, তাকে দূর কর, তাকে ধ্বংস কর। গলদ দেখা দিল এখানেই কথাটা হল কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ, সেটা কারা বিচার করবে! সেই বিচারক কি শুধু বারোটি লোক! সংস্কার করা ভালো, অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু সংস্কারের নামে উচ্ছেদ! একবার ঐ পথে গেলে তার কোন সীমা থাকে…! আদর্শের মধ্যে আর কি ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়! বিশেষ করে রবস্‌পীয়ের যেখানে মুহুর্মুহু হুঙ্কার ছাড়ছেন…দয়া, মায়া…এসব বর্বরতা!

জেকোবিনদের বিরোধী দল গিরোনডিস্টরা ছিলেন একটু নরমপন্থী। জেকোবিনদের অত উগ্রনীতি, চড়া চড়া কথা তাঁরা পছন্দ করতেন না। সুতরাং জেকোবিন নেতা রব্‌স্‌পীয়েরের ঐ মতবাদ তাঁরা অনেকেই মানতে চাইলেন না। শাসনের নামে এই দুঃশাসন অশুভ বলে মনে হল। রবস্‌পীয়ের বিপ্লবীদের একটি অংশের এই প্রতিকূলতা গ্রাহ্য তো করলেনই না, উপরন্তু আরও উগ্র, একগুঁয়ে মনোভাব দেখালেন। সারা ফ্রান্সে এর পর আরম্ভ হল 'রেন অব টেরর বা সন্ত্রাসের রাজত্ব। রোব্‌স্‌পীয়ের দল যাকেই মনে করলেন তাঁদের মতের পরিপন্থী, তাকেই ল'অব সাসপেক্ট বা সন্দেহের আইনে ধরতে লাগলেন, তাদের ঠেলে পাঠাতে লাগলেন রেভ্যুলিউশ্যনারী ট্রাইবিউনাল নামে নাম্‌কা-ওয়াস্তে একটা বিচারালয়ে। একই দলের লোক সেখানে বিচারকের কাজ করত। বলা বাহুল্য তাদের বিচারে সব অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরই সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হতে লাগল গিলোটিনের তলায়। রক্তাক্ত পথ দিয়ে ফ্রান্সের ইতিহাস গড়িয়ে চলল…।

নেপোলিয়ন কিছুদিন তুলোঁতে থেকে সবাইকে নিয়ে ইতিমধ্যে চলে এসেছিলেন মার্সেল শহরে। নেপোলিয়নের কর্মস্থল নির্দিষ্ট হল এভিগ্‌ননের কাছে।

নেপোলিয়ন বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ কীভাবে নষ্ট হতে বসেছে। দেশ জুড়ে কী সাংঘাতিক গৃহবিবাদের সূচনা দেখা যাচ্ছে! জননিরাপত্তা সমিতির জেকোবিনরা ধর্ম, ন্যায়, নীতি কিছু মানছে না। ওদিকে সারা দেশে বিষফোঁড়ার মতো সশস্ত্র বিরোধীরা দল পাকাচ্ছে। একজন আরেকজনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ন্যাশনাল গার্ডের সৈনিকরা নিরীহ বেসামরিক নগরবাসীদের মারতে কসুর করছে না। আবার তারাও আক্রান্ত হচ্ছে যথেষ্ট। এই ডামাডোলের বাজারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল রয়্যালিস্ট বা রাজতন্ত্রী দল। তার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের ইতিহাসের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের অধিপতিরা···।

বিকৃত বিপ্লবের নিষ্পেষণে নেপোলিয়ন মনের দিক থেকে এত আঘাত পেলেন যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি সামরিক বিভাগে আবেদন জানালেন তাঁকে যেন রাইন অঞ্চলের সেনাবিভাগে বদলি করা হয়। সেখানে তবু তিনি ফ্রান্সের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। কিন্তু এই গৃহযুদ্ধের মধ্যে থেকে তিনি ফরাসীদের মেরে চলবেন, এ সহ্য করা যায় না···।

ঠিক এই সময় তুলোঁ বন্দরকে নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছিল। প্রথমত তুলোঁ ছিল বর্তমান ফরাসী শাসনতন্ত্রের একেবারে বিরোধী, সরকার বিরোধী। দ্বিতীয়ত তুলোঁর অধিবাসীদের মনে এক বদ্ধমূল ধারণা হল যে, ফ্রান্সে শাসনের নামে যে অরাজকতা শুরু হয়েছে, তার অবসান ঘটাতে গেলে ফরাসী সিংহাসনে আবার বুরবোঁ রাজবংশকে ফিরিয়ে আনতে হবে, একজন বুরবোঁ রাজাকে বসাতে হবে।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে অগাস্ট তারা তুলোঁ শহরে সাদা পতাকা তুলে দিল, সপ্তদশ লুইকে ফ্রান্সের রাজা বলে ঘোষণা করল। আর তার পরের দিন অর্থাৎ ২৮শে অগাস্ট সাদর স্বাগত জানাল ইংল্যাণ্ড ও স্পেনকে। ওরা আসুক, তুলোঁ বন্দর ওদের সঙ্গে বাণিজ্য করবে। তুলোঁ ওদের বন্ধু।

কয়েকদিনের মধ্যেই তুলোঁ বন্দর গিজ্‌গিজ্‌ করতে লাগল ইংরেজ, স্প্যানিশ ও ইতালীয় সেনা বাহিনীতে। তুলোঁ বন্দরে নোঙর করল ইংল্যাণ্ড ও স্পেনের জাহাজ।

নেপোলিয়ন প্রমাদ গুণলেন। সরকারের বিরোধিতা করা মানে তো বিদেশী সরকারের হাতে নিজের দেশকে তুলে দেওয়া নয়। তুলোঁ যে পুরোপুরি ইংল্যাণ্ডের তাঁবে চলে যাচ্ছে। একী কাণ্ড! স্বদেশের মাটিতে বিদেশীর আস্ফালন!

নেপোলিয়ন তুলোঁ বন্দরকে বিদেশীর মুষ্টি থেকে উদ্ধারের জন্য নিজেকে কাজে লাগাতে চাইলেন। তখন সলিসেটি ছিলেন তুলোঁ বন্দর-রক্ষাকারীদের মধ্যে একজন ভারপ্রাপ্ত কর্তা ব্যক্তি। নেপোলিয়ন তাঁর কাছে গেলেন। সলিসেটির সঙ্গে বোনাপার্ট পরিবারে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং এই ব্যাপারে নেপোলিয়নের সাহায্য নিতে তাঁর কোন আপত্তি হল না। নেপোলিয়ন নাকি তুলোঁ থেকে ইংরেজ ও স্প্যানিয়ার্ডদের তাড়িয়ে ছাড়বেন। বিশেষ করে ঐ সময় একজন সেনাপতি অসুস্থ থাকায় নেপোলিয়নের কাজ পেতে কোন অসুবিধে হল না। নেপোলিয়ন তুলোঁ উদ্ধারের কাজে মহা উৎসাহে নেমে পড়লেন। জীবনের পথে এ যে কত বড় পদক্ষেপ নেপোলিয়ন বুঝতেও পারেননি। তারিখটা সেপ্টেম্বর মাসের ষোলই।

নেপোলিয়নের মাথার ওপর যে সেনানায়ক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল সেনাপতি কার্তু। কার্তুর অধীনে নেপোলিয়ন এর আগেও কাজ করেছেন। কার্তুর আস্ফালনে নেপোলিয়নের হাসি পেত। কি করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়, কি করে সেনাবাহিনী সাজাতে হয়, কামান ব্যবহার করতে হয়, তার কিছুই কার্তু জানতেন না। একবার কামানের গোলা ঠিক নিশানায় না যাওয়ায় কার্তু বিড়বিড় করে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন…"হতভাগারা যত রাজ্যের ভ্যাদভেদে বাজে বারুদ পাঠিয়েছে…"। নাচতে না জানলে উঠোন তো বাঁকা হবেই।

নেপোলিয়নের বেশ মজা লাগত, আবার বিরক্তও হতেন। যুদ্ধের

ব্যাপারে এই ধরনের অজ্ঞতা থাকলে চলে! চলে না ঠিকই, তবে নেপোলিয়নের জীবনের পরম লগ্নটি কিন্তু এই সুযোগেই এলো। তুলোঁ বন্দরে যে বিদেশী সেনাদল ছিল, যাদের মধ্যে ইংরেজরাই ছিল বেশী, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী বিপ্লবের আগুনটি একেবারে নিভিয়ে দেওয়া, ফ্রান্সে যে বুরবোঁ রাজবংশ ছিল, তাকেই আবার ফিরিয়ে আনা, তার কোন বংশধরকেই রাজপদে বহাল করা।

নেপোলিয়ন একটা জিনিস উপলব্ধি করলেন যে যত দিন যাবে, তুলোঁ বন্দরে বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতির জোর তত বাড়বে। সুতরাং তুলোঁ উদ্ধারের কাজ এখনি আরম্ভ করা উচিত। এতে শুধু তুলোঁরই মঙ্গল হবে না, ফরাসী বিপ্লবকেও বাঁচানো যাবে।

নেপোলিয়ন এই কাজের দায়িত্ব নিতে চাইলেন। তিনি ওপরওয়ালার কাছে আবদন জানালেন, তুলোঁ বন্দরের মুক্তির ভার তাঁকে দেওয়া হোক।

নেপোলিয়নের প্রার্থনা মঞ্জুর হল। নেপোলিয়ন তুলোঁ অভিযানের জন্য তৈরী হলেন। প্রথমেই অ্যান্‌টাইব্‌স্ এবং মোনাকো থেকে বাড়তি কামান-বন্দুক গুলি আনিয়ে নিলেন। তারপর এক লক্ষের মতো বস্তা বালি দিয়ে ভর্তি করলেন। প্রচুর লোক লেগে গেল অনেক ঝুড়ি তৈরী করে সেগুলিকে আবার মাটি দিয়ে ভর্তি করার জন্য। প্রায় আশিটা অস্ত্রাগার তৈরী হল, তারই সঙ্গে তৈরী হল আকেজো, নষ্ট-হ'য়ে-যাওয়া কামান বন্দুক আবার কাজে লাগানোর জন্য মেরামতি কামারশালা।

কামান, বন্দুক নিয়ে আসবার পরেই নেপোলিয়ন সেগুলোকে সাজিয়ে ফেললেন একেবারে সমুদ্রের ধারে। এর পরেই আরম্ভ হল গোলা ছোঁড়াছুঁড়ির ভয়াবহ খেলা···।

ইংরেজপক্ষ থেকে স্বীকার করা হল তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে···। ···

সেনাপতি কার্তুর পক্ষে যেমন মন্তব্য করা স্বাভাবিক তিনি তাই করলেন···।

"প্রতিপক্ষের অত কাছাকাছি যাওয়াটা নেপোলিয়নের পক্ষে উচিত কাজ হয়নি। এ পক্ষেরও তো লোক মরেছে···।"

নেপোলিয়ন তুলোঁ আক্রমণে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে ক্যাপ্টেন নেপোলিয়নকে মেজর পদে প্রমোশন দিলেন।

এরপর নেপোলিয়ন তুলোঁ বন্দরকে পুরোপুরি উদ্ধার করার কাজে লেগে গেলেন। পরিকল্পনাটি বেশ ভালোই ছিল। নেপোলিয়ন প্রথমেই চাইলেন ইংরেজ জাহাজ আক্রমণ করে হঠিয়ে দিতে, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজ সরিয়ে দিতে পারলে বন্দরটা খুব সহজেই হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

প্রথমেই বেছে নিতে হবে একটা উঁচু জায়গা, যেখান থেকে ইংরেজদের জাহাজ ভালোভাবে নিশানা করা যাবে। যেখান থেকে কামানের গোলা ছুঁড়লে তা সার্থক হবে···।

পছন্দমত উঁচু জায়গা মিলল তুলোঁ থেকে দু' মাইল দক্ষিণে। পছন্দ তো হল, কিন্তু ঐ জায়গাটা দখল করা যায় কি করে। ওখানে তো আগের থেকেই খরদৃষ্টি মেলে রেখেছে মালগ্রেভ দুর্গ, ইংরেজদের দুর্গ। ফরাসীদের কাছে যার পরিচয় ছিল ছোট জিব্রালটার বলে। সুতরাং আগে মালগ্রেভ দুর্গটি দখল, তবে না ঐ উঁচু জায়গা থেকে নিশানা করা···! আর সব চাইতে বড় কথা হল একবার যদি মালগ্রেভ দুর্গের পতন হয়, তাহলে তুলোঁ বন্দরে ইংরেজ শক্তিরও পতন ঘটবে। অতএব এখন আর অন্য কথা, অন্য কাজ নয়। এখন একমাত্র ঐ দুর্গ দখল করা···।

নেপোলিয়ন মালগ্রেভ দুর্গ বা ছোট জিব্রালটার দখল করার জন্য একটা পরিখা খুঁড়ে কামান সাজিয়ে ফেললেন। অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপক্ষের কামান গর্জে উঠল। কামান গর্জে উঠল এ পক্ষেরও। পুরো দুদিন ধরে এই ব্যাপার চলল। নেপোলিয়ন ও তাঁর সঙ্গীদের প্রাণের আশঙ্কা ছিল প্রতি মুহূর্তে। তার ওপর আবার শুরু হল বৃষ্টি, অঝোর ধারায় বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। এত হাওয়া যে, মাথা উঁচু বিরাট বিরাট পাইন গাছগুলো মাটিতে নুয়ে পড়তে লাগল···।

সাত হাজার সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ন তৈরী হলেন। ডুগোমিয়্যর ছিলেন ওপরওয়ালা সেনাপতি। তিনি বললেন এই ঝড়ে বৃষ্টিতে যুদ্ধ আরম্ভ করা অসম্ভব, অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা তাঁদের অপেক্ষা করতেই হবে। এদিকে নেপোলিয়ন আবার কোন দিনই কাজ আরম্ভ করতে গিয়ে থেমে থাকা পছন্দ করতেন না। তিনি যুক্তি দিয়ে ডুগোমিয়্যরকে বোঝালেন, আক্রমণ এক্ষুণি করতে হবে উপযুক্ত সময় এসে গেছে···।

আক্রমণ শুরু হল। ডুগোমিয়্যর নিলেন পাঁচ হাজার সৈন্য পরিচালনার ভার। নেপোলিয়নের হাতে রইল তুহাজার সৈন্য। এদিকে নেপোলিয়ন তুর্গ লক্ষ্য করে কামান দাগতে লাগলেন। মিনিটে চারটে করে আগুনের বল ছিট্‌কে পড়তে লাগল তুর্গের গায়ে। অন্যদিকে বেয়নেট হাতে নিয়ে এগোল আরেক সৈন্য দল। তুর্গের বাইরে খানিকটা জায়গা দখলেও এসে গেল। তবে যত কাছাকাছি যাওয়া গেল, প্রতিপক্ষের গোলা বর্ষণ ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। এদিকের কিছু সৈন্য মারা যেতেই অন্যান্য ফরাসী সৈন্যরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তারা পিছু হঠতে চাইল। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার তাদের উৎসাহ জাগান হল। তবে তারা যতবারই তুর্গের তীক্ষ্ণ শলাকাবিদ্ধ মোটা পাঁচিলের গায়ে ঘা মারতে গেল, ততবারই প্রত্যাঘাতে জর্জরিত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হল। ব্যাপার দেখে ডুগোমিয়্যর এবার নেপোলিয়নকে বললেন তুর্গ আক্রমণ করতে।

নেপোলিয়ন ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে তু হাজার সৈন্য। তুর্গের দিকে একটু না এগোতে ধারাবর্ষণে আক্রমণ শুরু হল। যে ঘোড়াটির পিঠে নিপোলিয়ন বসেছিলেন, সেটি গুলির ঘায়ে মারা গেল। নেপোলিয়ন মাটীতে পা দিলেন। স্থিরচিত্তে গোটা পরিস্থিতিটার মোকাবিলা করতে চেষ্টা করলেন। তিনি একেবারে তুর্গের গায়ে পৌঁছলেন। এবার দেয়াল বেয়ে ওঠার পালা। ঐ কাঁটা কাঁটা সুচলো কাঠ-গাঁথা মোটা দেয়ালের গা বেয়ে ওঠা কত কঠিন তা বর্ণনা করা যায় না। দাঁতেরপাটিতেবন্দুক চেপে ধরে নেপোলিয়ন তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগলেন। কখনও দেয়াল ধরে, কখনও বা

একজন আরেকজনের কাঁধে উঠে দুর্গের ভেতরে যাবার পথ বার করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কারণ দুর্গের ভেতরে গিয়ে যতক্ষণ না শত্রুদের ধ্বংস করা যাবে, ততক্ষণ দুর্গের পতন হবে না। অবশেষে নেপোলিয়ন আর তাঁর দুই সঙ্গী সেনাপতি মুইরোন ও দুগোমিয়্যার দেয়াল ডিঙিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়লেন। সেখানে দু'ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলল। তারপর শেষরাতে ইংরেজরা দুর্গ ছাড়তে বাধ্য হল। ফরাসী সেনানায়কদের হাতে দুর্গের পতন হল···।

নেপোলিয়ন আহত হয়েছিলেন। বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর বর্শার আঘাতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, প্রচুর রক্ত পড়ছিল। ডাক্তার প্রথমে স্থির করলেন, পা'টি কেটে বাদ দিতে হবে, নইলে গ্যাংগ্রীন বা পচন ধরবে, নেপোলিয়নকে বাঁচানো যাবে না। কি ভেবে ডাক্তার আবার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করলেন। এবার অভিমত দিলেন, ঠিক আছে, পা খানা কেটে একবারে বাদ না দিয়ে একটু দেখাই যাক···নেপোলিয়ন কিছুদিন ভুগলেন, উরুর ক্ষত একটু বিষিয়ে গেল বটে, তবে সেরে উঠলেন। তুলোঁর যুদ্ধজয়ের স্বাক্ষর হয়ে রইল ঐ বাঁ হাঁটুর ওপর গভীর ক্ষতচিহ্ন।

এক-একবার মনে হয় ডাক্তার যদি দ্বিতীয় বার নেপোলিয়নের আহত জায়গাটি পরীক্ষা না করতেন, প্রথমবারের সিদ্ধান্তটাই বহাল রাখতেন, তা হলে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস কোন্ খাতে বইত, কে জানে···

তুলোঁ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে ইংরেজদের অন্য যে সব দুর্গ, ঘাঁটি ইত্যাদি ছিল, সব কিছুর পতন ঘটল। ইংরেজদের জাহাজ লক্ষ্য করে নেপোলিয়ন এমনভাবে কামান দাগতে লাগলেন যে, পালানো ছাড়া পথ রইল না।

তুলোঁ অভিযান সম্পূর্ণ সার্থক হল। তুলোঁ জয় নেপোলিয়নের জীবন-ইতিহাসে এগিয়ে চলার স্বাক্ষর।

এদিকে জন-নিরাপত্তা-সমিতি স্বদেশ ভক্তির নামে বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু করল। সমিতির সদস্যেরা রক্তলোলুপ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। এই

বুঝি ঐ লোকটি অভিজাতদের সঙ্গে একটু বেশী মেলামেশা করছে, দাও ওকে মেরে। ঐ বুঝি কে ইংরেজদের সঙ্গে তলায় তলায় মিতালি পাতিয়েছে, দাও শেষ করে। লোকটাকে যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে, দাও ওকে কবরের দিকে ঠেলে···।

নিছক সন্দেহের বশে এই ধরনের কত লোককে যে কারারুদ্ধ করা হল, কত লোককে গিলোটিনের তলায় মাথা পাততে হল, আরও কত লোক যে গুলির ঘায়ে শেষ হল, তার ঠিক নেই। এই ব্যাপারে কোন বিচার হল না, কোন প্রতিবাদ হল না। তখন প্রতিবাদ করবার সাহসই বা কোথায়···!

তুলোঁ জয়ে কৃতিত্ব দেখানোর পুরস্কার হিসেবে নেপোলিয়ন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত হলেন। মাইনে পত্তর বাড়ল, তার সঙ্গে সম্মান। নেপোলিয়ন তাঁর মা, ভাই-বোনদের এবার একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখতে চাইলেন। লা স্যালি নামে সুন্দর জায়গায় ছবির মতো বাড়িতে নেপোলিয়ন সবাইকে নিয়ে এলেন। বাড়ির চারদিকে পাম, ইউক্যালিপটাস, কমলালেবুর গাছ। বাড়ির সীমানায় একটা ছোট্ট নদী, ঝর্ণার মতো তিরতিরিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বড় সুন্দর, বড় মনোরম···

নেপোলিয়নের ভাই-বোনেরা এর মধ্যে বেশ বড়ো হয়েছে। বোন-দের মধ্যে পলিন বড় সুন্দরী। কথায় ব্যবহারে চটুল। পুরুষ ভোলাতে ওস্তাদ।

ভাইদের মধ্যে নেপোলিয়নের বড় প্রিয় লুই। নেপোলিয়ন লুই সম্পর্কে প্রায়ই মন্তব্য করতেন···এমন বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, উষ্ণ-হৃদয়, দয়ালু ছেলে বড়ো একটা হয় না···।

নেপোলিয়নের মাথা ধরে যেত ভাই লুসিয়নের ভাব-ভঙ্গী, কথা-বার্তা শুনে। অদ্ভুত বেপরোয়া, একগুঁয়ে, উগ্রস্বভাবের ছেলে। সব সময়েই যেন রাগ-রগী। তবু এই সময়টা নেপোলিয়নের জীবনে ছিল বড় সুখী সময়। মা, ভাই-বোনগত প্রাণ নেপোলিয়নের দিন কাটছিল

জলের মতো। তবে নেপোলিয়নের মাথায় চিন্তার ভারও ছিল যথেষ্ট। ফ্রান্সের চৌহদ্দি থেকে ইংরেজদের কীভাবে তাড়াবেন নেপোলিয়ন শুধু সেই পরিকল্পনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। ইংরেজদের ওপর বড়ো রাগ। রাগ তো থাকবেই। সেই যে কর্সিকাকে বাঁচানোর জন্য নেপোলিয়ন শত চেষ্টা করেও ম্যাডেলোনায় পিছিয়ে আসত বাধ্য হয়েছিলেন, আর কর্সিকা চলে গিয়েছিল ইংরেজদের হাতে, এই দুঃখ কি নেপোলিয়ন ভুলতে পারেন! অমন সাধের জন্মভূমি কিনা শত্রুর হাতে!

নেপোলিয়ন যখন এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিলেন ঠিক সেই সময় তাঁর জীবনে বড়ো বিপদ ঘনিয়ে এল, একবার নয়, দু-দুবার। নেপোলিয়ন মার্শেলে একটা জীর্ণ দুর্গ সংস্কারের জন্য কর্তাব্যক্তিদের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। যে চিঠি তিনি লিখেছিলেন তাতে শেষের দিকে একটা লাইন জুড়ে দিয়েছিলেন—"দুর্গে কামান ফিট করি, তারপর এই শহর দখল করতে কতক্ষণ···!" ব্যাস, আর যায় কোথায়। ওপর-ওয়ালারা ধরেই নিলেন নেপোলিয়নের অন্য কোন মতলব আছে। সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নকে সন্দেহের আইনে ধরা হল। নেপোলিয়ন নিজের বাড়িতে অন্তরীণ হয়ে রইলেন। কটা দিন বড়ো উৎকণ্ঠায় কাটল। অবশেষে প্রমাণের অভাবে, আসলে শুভার্থী সলিসেটির চেষ্টায় নেপোলিয়ন সে যাত্রা ছাড়া পেলেন, বেঁচে গেলেন···

দু নম্বরের বিপদ এল ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। জেকোবিন দলের নেতা ম্যাক্সমিলিয়ন রোব্‌স্‌পীয়েরের ছোট ভাই ছিলেন অগাস্টিন রোব্‌স্‌পীয়ের। নেপোলিয়ন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি অগাস্টিনকে গোপনে পাঠালেন জেনোয়ায়, ওখানকার সামরিক তথ্য ইত্যাদি খুঁটিনাটি জেনে আসবার জন্য। অন্য সময় হলে কিছু হতো না। কারও কিছু এসে যেত না। কিন্তু এর মধ্যে তো আবার জমানা পাল্‌টে গিয়েছিল।

বড়ো রোব্‌স্‌পীয়ের সাধারণতন্ত্রের নামে সন্দেহের আইন প্রয়োগ করে এত লোককে গিলোটিনের তলায় ফেলে মারছিলেন যে এবার

প্রতিক্রিয়া শুরু হল। হাওয়া উল্‌টো দিকে বইতে শুরু করল। করবেই। কারণ মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যে গিলোটিনে প্রাণ দিল তেরো শ' লোক। মৃত্যুর আগে তাদের না হয়েছে কোন বিচার, না শোনা হয়েছে তাদের কোন বক্তব্য। ছাদ থেকে টালি খসে পড়ার মতোই বধ্য-ভূমিতে মাথা পড়তে লাগল। লোকের মন বিষিয়ে উঠল। বিষিয়ে উঠল কনভেনশনের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যর মন। এবার সকলের রাগ গিয়ে পড়ল রোব্‌স্‌পীয়েরের ওপর। "ওকে বন্দী করো, ওকে মেরে ফেল। ও যেমন করে এত লোকের গলা কেটেছে, তেমনি করে ওরও গলা কেটে ফেল···আর দেরি নয়, ওকে শেষ কর···।"

ফল যা হবার হল। ম্যাক্সমিলিয়ন রোব্‌স্‌পীয়ের, বড় রোব্‌-স্‌পীয়ের, যিনি কিনা অতবড় বিপ্লবী নেতা, যাঁর নির্দেশেই কিনা গিলো-টিনের খড়্গ কত নিরপরাধ লোকের রক্তে কতবার নিষিক্ত হয়েছে, সেই তিনিই এবার গিলোটিনের নিচে মাথা পেতে দিতে বাধ্য হলেন। ছোট ভাই অগাস্টিন রোব্‌স্‌পীয়েরকেও ঐ একই ভাগ্যের সঙ্গী হতে হল।

দুই রোব্‌স্‌পীয়েরের মৃত্যুর পর এবার খোঁজ পড়ল সেই সব ব্যক্তিদের, যাঁরা এতদিন কোন-না-কোন সুবাদে ঐ দুই ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বা পরিচিত ছিলেন। খোঁজ পড়ল নেপোলিয়নের। তিনি না অগাস্টিন রোব্‌স্‌পীয়েরের বন্ধু ছিলেন! কেন নেপোলিয়ন অত চুপিসাড়ে জেনোয়াতে অগাস্টিনকে পাঠিয়েছিলেন, এ্যাঁ! কি মতলব ছিল! সন্দেহের আইন তো ধুয়ে মুছে যায়নি! সে তো এখনও চালু আছে! সুতরাং নেপোলিয়নকে সন্দেহ করতে বাধা হল না। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এবার চার্জ এল, তিনি নাকি ফ্রান্স থেকে প্রচুর সোনা পাচার করে জেনোয়ার ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন। তাই ছোট রোব্‌স্‌পীয়েরের সঙ্গে অত বন্ধুত্ব, তাঁর সঙ্গে অত গুজগুজ ফুস্‌ফুস্‌। এমন লোককে তো সন্দেহ করতেই হবে। দারুণ সন্দেহজনক। অতএব নেপোলিয়নকে সাসপেণ্ড করা হল। তাঁকে তাঁর বাড়িতে কড়া পাহারায় বন্দী করে রাখা হল। নেপোলিয়ন দিন গুণতে লাগলেন, কবে ডাক পড়বে গিলোটিনের তলায় মাথা পেতে দেওয়ার জন্য···।

নেপোলিয়ন একখানা চিঠি লিখলেন শুভার্থী সলসেটিকে···
"রেপাবলিক ফ্রান্সের জন্য আমি সব দিয়েছি। তুলোঁ অভিযানে আমি প্রাণপণ করেছি। স্বাদেশিকতা আর ন্যায়-নীতির আদর্শ থেকে নিজেকে কখনও সরিয়ে নিইনি, আর আজ আমিই কিনা দেশদ্রোহী বলে অভিযুক্ত···!"

নেপোলিয়নের কাগজ-পত্র সব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হল। অনেক খোঁজখবর হল। তারপর সব সন্দেহের অবসানে পনের দিন বন্দী থাকার পর নেপোলিয়ন মুক্তি পেলেন। তিনি আবার স্বপদে ফিরে এলেন।

নেপোলিয়নের এবার বড় ইচ্ছে হল কর্সিকাকে ইংরেজদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। এই ব্যাপারে বেশ খানিকটা যোগাড়-যন্ত্রও করলেন। তবে ব্যাপার-স্যাপার দেখে বুঝতে পারলেন কর্সিকা উদ্ধার করা অত সহজ নয়। কার সাধ্য ইংরেজদের নৌশক্তির কাছে দাঁড়ায়! বিশেষ করে ইংরেজরা কর্সিকাকে যখন একটা শক্ত নৌঘাঁটি তৈরী করবার তালে রয়েছে।

নেপোলিয়ন সমরবিভাগ থেকে একখানা চিঠি পেলেন। তাঁকে এবার পশ্চিম সেনাবাহিনীতে কার্যভার গ্রহণ করতে হবে। নেপোলিয়ন যেন প্রস্তুত হন···।

নেপোলিয়নের একেবারে পছন্দ হল না। প্রথমতঃ চাকরি হিসেবে ঐটা ছিল একটু কম মর্যাদার চাকরি, দ্বিতীয়তঃ ঐ বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল গোঁড়া ফরাসী ক্যাথলিকদের উচ্ছেদ ঘটানো।

নেপোলিয়নের মন চাইল না, ফ্রান্সের সেনাপতি ফরাসী-নিধনে নিয়োজিত হবেন! তিনি প্যারিসে এসে সমর বিভাগে আবেদন জানালেন তাঁকে যেন অতিঅবশ্য অন্য কোন বিভাগে দেওয়া হয়।

আবেদন না-মঞ্জুর হল। দুঃখে হতাশায় নেপোলিয়ন ছুটি নিলেন। যুক্তি দেখালেন শরীর অসুস্থ। এই সময় নেপোলিয়নের জীবন কাটতে লাগল বড় একঘেয়ে, বিশ্রী। বড় নীরস। একে চাকরির এই অবস্থা, ওদিকে প্যারিসে থাকা খাওয়ার খরচ অত্যন্ত বেশী, তার

ওপর আরও নানা রকমের অশান্তি। এঁকে ধরলেন, ওঁকে ধরলেন, কিন্তু বৃথা, কোন দিক থেকে কোন কিছু সুরাহা হল না।

এমনি করেই কিছুদিন কাটল। নেপোলিয়ন মনে-প্রাণে বিমর্ষ হয়ে রইলেন। বড় ভাই জোসেফকে চিঠি লিখলেন—"ইচ্ছে করছে গাড়ির চাকার নিচে পড়ে মরি···।"

নেপোলিয়ন সামরিক বিভাগে গিয়ে বার বার আবেদন জানালেন যাতে তাঁকে ইটালীর সীমান্তে বদলি করা হয়। আবেদন পত্রের সঙ্গে নেপোলিয়ন পীড্‌মণ্ট আক্রমণ করবার সুন্দর একটি নক্‌শা দিলেন। কিন্তু দিলে কী হবে, নক্‌শার মধ্যে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ নেপোলিয়নকে কোন সামরিক ক্ষেত্রে না পাঠিয়ে প্যারিসের অফিসে কাজ দিল, যে কাজে কোন উত্তেজনা নেই, যুদ্ধ নেই, আছে শুধু করণিকের মতো বসে বসে খাতার কাজ করা! সেনাপতি নেপোলিয়নের এ কী হাল···

নেপোলিয়ন ভাবতে শুরু করলেন। একবার ভাবলেন রুশ রেজিমেণ্টে চাকরি নেবেন। আবার ভাবলেন তুর্কীর কথা। তুর্কীর গোলন্দাজ বাহিনী দুর্বল ছিল। তাকে ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য প্যারিস থেকে ওখানে একটা সামরিক মিশন পাঠানোর কথা চলছিল। এই বিষয়ে দু'দেশে নানা প্রস্তাবের আদান-প্রদান হচ্ছিল। নেপোলিয়ন এই সুযোগে তুর্কী যেতে চাইলেন। যাওয়ার ব্যবস্থাও প্রায় হল। ঠিক এই সময়ে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থার আবার একটা পরিবর্তন এল, আর এই পরিবর্তনের কর্মসূচী দেখে নেপোলিয়ন খুশী হলেন। এবার যেন ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষের মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।

ঠিক হল, আর গিলোটিনের আঘাত নয়। আর রক্তপাত নয়। এবার থেকে গঠনমূলক কাজ। নইলে কালক্রমে ইউরোপের ম্যাপে ফ্রান্সের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কারণ ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের রাজারা শ্যেনদৃষ্টিতে ফ্রান্সের দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবখানা, গোলমালটা যখন ওখানেই পেকেছে, তখন দাও ঐ জায়গাটা শেষ করে।

স্থির হল পাঁচজন সদস্য বা ডিরেক্টরকে নিয়ে একটা ডিরেক্টরী সভা বা শাসন সমিতি হবে। তার অধীনে দুই কক্ষ-বিশিষ্ট একটা আইনসভা থাকবে। ডিরেক্টরী সভার কর্মধারা হবে বিপ্লবের আদর্শকে আন্তরিকভাবে মেনে চলা।

পরিকল্পনা হল বটে। কিন্তু কত মত যে দেখা দিল তার ঠিক নেই। বিপ্লবের উগ্রতা কমে যাওয়া মাত্রই বিভিন্ন দল বিভিন্ন সুরে কথা বলতে চাইল। এদের মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হল "রয়ালিস্ট" বা রাজ-সমর্থনকারীদের দল, যারা অষ্টাদশ লুইকে তখন সিংহাসনে বসানোর পক্ষপাতী ছিল এবং এই ব্যাপারে ইংরেজদের সাহায্য নিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। ওদিকে চরমপন্থীরাও চুপচাপ ছিল না। কিছু একটা করবার জন্য তারাও সুযোগ-সন্ধানী হয়ে উঠেছিল। মাঝখান থেকে ইংরেজরা এই পারস্পরিক বিবাদে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এগিয়ে এল। ঠিক এই সময় নেপোলিয়নকে আহ্বান জানালেন ডিরেক্টরী সভার অধীনে সবেনিযুক্ত সেনাপতি-প্রধান পল বারাস। একদিন যখন কনভেনশন বা জাতীয় সভার একটা জরুরী অধিবেশন চলছিল, তখন পল বারাস নেপোলিয়নকে কাছে ডাকলেন।

মাথাটা ঝুঁকিয়ে একটু চাপা গলায় পল বারাস নেপোলিয়নকে বললেন, "আমার সেনাবাহিনীতে আসবে? একটু থেমে বললেন, "তিন মিনিট সময় দিচ্ছি। এখুনি তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে জানাতে হবে..."

রাত তখন গভীর। বাইরে বৃষ্টি, তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া...।

নেপোলিয়ন মুহূর্তের জন্য ভাবলেন। স্বদেশভূমি ও বিপ্লবের আদর্শকে বাঁচানোর জন্য বিপ্লব-বিরোধী দেশদ্রোহীদের দমন করার এই হল সুবর্ণক্ষণ। ফ্রান্স তখন নৈরাজ্যের হুঙ্কারে কাঁপছে। নীতি, অনুশাসন, দেশ গড়ার কর্মসূচী ইত্যাদি কোন কিছুকেই তখন তথাকথিত রাজানুগতের দল ও কনভেনশন-বিরোধী নৈরাজ্যবাদীরা মানছে না। একই দেশের মাটিতে তখন গৃহবিবাদের আগুন জ্বলে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে এসে ধিকিধিকি করছে...।

"আমি রাজী"···নেপোলিয়ন উত্তর দিলেন। আসলে নেপোলিয়নকে এইভাবে কাজে নেবার মূলে কিন্তু পল বারাস ছিলেন না, ছিলেন স্টানিসলাস ফ্রেরোন বলে আরেকজন বিচক্ষণ ব্যক্তি।

সত্য কথা বলতে কি, পল বারাস ছিলেন একজন অতি সাধারণ শ্রেণীর সেনাপতি। ভাগ্যবলে তিনি প্রধান সেনাপতি হলেও সেই যোগ্যতা তাঁর ছিল না। সুতরাং বিরোধীদের দমন করার কাজে সাহায্য করবার জন্য একজন সুদক্ষ সেনাপতির নিতান্তই দরকার, আর সেই সুবাদেই ডাক পড়ল নেপোলিয়নের।

"কামানগুলো কোথায়?" কার্যভার গ্রহণ করবার পর নেপোলিয়নের প্রথম জিজ্ঞাসা···।

নেপোলিয়ন জানতে পারলেন খান চল্লিশের মতো কামান রয়েছে ছ'মাইল দূরে স্যাব্লন্স্ বলে একটা জায়গায়। ওখান থেকে কামানগুলো নিয়ে আসা রীতিমতো কষ্টসাধ্য। কারণ বিরোধীদের একদল আগেই সেইদিকে রওনা হয়ে গেছে···।

নেপোলিয়ন মুরাট নামে এক কর্মদক্ষ ছোকরা ক্যাভাল্‌রি অফিসারকে বললেন, "শ'দুয়েক অশ্বারোহী নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার স্যাব্লন্স্-এ চলে যাও, কামানগুলো নিয়ে এসো, আর সঙ্গে যতটা পারো গোলা-বারুদ···"

"আর শোন" নেপোলিয়ন মুরাটকে খুব কাছে ডেকে বললেন, "দরকার হলে তরবারি ব্যবহার করো—মোট কথা কামানগুলো চাই-ই···!"

নেপোলিয়ন যোগ্য লোককেই পাঠিয়েছিলেন। মুরাট বিরোধীদের আগেই স্যাব্লন্স্-এ পৌঁছিয়েছিলেন। ফলে কামানগুলো নিয়ে আসতে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ভোর ছ'টার মধ্যেই নেপোলিয়ন তাঁর প্রার্থিত জিনিস পেয়ে গেলেন···। এইবার আসল কাজের শুরু। ট্যুইলারীর প্রাসাদে ছিল কনভেনশন ও ডিরেক্টরী সভার অফিস। এই সব আক্রমণ করে বিপ্লবের আদর্শ ও বিপ্লবোত্তর সব কিছু নিয়ম নীতি নষ্ট করাই ছিল বিরোধী দলের প্রধান উদ্দেশ্য।

গোপনে খবর এল, প্রাসাদের উত্তর দিক থেকে নাকি বিরোধীদের একটা বিরাট দল নানারকম অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসছে। সংখ্যায় তারা অন্ততঃ ত্রিশ হাজার। নেপোলিয়ন প্রমাদ গুণলেন। তাঁর দলের সৈন্য সংখ্যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে আট হাজারের বেশি নয়…।

নেপোলিয়ন অবশ্য সাহস হারালেন না বা মুষড়ে পড়লেন না। বরঞ্চ কামানগুলো আরও ভালোভাবে সাজালেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিদ্রোহীদের সঙ্গে একটু পরেই যে লড়াই হবে, তাতে যদি জিততে হয়, তা হলে কামানের খেল্ দেখাতে হবে। নইলে ত্রিশ হাজার আট হাজারকে পিঁপড়ের মতো টিপে মারবে।

নেপোলিয়ন আটখানা কামান সাজালেন উত্তর দিকে। ছ'খানা কামান রইল একেবারে রাজপথের ওপর সেন্ট রচ্ গীর্জার দিকে মুখ করে।

কামানগুলিতে বারুদ পুরে নেপোলিয়ন একেবারে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন বিরোধীরা কখন আক্রমণ করে এই আশঙ্কায়।

সমস্ত সকালটা কেটে গেল। বেলা বাড়তে লাগল, ঝিরঝিরিয়ে খানিকটা বৃষ্টিও হয়ে গেল…কিন্তু ঐ দলের কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

সাড়া পাওয়া গেল আরও কিছুক্ষণ পরে। কিছুক্ষণ পরেই কানে এল ড্রামের ডিমি ডিমি আওয়াজ, তার সঙ্গে গোলা-গুলির শব্দ, অনেকজনের মিলিত সোরগোল। বেলা তখন তিনটে। বিরোধী দল এগিয়ে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বারাস ও নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর ওপর। ঘণ্টাখানেক ধরে ও-পক্ষের তীব্র আক্রমণ চলল। বিরোধীরা বারাসের তৈরী বাধা-প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। তাদের বন্দুক, তাদের বেয়নেটের আঘাতে জর্জরিত হল এ-পক্ষের সেনাবাহিনী। এক সময়ে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মনে হল আর বুঝি কিছুই রক্ষা করা গেল না, না কনভেনশন ও ডিরেক্টরী সভা, না বিপ্লবের আদর্শ…।

হঠাৎ নেপোলিয়নের কামান গর্জে উঠল। কামানের মুখ থেকে ক্রমাগত বেরিয়ে আসতে লাগল আগুনের প্রাণঘাতী গোলা। গোলা বর্ষণের যেন কোন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। বিরোধীরা এমন অবিরাম গোলা বর্ষণের জন্য তৈরী ছিল না। তারা ক্রমশ পিছু হটতে লাগল, চেষ্টা করল অন্য আরেকটা পথ ধরে ফিরে যেতে। কিন্তু সে পথেও নেপোলিয়নের আগের থেকে সাজিয়ে-রাখা কামান গর্জে উঠলো। নেপোলিয়ন যেন আগের থেকেই জানতেন, শত্রুরা যখন পিছু হঠবে, তখন কোন্ পথটা তারা ধরতে চাইবে।

অবশেষে বিরোধীরা পালাতে শুরু করল। পিছু পিছু ধাওয়া করল সরকার পক্ষের সৈন্য। দু'পক্ষে আহত নিহতের সংখ্যা প্রায় একই হল···। নেপোলিয়নের দুঃসাহসিক কামান দাগার কৌশল সরকারের বিরুদ্ধে এমন সর্বনেশে বিদ্রোহকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চুপ করিয়ে দিল···।

পল বারাস সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন, "আমাদের প্রজাতন্ত্র শাসন এখন নিরাপদ···।"

স্টানিসলাস ফ্রেরোন কনভেনশনের অধিবেশনে বললেন, "আমাদের এই সভার জন-প্রতিনিধিরা যেন সেনাপতি বোনাপার্টকে না ভুলে যান, যিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু সংগঠন করে বিরোধীদের দমন করেছেন। বিপ্লবকে বাঁচিয়েছেন···।"

উপস্থিত প্রতিনিধিরা সোল্লাস অভিবাদন জানাল···।

দায়িত্ব পেলে এবং সেই দায়িত্ব পালনে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকলে নেপোলিয়নের যোগ্যতা কতদূর উঠতে পারে, তার পরিচয় সর্বপ্রথম এই পাওয়া গেল। তারই সঙ্গে সবাই বুঝতে পারল কামান ব্যবহারে নেপোলিয়ন কত দক্ষ!

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর। জাতীয় সভায় শেষ অধিবেশন। পরের দিন থেকে শুরু হচ্ছে ডিরেক্টর সভার শাসন।

স্থির হল পল বারাস আর প্রধান সেনাপতি থাকবেন না। তিনি

এবার ডিরেক্টরী সভার অন্যতম ডিরেক্টর হবেন আর তাঁর জায়গায় প্রধান সেনাপতির পদে অবশ্যই আসবেন রেপাবলিক ফ্রান্সের পরিত্রাতা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। নেপোলিয়নের বয়স তখন ছাব্বিশ। পদ-মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে নেপোলিয়নের ইউনিফর্ম হল সোনালী লেসের কাজ করা জমকালো পোশাক। বাসস্থান পালটে গেল, মাইনে বাড়ল।

নেপোলিয়নের মন ভরে উঠল খুশির উচ্ছ্বাসে…।

"আমার মা, আমার ভাই-বোনেদের আর কোন দুঃখ থাকবে না, কোন কিছুর অভাব হবে না।" কিছুদিনের মধ্যে নেপোলিয়ন জোসেফকে বসিয়ে দিলেন ইটালীর কন্সাল পদে। লুসিয়েনকে উত্তরের সেনাবাহিনীতে কমিশনার করে দিলেন। লুইকে প্রথমে একটা ছোটো-খাটো সেনাপতির পদ দিয়ে পরে তাঁকে নিজের এডিকং-এর পদে নিয়ে নিলেন। সব চাইতে ছোট ভাই জেরোমকে ভর্তি করে দিলেন ভালো স্কুল-বোর্ডিং-এ।

মা, ভাই, বোন—এদের জন্য কিছু করতে পারলে কি যে ভাল লাগে! জোসেফকে নেপোলিয়ন একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, "জানো, আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ আমাদের পরিবারের জন্য কিছু একটা করতে পারা…।"

নেপোলিয়ন তাঁর জীবনপথে এগিয়ে যাবার, অভিলাষ পূর্ণ হবার একটা প্রশস্ত পথ খুঁজে পেলেন। একদিকে নিজের ও সংসারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা অন্যদিকে সকল দুর্গতির অবসানে দেশে সুন্দর সাবলীল শাসনব্যবস্থার প্রচলন। সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে নেপোলিয়ন এখন বড় নিশ্চিন্ত, বড় সুখী।

নেপোলিয়ন জোসেফকে চিঠি লিখলেন…"আর মাত্র ক'টি বছর, তার মধ্যে দেখবে দেশ শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে…এখন দরকার মাত্র কয়েকটি বছর"…

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আবহাওয়ায় নাকি ভারতবর্ষের হাওয়ার মিশেল আছে। তাই ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের গায়ের রং ফ্যাক-ফ্যাকে সাদা নয়, চোখ শুধু নীলিমায় নীল, এতটুকু পিঙ্গল নয়। চুল

কালো, কালো ভ্রূ। মুখ কমনীয় লাবণ্যে ভরা। বিশেষ করে মেয়েদের মুখ।

নেপোলিয়ন পছন্দ করতেন এমন চেহারার শ্রীময়ী মেয়ে। মেয়ে হবে মেয়েলি—এই ছিল নেপোলিয়নের মনের কথা। যখনই কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতেন, নেপোলিয়ন সাগ্রহে তাকিয়ে দেখতেন তার হাত আর পায়ের দিকে। মেয়ের হাত হবে কোমল, লক্ষ্মীশ্রী মাখানো, পায়ের মাপও হবে ছোট। মেয়ের স্বভাব হবে ফুলের পাপ্‌ড়ির মতো নরম, কথা বলবে ঝর্ণার সুরে, চলবে-ফিরবে মৃদু তালে, মধুর ছন্দে, এমনটি হলে তবেই মেয়ের মতো মেয়ে। যাকে কাছে টানলে শরীর-মনে দোলা লাগবে, উষ্ণতার স্বাদে শিরা-উপশিরায় রক্ত লাফিয়ে উঠবে। এই না হলে মেয়ে···!

নেপোলিয়নের মা ল্যাটিজিয়া ছিলেন ছোটোখাটো চেহারার মিষ্টি, সুন্দরী মহিলা। মায়ের প্রতি নেপোলিয়নের দুরন্ত আকর্ষণ তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রমাণিত। মেয়েদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে নেপো-লিয়নের ধারণার মূলেও সম্ভবতঃ মায়ের এই চেহারা। পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ছিল বোনাপার্ট পরিবারের বৈশিষ্ট্য, আর এই আবহাওয়ায় মানুষ নেপোলিয়নের মানসিক কাঠামোও তাই এই ভঙ্গীতেই গড়ে উঠেছিল···।

নেপোলিয়ন যদি কখনও ভারতবর্ষে এসে কোন এক সন্ধ্যায় আমাদের বঙ্গভূমির কোন একটি গ্রামের বাড়িতে ঢুকতেন আর দেখতেন মাথায় ঘোমটা শান্তশ্রী এক কুলবধূ তুলসীমঞ্চে প্রদীপটি জ্বালিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে স্বামী-পুত্রের কল্যাণ কামনায় মাথা নত করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে, তিনি নিশ্চয়ই লাফিয়ে উঠতেন—এই তো, মেয়ের চেহারা তো এমনটি হওয়া উচিত, এমন কল্যাণী, এমন নরম আর স্নেহময়ী!

নেপোলিয়ন জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে যদি এমনটি পেতেন তাতে ইতিহাসের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হত জানি না, তবে হয়ত তাঁর নিজের জীবনের শেষ কটি বছরের চাপা আর্তনাদে আটলান্টিকের ঢেউ উত্থাল-

পাত্তা দিত না, স্ত্রী-পুত্রকে শুধু একটু চোখের দেখা দেখবার জন্য শেষ মুহূর্তটিতে তিনি অত ছটফটিয়ে উঠতেন না।

নেপোলিয়ন জীবনে বেশ কয়েকবারই মেয়েদের সাহচর্যে এসেছিলেন। তখনকার জীবনে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াটা ছিল অতি সাধারণ, অতি স্বাভাবিক।

নেপোলিয়নের জীবনে এসেছিল ক্যারোলিন দ্য কলাম্বিয়ের। নেপোলিয়ন ডাকতেন এমা। নেপোলিয়ন এমা সম্বন্ধে ছিলেন উচ্ছ্বসিত, কিন্তু এমা ছিল নির্বিকার, উদাসীন। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে এমার ছিল বেশ খানিকটা অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা…।

নেপোলিয়ন তখন ছিলেন সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট। এমা ঠোঁট উল্‌টে, চোখ কুঁচকে বলতো…"ছোঃ"। ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে-ভরা নেপোলিয়নের চিঠিগুলি পড়ে এমা হেসে, ঠাট্টা করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত, তাই নিয়ে মজা করত…।

নেপোলিয়ন যৌবনের প্রথম স্বাদ পেয়েছিলেন এক বারবনিতার সঙ্গে শয্যা-সুখে। বারবনিতা জেনেও তার কালো চুল, গভীর দুটি চোখ আর সর্বোপরি মেয়েলি ভাবটুকু নেপোলিয়নের ভালো লেগেছিল। প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতার বলি মেয়েটির দুঃখেভরা জীবন-কাহিনী শুনে নেপোলিয়নের মন সহানুভূতি ও অনুকম্পায় ভরে উঠেছিল।

এর কয়েক বছর পরে নেপোলিয়ন পরিচিত হয়েছিলেন দুটি বোনের সঙ্গে। নাম জুলি আর ডিজায়ারী। বড়টির বয়স বাইশ, ছোটটি ষোল। চেহারায় ওদেশের মেয়েদের তুলনায় শ্যামাঙ্গী, কালো চোখ, হাল্‌কা ফুলের মতো মুখ।

নেপোলিয়নের বেশী ভালো লাগতো ছোট বোন ইউজিন ডিজায়ারীকে। আরও নরম, আরও মিষ্টি। ডিজায়ারী বড় সুন্দর গান গাইত। তার গানের কলিতে কলিতে ছিল নাইটিঙ্গেল পাখীর সুর, সুরের মূর্ছনায় কেঁপে কেঁপে উঠত হৃদয়ের গভীরে অনুভূতির সব কটি তার। নেপোলিয়ন বড় ভালোবাসতেন মেয়েটিকে। নিজের মনে

বার বার বলতেন, "তুমি আমার কামনা, তুমি আমার কল্পনা, তুমি আমার সকল ইচ্ছাময়ী…।"

নেপোলিয়নের ডাক পড়েছিল আল্‌প্‌স্‌ পর্বত অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। সেখানে সামরিক শিবিরে যুদ্ধের বাজনার তালে তালে মনে পড়ত ডিজায়ারীর মিষ্টি সুরেলা গান। ডিজায়ারীকে দেখবার জন্য মন কেমন করত। নেপোলিয়নের চেয়ে ন' বছরের ছোট ডিজায়ারী। নেপোলিয়ন তাঁর কর্মস্থল থেকে ডিজায়ারীকে যে চিঠি লিখতেন, ভালোবেসে লিখলেও সে চিঠির ভাষা হত খুব ভারিক্কি, গুরুগম্ভীর:…"তুমি গান ছেড়ো না। ভালো দেখে একজন গানের মাস্টারমশাই রাখো, একটা পিয়ানো কেনো…মনে রেখো সঙ্গীতই আত্মা।…" একবার কতকগুলি গানের বইয়ের একটা তালিকা পাঠিয়ে লিখেছিলেন…"বইগুলি পড়ে দেখবে, নইলে কোথায় কোন্‌ সুরের উৎস জানবে কি করে" ··নেপোলিয়ন নিজের থেকেও সঙ্গীত সম্পর্কে অনেক ভারী ভারী কথা দিয়ে চিঠি লিখতেন…।

বলা বাহুল্য, ডিজায়ারীর হাল্‌কা মনে নেপোলিয়নের এই অভিভাবকী চিঠি কোন মোহ বিস্তার করত না…।

ইতিমধ্যে জুলির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বড় ভাই জোসেফের। এইবার নিশ্চয়ই নেপোলিয়নের সঙ্গে বিয়ে হবে ডিজায়ারীর …।

নেপোলিয়ন বাড়ি এলেন। প্রায় ন' মাস পরে দেখা হল ডিজায়ারীর সঙ্গে। ডিজায়ারীর বয়স এখন সতেরো। সতেজ, সবুজ লতার মতো সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠছে ডিজায়ারী। দেখে দেখে যেন চোখ ফিরতে চায় না নেপোলিয়নের। কবে পাবেন ডিজায়ারীকে একান্ত কাছে, নিতান্ত আপনজন করে… !

দুজনের বিয়ের প্রস্তাব উঠল। ডিজায়ারীর মা মাদাম ক্ল্যারী নাক কুঁচকে মন্তব্য করলেন…"পরিবারে একজন বোনাপার্টই যথেষ্ট… দ্বিতীয় বোনাপার্টে আর দরকার নেই…"

স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল বড় মেয়ে জুলির সঙ্গে জোসেফ বোনাপার্টের বিয়েতে মায়ের খুব আন্তরিক সায় ছিল না, এখনও নেই…।

নেপোলিয়ন মন খারাপ নিয়ে তাঁর কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলেন। পর পর ক'খানা চিঠি লিখলেন ডিজায়ারীকে। দিন যায়, উত্তর আসে না। নেপোলিয়ন কদিনের ছুটি নিয়ে এলেন প্যারিসে। প্যারিসের হাসি আলো গান কিছুই ভালো লাগল না। নেপোলিয়ন ডিজায়ারীকে চিঠি লিখলেন—"চারদিকে এত উচ্ছ্বাস, জীবনকে ভোগ করবার এত উপকরণ, তোমাকে বাদ দিয়ে আমার যে কিছুই ভালো লাগছে না···।"

বলা বাহুল্য, এই চিঠিরও কোন উত্তর আসেনি। শোনা যায়, কিছুদিন পরে নাকি ডিজায়ারী নেপোলিয়নকে প্রেমের উচ্ছ্বাস ভরা একখানা চিঠি দিয়েছিল। তবে ততদিনে নেপোলিয়নের মনে অন্য সুর বেজে উঠেছিল। তাই চিঠির উত্তরে নেপোলিয়ন ডিজায়ারীকে লিখেছিলেন,···"মিষ্টি মেয়ে ইউজিন, তুমি আমাকে চিরকাল ভালো-বাসবে বলে লিখেছ···কিন্তু আমি তো তোমাকে সেরকম কোন প্রতি-শ্রুতি দিতে পারছি না···তুমি যদি আর কাউকে ভালোবাস, তবে সে ভালোবাসাকে বাধা দিও না···।"

এই চিঠিখানা পেয়ে ডিজায়ারীর চোখের জলে নাকি বালিশ ভিজেছিল। তবে মাত্র কদিন পরে জঁা বার্নাডোট নামে একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হবার পর ডিজায়ারীর আর কোন দুঃখ বা ব্যথা ছিল না···।

নেপোলিয়নের জীবনে ডিজায়ারীর উপাখ্যান এখানেই শেষ···।

ইউজিন ডিজায়ারীকে নেপোলিয়ন ভুলতে পেরেছিলেন রোজ বোহারনিজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

রোজ বোহারনিজের পিতৃদত্ত নাম রোজ টাচার বা জোসেফি টাচার···।

মার্টিনিক দ্বীপের অধিবাসী ছিল অভিজাত টাচার পরিবার। আসলে ফরাসী, ব্যবসার খাতিরে নতুন বাসস্থান হয়েছিল মার্টিনিক। সেখানে ছিল বিরাট আখের ক্ষেত, আয় হত প্রচুর, টাচার পরিবারের জীবন ছিল সমৃদ্ধ। এই টাচার বংশের মেয়ে রোজ টাচার। ভাই

নেই, কেবল তিনটি বোন। রোজ সব চাইতে বড়। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন রোজের জন্মদিন।

মার্টিনিক পরিবারের বাড়িটি ছিল নারকেলগাছ, কলাগাছ, নানা-জাতের অর্কিড আরও অনেক রকমের গাছ-গাছালি, দিয়ে ঘেরা। রোজের ছেলেবেলাটা এই সবুজ, সতেজ পরিবেশে তরতরিয়ে কেটেছিল।

আখের ক্ষেতে কাজ করত নিগ্রো মেয়ে-পুরুষের দল। রোজ নিগ্রো মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতেন, তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনতেন। কখনও হ্যামকে শুয়ে দোলা খেতেন, কখনও বা গীটার বাজাতেন। মাঝে-মধ্যে বই-টই পড়তেন। একেবারে যাকে বলে, স্বপ্নময় জীবন। অন্ততঃ বছর বারো বয়স পর্যন্ত রোজের জীবন এমনভাবেই কেটেছিল।

রোজ ভর্তি হলেন কনভেন্টে। ওখানে বোর্ডিং-এ চার বছর থাকতে হল। রোজ কিছুটা লেখাপড়া করলেন। এরপর রোজকে ফিরে আসতে হল বাড়িতে। মা-বাবা রোজের বিয়ে ঠিক করেছেন। পাত্র আলেকজাণ্ডার দ্য বোহারনিজ। উনিশ বছরের ছেলে। সুপুরুষ। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বর্তমানে ফ্রান্সের একজন পদস্থ অফিসার। ধনী পরিবার। বাপ ছিলেন ফরাসী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গভর্নর।

ছেলে হিসেবে আলেকজাণ্ডার বোহারনিজ খারাপ নয়। তবে একটা জায়গায় একটু গোলমাল ছিল। কোন সুন্দরী, চটুল নয়না মেয়ে দেখলে আলেকজাণ্ডারের মাথাটা কেমন যেন নড়ে উঠত। চোখের সামনে ঐ মেয়েটি ছাড়া আর সব কিছু মুছে যেত, সমাজ-সংসার ন্যায়-নীতি সব মিছে মনে হতো। উপরন্তু ছোটবেলায় মাতৃ-হীন হওয়ার ফলে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত আলেকজাণ্ডার অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে পড়েছিলেন। আলেকজাণ্ডার কেবল নিজেকে ভালোবাসতেন, নিজের স্বার্থ দেখতেন। অন্যের প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি বা অন্যের ভালোমন্দ বুঝে চলা, বিবেচনা করা এ সব তাঁর স্বভাবের ধারে কাছেও ছিল না…। যাই হোক, ষোল বছর বয়সে রোজ আলেকজাণ্ডারকে স্বামী

হিসেবে বরণ করলেন। বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে চলে গেলেন ফ্রান্সে। রোজ টাচার হলেন রোজ বোহারনিজ…।

আলেকজাণ্ডার আর রোজের বিবাহিত জীবনের প্রথম ক'টি বছর বেশ ভালোই কাটল। স্বামীর প্রতি রোজের নিষ্ঠা ছিল, ভালোবাসা ছিল। আলেকজাণ্ডারের ভালো লাগত রোজের সেবা, রোজের আদর-যত্ন। দুটি সন্তানের মা হলেন রোজ। বড়টি মেয়ে, নাম হর্টেন্স। ছোটটি ছেলে, নাম ইউজিন। রোজ পরিপূর্ণভাবে সংসার করতে লাগলেন…।

কিন্তু আর ক'দিন…!

আলেকজাণ্ডার তাঁর স্বভাবের পরিচয় দিতে লাগলেন। সেই সুন্দরী মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ানো, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা। ফলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে তিক্ততা এল। রোজ ভেবে-চিন্তে দেখলেন এ ধরনের জীবন চালানো অসম্ভব। যেখানে একবার চিড় খেয়ে গেছে, সেখানে আর জোড়া-তালি না দেওয়াই ভালো।

অতএব এবার বিচ্ছেদ। বিয়ের ছ'বছর যেতে না যেতে আলেক-জাণ্ডার বোহারনিজ ও স্ত্রী রোজ বোহারনিজের বিবাহ বিচ্ছেদ হল। রোজ কিছুটা সময় নীরবে চোখের জল ফেললেন, তারপর নিজের হাতে গুছনো সংসার থেকে রোজ চলে আসতে বাধ্য হলেন। রোজের বয়স তখন সবে বাইশ…।

এর পরের কয়েক বছর আলেকজাণ্ডার ও রোজ, দুজনের জীবনেই বড় ঝড়ের ইতিহাস। এরই মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের আগুন জ্বলেছিল, শুরু হয়েছিল 'রেইন অব টেরর' বা ত্রাসের রাজত্ব। আলেকজাণ্ডার কারারুদ্ধ হলেন। গিলোটিনে প্রাণ দিলেন। বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও রোজ অনেক চেষ্টা করেছিলেন স্বামীকে বাঁচাতে। পারলেন না তো বটেই, উপরন্তু তিনি নিজে কারারুদ্ধ হলেন এবং তাঁর নিজের মাথার ওপরেও যখন বিপ্লবী বিচারালয়ের নির্দেশে গিলোটিনের খড়্গ প্রায় নেমে এসেছিল, ঠিক সেই সময় সকল ত্রাসের নায়ক রোব্‌স্‌পীয়েরের পতন হল। তিনি নিজেই গিলোটিনের নীচে মাথা পেতে দিতে বাধ্য

হলেন। বিভীষিকায় ভরা রক্তাক্ত দিনগুলির অবসান হল। হল বলেই রোজ কারামুক্ত হলেন। নেহাতই দৈব বলে বেঁচে গেলেন। শোনা যায়, কারারক্ষী যখন রোজ বোহারনিজের নাম ডেকেছিল, রোজ প্রাণ ফিরে পাওয়ার আনন্দে নাকি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন…।

রোজ এবার ফেলে আসা জীবনের সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন জীবন শুরু করলেন। অত সহজে সব ভুলতে পেরেছিলেন থেরেসা ট্যালিয়েনের বন্ধুত্বের জোরে…।

মাদাম ট্যালিয়নের বাড়িতেই নেপোলিয়নের সঙ্গে পরিচয় হল রোজ বোহারনিজের। নেপোলিয়নের বয়স তখন ছাব্বিশ, রোজের বয়স বত্রিশ। দুজনের মধ্যে ছ'-বছরের ফারাক। তবু নেপোলিয়ন রোজের মধ্যে আবিষ্কার করলেন একটি মেয়েকে, যেমন মেয়ে নেপোলিয়ন মনের মাধুরী দিয়ে কল্পনায় গড়ে নিয়েছেন, যেমনটি নেপোলিয়ন চান…।

বন্ধু ট্যালিয়নের চেষ্টায় কারাজীবন-যাপনের ক্ষতিপূরণ হিসাবে রোজ বেশ কিছু সম্পত্তি লাভ করে একটা সুন্দর দোতলা বাড়িতে বাস করছিলেন। বাড়ির সামনে ধনুকের মতো বাঁকানো সুন্দর একটি বাগান। বাড়ির ভেতরটা অত্যন্ত সুরুচি-শোভনতার সঙ্গে সাজানো। যেখানে যেটা মানায়, যতটুকু মানায়। বাড়িতে ঢুকলেই মনে হয় অসাধারণ, অভূতপূর্ব, এমনটি কোথাও দেখা যায়নি, দেখা যাবে না। এই রুচি আর পরিচ্ছন্নতায় ভরা বাড়িখানা প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল নেপোলিয়নকে। নেপোলিয়ন ঐ বাড়িতে নিয়মিত যেতেন আর মুগ্ধ হতেন রোজের স্মিত ব্যবহারে, তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বরে, আর তাঁর প্রীতিপূর্ণ কথাবার্তায়…।

কেমন দেখতে ছিলেন রোজ…! খুব কী সুন্দরী…! না, তা নয়। রোজকে সুন্দরী কোনমতেই বলা চলে না। তবে তিনি ছিলেন মনোরমা, বড় শ্রীসম্পন্না। মাথায় ছোট্ট, লম্বায় বড় জোর পাঁচ ফুট, তন্বী দেহ, লক্ষ্মীর মতো ছোট দুটি হাত, ছোট পা। গভীর বাদামী

রং-এর দুটি চোখ, তাতে দীর্ঘায়ত আঁখি-পল্লব চোখের ভাষাকে যেন বাঙ্ময় করে তুলেছিল। মাথায় রেশম-নরম কুঞ্চিত চুল, সামনের দিকে কপালের খানিকটা ঢেকে আঁচড়ানো। গায়ের চামড়া ছিল সতেজ ও মসৃণ। রং ছিল উজ্জ্বল ও ঝক্‌ঝকে। কে বলবে রোজের বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেছে···! তবে মুখে একটা ত্রুটি ছিল। রোজের দাঁতগুলি ছিল বড়ো বড়ো। রোজ তাঁর বড়ো দাঁত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি সহজে দাঁত দেখিয়ে হাসতেন না। যতই হাসির বিষয় হোক না কেন রোজ হাসতেন ঠোঁট টিপে নীরবে। এ হাসি আরও মিষ্টি লাগত। এ হাসি মানিয়ে যেত তাঁর ব্যবহার ও রুচির সঙ্গে।

রোজ সত্যিই জীবনটাকে যেন নতুন করে শুরু করেছিলেন। যে-কোন ঘটনা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতেন খুব হাল্‌কা সুরে, "কি মজা, না···!"

মনে হয় রোজ যে ভয়ঙ্কর চারটি মাস কারাগৃহে কাটিয়েছিলেন প্রতি মুহূর্তে গিলোটিনের শাণিত আঘাত কল্পনা করে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখেছিলেন, সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে নিদারুণ স্মৃতিগুলিকে মন থেকে সমূলে উৎখাত করবার জন্যই যেন সব কিছুকে হাল্‌কা ভাবে দেখতে শুরু করেছিলেন। সবকিছুকে "ফান" বা মজা হিসেবে গ্রহণ করতে চাইছিলেন। আর এই যখন রোজের প্রতিমুহূর্তের মনোভাব, ঠিক সেই লগ্নেই এগিয়ে এলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট···।

নেপোলিয়ন রোজের কাছে এলেন, ক্রমে ঘনিষ্ঠ হলেন। দুজন দুজনের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন গল্প করতেন। গল্প করতে ভালোবাসতেন। রোজ হাত দেখানোতে বিশ্বাস করতেন। নেপোলিয়নকে হাত দেখালেন। কারণ নেপোলিয়ন হাতের রেখা দেখে নির্ভুল ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন এমন একখানা ভাব দেখিয়ে অনেককেই ভবিষ্যৎ গণনায় বিশ্বাসী করে তুলেছিলেন। রোজের ছোট্ট, নরম হাত টেনে নিয়ে নিশ্চয়ই অনেকটা সময় নিয়ে নেপোলিয়ন তাঁর হস্তরেখা বিচার করতেন··! এমনি এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে গল্পের ফাঁকে নেপোলিয়ন

রোজকে বললেন—"তোমার রোজ নামটা আমার পছন্দ নয়। তোমার নাম আজ থেকে হবে জোসেফাইন। তোমার জোসেফি নাম থেকে জোসেফাইন। কেমন, পছন্দ হচ্ছে না··· !"

নেপোলিয়ন একটু চুপ করে থেকে বললেন, "এবার থেকে তুমি আর রোজ বোহারনিজ নও। এখন থেকে তুমি আমার জোসেফাইন··· ।"

জোসেফাইন নামকরণ করেও নেপোলিয়ন কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। প্রথমতঃ তখনও তিনি খুব একটা খ্যাতির পথে পা বাড়াননি। দ্বিতীয়তঃ তখনও তাঁর মাথার ওপর বিরাট ছায়া বিস্তার করে আছেন পল বারাস। নেপোলিয়নের সমস্যা তো এখানেই। জোসেফাইনের বাড়িতে পল বারাসেরও তো নিত্য আসা যাওয়া। দুজনকার মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা···। এমনকি নেপোলিয়নের কানে এল, জোসেফাইন তাঁর সঙ্গে যতই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করুন না কেন, আসলে উনি নাকি পল বারাসেরই শয্যাসঙ্গিনী।

নেপোলিয়ন দুঃখ পেলেন। মন খারাপ নিয়ে কটা দিন কাটল। তারপর নিজের সহজ বুদ্ধি দিয়ে ভেবে দেখলেন, পল বারাসের মানসীর সঙ্গে আর বন্ধুত্ব নয়, ঘনিষ্ঠতা নয়। এবার থেকে শুধু কাজ, আর কাজ, তাতে সুনাম ও পদবৃদ্ধি দুই-ই হবে··· ।

নেপোলিয়ন মন বাঁধলেন। জোসেফাইনের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজে কর্মে মন দিলেন।

কিছুদিন কাটল। নেপোলিয়ন একদিন জোসেফাইনের নিজের হাতে লেখা একটা চিরকুট পেলেন,—"তোমাকে আমি এত করে কাছে পেতে চাই, অথচ তুমি কেন আর আসছ না। তুমি আসবে, কালকেই আসবে। কাল দুপুরবেলা আমরা একসঙ্গে খাব ···এসো কিন্তু। তোমাকে একটু দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি।"

বসন্ত ঋতু সব কটি রাগরাগিণী সেদিন কি সুর বাজাল নেপোলিয়নের কানে, নেপোলিয়ন লাফিয়ে উঠলেন। জোসেফাইন ডেকেছেন। এ ডাক কি উপেক্ষা করা যায় !

নেপোলিয়ন জোসেফাইনের কাছে আবার গেলেন এবং প্রায় প্রতি দিনই যেতে লাগলেন। আর ঠিক এই সময়েই নেপোলিয়ন জোসেফাইনের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা কাটালেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে, একান্ত করে। নেপোলিয়নের প্রতিটি রোমকূপে সেদিন শিহরণ জেগেছিল, স্বপ্নের ঘোর নেমে এসেছিল ছুটি চোখে···আর সেই ঘোর লাগা চোখের দু'পাতা সারারাত নেপোলিয়ন এক করতে পারলেন না। শুধু ভাবলেন আর ভাবলেন। তার পরদিন সকালবেলা সাতটার মধ্যেই জোসেফাইনকে একখানা চিঠি লিখে পাঠালেন. "আমার সর্ব অবয়বে তোমার স্পর্শ এখনও অনুভব করছি। গত সন্ধ্যার ঐ মুহূর্তগুলি এখনও আমাকে আচ্ছন্ন করে আছে। আমার মন অশান্ত, উতলা। আমার অতুলনীয়া জোসেফাইন, এ তুমি কি করলে? জোসেফাইন, তুমি খুশি তো! না হলে আমার যে দুঃখের সীমা থাকবে না···জোসেফাইন, তোমার ঠোঁটের উষ্ণতা, তোমার মনের পরশ আমার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার সামনে তোমার ছবি, আমি শুধু তাকিয়ে দেখছি। গত সন্ধ্যার পর তুমি যে আমার কাছে একেবারে নতুনরূপে ধরা দিয়েছ। জোসেফাইন দুপুরটুকু কেটে গেলে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তুমি আমার বহু সহস্র চুম্বন নাও, কিন্তু তুমি দিও না, কারণ তোমার চুম্বনে আমার রক্ত যে আতপ্ত হয়ে ওঠে··· ।"

কি প্রচণ্ড ভালোবাসা, কি বল্‌গাহীন আবেগ সেনাপতি নেপোলিয়নের, যোদ্ধা নেপোলিয়নের··· !

আর জোসেফাইন! এত আবেগেভরা চিঠি পেয়ে জোসেফাইন বিস্মিত হলেন, বিরক্ত হলেন। নেপোলিয়ন লোকটার কি মাথা খারাপ! এক সন্ধ্যায় নেপোলিয়নের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে একটি ঘনিষ্ঠ সাহচর্য দিয়েছেন, আর তাতেই লোকটা আনন্দে উচ্ছ্বাসে গলে গেছে! লোকটা পুরুষ তো বটে! এই সামান্য, স্বাভাবিক ব্যাপার নিয়ে লোকটা এত বড়ো একটা চিঠি লিখে ফেললো! বলিহারি সেনাপতি। নেপোলিয়ন ও জোসেফাইন—দুজনের কাছে জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা ছিল একেবারে বিপরীত। একজন সৌন্দর্য ও স্নেহ দিয়ে জীবনের মাধুরী খুঁজতেন।

অন্যজন ছিলেন নেহাতই জৈব ব্যবহারে বিশ্বাসী। সুতরাং···ভবিষ্যতের পাতায় এই দুজনের মিলনের ইতিহাস কেমন হবে কে জানে···

নেপোলিয়ন জোসেফাইনের বাড়ি এলেন। তাঁকে আবেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, পল বারাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক নিয়ে যে জোর গুজব চারদিকে ছড়িয়ে আছে, সে কি সত্যি··· !

জোসেফাইন অম্লান বদনে স্বীকার করলেন, বর্তমানে নয়, তবে একসময় সত্যিই তিনি পল বারাসের রক্ষিতা ছিলেন···

নেপোলিয়ন খানিকটা থমকালেন। তারপরেই প্রচণ্ড আবেগে জোসেফাইনকে জড়িয়ে ধরলেন। কি আছে তাতে? জোসেফাইন স্ত্রীপুরুষের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য সম্পর্কে এত অভিজ্ঞ বলেই তো আগের দিনের সন্ধ্যা এত মধুর হয়ে উঠেছিল।

নেপোলিয়নের মনে কোন ক্ষোভ রইল না। বরঞ্চ তাঁর মন আনন্দরসে ভরে উঠল। এমন মেয়েকে শুধু সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া নয়, এমন মেয়েকে পেতে হবে একেবারে ঘরনী গৃহিণী হিসেবে। কেমন সে সংসার গুছোবে, ছেলেপুলে মানুষ করবে, স্বামীকে যত্ন করবে, আবার নিজের মনোলোভা নারীত্ব দিয়ে স্বামীর পৌরুষকে উত্তেজিত করবে। সুখের উচ্ছ্বাসে স্বামীর দেহ-মনকে ভরিয়ে দেবে।

নেপোলিয়ন জোসেফাইনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। নেপোলিয়নের যা একটু দ্বিধা মায়ের জন্য। ল্যাটিজিয়া কিছুতেই রাজী হবেন না একজন বিধবাকে পুত্রবধূ করতে। উপরন্তু যার বাড়িতে বেশ কিছু পুরুষের নিত্য আনা-গোনা··· !

তা হোক, মাকে যা হোক করে সামলানো যাবে।

নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ব্যাপারটা পল বারাসকেও জানালেন। ভেবেছিলেন পল বারাস কথাটা শুনেই চটে যাবেন, তাঁকে দু'কথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু দেখা গেল পল বারাস আপত্তি তো করলেনই না, বরঞ্চ এই ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখালেন।

ব্যাপার আর কিছুই না, স্বার্থ। পল বারাস তখন ডিরেক্টরী সভার অন্যতম ডিরেক্টর। তিনি নিজের পদের নিরাপত্তা চাইছিলেন। আর এর জন্য নেপোলিয়ন ও জোসেফাইনের মতো সমাজে পরিচিত ও অভিজাত ব্যক্তিদের সাহায্য করছিলেন। নেপোলিয়ন-জোসেফাইনের বিয়ে হলে পল বারাসের অনুগামীদের সংখ্যা বাড়বে। তাঁর কাজের সুবিধে হবে। সুতরাং বিয়ের ব্যবস্থাপনায় পল বারাস ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শুধু এইটুকুই না, পল বারাস নেপোলিয়নকে কথা দিলেন, জোসেফাইনের সঙ্গে বিয়ে হবার পরেই নেপোলিয়নকে ইটালীর আল্প্‌স্‌ সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ করে দেওয়া হবে।

এই বিয়েতে জোসেফাইনের কী মনোভাব ছিল!

জোসেফাইন এক বন্ধুকে বলেছিলেন, "নেপোলিয়নকে কি আমি ভালোবাসি? না। তবে কি নেপোলিয়নকে আমি অপছন্দ করি! না. তাও নয়! বলতে পারি, নেপোলিয়নকে আমার মোটামুটি মন্দ লাগে না..."

...বিয়ে অবশ্য শেষ পর্যন্ত হল। ল্যাটিজিয়া দুঃখিত হলেন। ভাইবোনেরা, বিশেষ করে বোন পলিন নাক কোঁচকাল। তবু বিয়ে হল।

বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রী উভয়েরই জন্ম-তারিখের সার্টিফিকেট চাই। নেপোলিয়ন, জোসেফাইন কারোই সেটা ছিল না। কিন্তু আইন মানতে হবে। যেমন করেই হোক সার্টিফিকেট দেখাতেই হবে। নেপোলিয়ন দেখালেন বড়োভাই জোসেফের সার্টিফিকেট। জোসেফাইন দেখালেন তাঁর ছোট বোন ক্যাথারিনের সার্টিফিকেট। ফলে, নেপোলিয়নের আসল বয়স যেখানে ছিল ছাব্বিশ, সেখানে হল সাতাশ, আর তাঁর চাইতে ছ' বছরের বড় জোসেফাইনের বয়স যেখানে আসলে ছিল বত্রিশ, সেখানে হল আটাশ।

একটু মিথ্যাচারে কোন দোষ নেই। বর-কনের বয়স তো প্রায় মানিয়ে গেল! বিয়ের আসরে সাক্ষী রইলেন পল বারাস, ট্যালিয়েন আর জেরোম ক্যামেল্‌ট্‌, জোসেফাইনের আইন উপদেষ্টা।

বিয়ের কনে জেসেফাইনের বিয়ের পোশাক ছিল স্বচ্ছ ফিনফিনে। কটিদেশের অনেকখানি ওপর থেকে পা পর্যন্ত ঝালর দেওয়া। পোশাকের সারা গায়ে লাল, সাদা আর নীল রং-এর বুটিদার ফুল।

খানিকটা পরে এলেন বর নেপোলিয়ন। পরেছেন সোনালী কাজকরা নীল রং-এর পোশাক। সঙ্গে এডিকং লেমোরেজ, এই বিয়েতে চার নম্বরের সাক্ষী।

বিয়ের দিন পড়েছিল মার্চ মাসের ন' তারিখে। বেশ শীত। বিয়ের আসর যেখানে বসেছিল সেখানে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বলছিল। আর সেই আগুনের ওম্ গরমে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক আগে ছিলেন সৈনিক। যুদ্ধে একটা পা কাটা যাওয়াতে সেখানে একটা কাঠের পা লাগিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন।

আগুনের পাশে আরামে ঘুমের ঝিমুনিটা যখন বেশ গাঢ় হয়ে আসছিল, তখনই ধড়মড়িয়ে উঠতে হল নেপোলিয়নের ধাক্কায়··· "উঠুন মশাই, তাড়াতাড়ি করে আমাদের বিয়েটা দিয়ে দিন"··· নেপোলিয়নের গলায় অসহিষ্ণুতা···।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার তৈরী হয়ে নিলেন। প্রথমতঃ নেপোলিয়নের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সেনাপতি নেপোলিয়ন মহাশয়, আপনি কি মাদাম বোহারনিজকে বিধিসম্মত স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে সম্মত আছেন ?"

"হ্যাঁ মহাশয়, আছি···" স্থিরভাবে নেপোলিয়ন উত্তর দিলেন।

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার এবার তাকালেন জোসেফাইনের দিকে, "মাদাম বোহারনিজঁ, আপনি কি সেনাপতি বোনাপার্টকে বিধিসম্মত স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে রাজী আছেন··· ?"

"হ্যাঁ মহাশয়, আমি রাজী আছি···" মৃদুস্বরে জোসেফাইন উত্তর দিলেন।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ঘোষণা করলেন,…“সেনাপতি বোনাপার্ট এবং মাদাম বোহারনিজ, আজ থেকে আপনারা আইনতঃ স্বামী-স্ত্রী হলেন।”

ম্যারেজ রেজিস্টারে নেপোলিয়ন, জোসেফাইন সই করলেন। নেপোলিয়ন-জোসেফাইনের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে নিয়ে রু চেস্টারিয়েনে সুন্দর বাড়িতে উঠলেন। সেখানে একতলায় চারদিকে আর্শি লাগানো সাজানো-গোছানো একটা ঘরে দুজনের শয্যা রচিত হয়েছিল।

নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে সোনার সূক্ষ্ম কাজ করা একটা নেকলেস উপহার দিলেন। তাতে একটা লকেট ছিল। লকেটটিতে খোদাই করা ছিল, “অ' ডেসটিন”…ভাগ্যই তাঁদের বিয়েটা ঘটিয়েছে। ভাগ্যই তাঁদের রক্ষা করবে…। শয্যা গ্রহণ করতে গিয়ে নেপোলিয়ন দেখলেন জোসেফাইনের সঙ্গী শুধু তিনি একা নন। আরেকজন আছে। সেটি হল খ্যাঁদা বোঁচা ছোট্ট একটি লোমশ কুকুর। নাম ফরচুন। জোসেফাইনের বেশ কিছুদিনের সঙ্গী। এমন কি জোসে-ফাইন যখন কারাবাস করছিলেন, তখনও ফরচুন তাঁর সঙ্গে ছিল।

ফরচুন অনেকবার জোসেফাইনের সংবাদবাহকের কাজ করেছে। জোসেফাইনের গোপন চিঠিপত্তর ফরচুনের বক্‌লসের নীচে লুকিয়ে বেঁধে দেওয়া হত, আর নির্ভীক ফরচুন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেই সব খবর কারা প্রাচীরের বাইরে পৌঁছে দিত, আবার বাইরের খবর নিয়ে ভেতরে আসত।

এ হেন ফরচুন জোসেফাইনের একান্ত অন্তরঙ্গ তো হবেই। ফর-চুনের খাওয়া বসা শোওয়া সব কিছুই জোসেফাইনের সঙ্গে হত। তাই নেপোলিয়ন যখন শয্যায় অংশ গ্রহণ করতে গেলেন, স্বভাবতই ফরচুন উগ্র, হিংস্র হয়ে উঠল। হঠাৎ আসা ভাগীদারকে সে সহ্য করতে পারল না। ফরচুন প্রথমে একটু গর্জন করে উঠল। তারপর নেপো-লিয়নের পায়ের পেছনে পেশীর মাংসে দাঁত বসিয়ে দিল। মধুযামিনীর

প্রথমেই এই অভ্যর্থনার জন্য নেপোলিয়ন ঠিক তৈরী ছিলেন না। কেমন যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত বলে মনে হল।

নেপোলিয়ন-জোসেফাইনের নববিবাহিত দাম্পত্য-জীবন যত বিশ্লেষণ করা যায়, ততই যেন বিস্মিত হতে হয়। নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে সব কিছু দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। ভালোবেসেছিলেন জোসেফাইনের পূর্বস্বামী-দত্ত ছেলে-মেয়ে দুটিকে। তারিফ করেছিলেন জোসেফাইনের প্রথম বিবাহিত জীবনের দৈহিক অভিজ্ঞতাকে। মেনে নিয়েছিলেন জোসেফাইনের সকল ইচ্ছা ও খেয়াল খুশিকে। এত করেও কি নেপোলিয়ন জোসেফাইনের মন বুঝতে পেরেছিলেন! তাঁকে সত্যিকারের আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন!

নেপোলিয়ন কত দুঃখেই না মন্তব্য করেছিলেন, "আমি যখন দূরে থাকি, তখন একটি ঘণ্টা সময়ও আমার জোসেফাইনের ছবিখানা না দেখে থাকতে পারি না, তাকে অনেক আদর করেও আমার তৃপ্তি হয় না।···আর জোসেফাইন —! সে তো কই আমার অদর্শনে এতটুকু কাতর হয় না। আমার ছবিটি একবার তাকিয়েও দেখে না··· !"

নেপোলিয়ন তাঁর বিবাহিত জীবনে একটি সত্যিকারের মেয়েকে চেয়েছিলেন। জোসেফাইনের ব্যবহারে, কণ্ঠস্বরে, কথাবার্তায় তাঁকে পেয়েছিলেন। তেমনি জোসেফাইনও নিশ্চয়ই তাঁর মনের মতো পুরুষকে স্বামী হিসেবে চেয়েছিলেন। যে হবে দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, দুর্দান্ত আর জীবনদর্শনে উচ্ছল। নেপোলিয়ন চেহারা ও ব্যবহারে দীর্ঘ, দুর্দান্ত পুরুষ ছিলেন না। তাঁর জীবনদর্শনের অর্থ ছিল নীতিগত। নেপোলিয়ন স্বভাবে ছিলেন শান্ত, গম্ভীর ও সে যুগের তুলনায় অনেক সংযত। জোসেফাইন যে পৌরুষযুক্ত পুরুষটি চেয়েছিলেন, নেপোলিয়ন সে পুরুষ ছিলেন না। এর পরের কয়েকটি বছরে যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করে নেপোলিয়ন খ্যাতি কুড়িয়েছেন, সম্মানিত হয়েছেন, উচ্চ থেকে উচ্চতর পদে উন্নীত হয়েছেন, তবু জোসেফাইনের মনের মানুষটি হতে পারেননি। গিলোটিনের খাঁড়া থেকে মুক্তি পেয়ে মাদাম ট্যালিয়নের

সাহচর্যে এসে জোসেফাইন জীবনকে ফেনিল করে তুলতে চেয়েছিলেন। জীবনের পরম অর্থ জোসেফাইন সেইখানেই খুঁজে পেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর জীবনকে বহু বৈচিত্র্যে-ভরা নিতুই নবরূপে মেলে ধরতে চেয়েছিলেন—নেপোলিয়নের মনের বাসনা অনুযায়ী সাজানো সংসারে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ দীপ-শিখাটুকু হয়ে জ্বলতে চাননি···।

নেপোলিয়নের জীবনে এই বেসুরো ট্র্যাজেডি যদি না ঘটত, তা হলে তাঁর বিজয়ের ইতিহাসে ভারসাম্যের অভাব হত না। জীবনের শেষ কটি বছর তাঁর বুকচাপা নীরব কান্না সেণ্ট হেলেনার রুক্ষ পাহাড়ে ঘা খেয়ে ফিরত না।

নেপোলিয়নের বিবাহিত জীবন কোন দিনই শান্তিরসে নিষিক্ত হয়নি।

বিয়ের মাত্র দুদিন পরে, ১১ই মার্চ, নেপোলিয়নকে চলে যেতে হল ইটালী অভিযানে।

ফ্রান্সের বিপদটা এবার এসেছিল বাইরের দিক থেকে। অবশ্য ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই ফ্রান্সের গায়ে খোঁচাখুঁচি চলছিল। খোঁচাচ্ছিল অস্ট্রিয়া আর তার সঙ্গে উত্তর ইটালীর পীডমণ্ট। অস্ট্রিয়ার রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ফ্রান্সিস, মারিয়া আতোঁয়ানেতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পীডমণ্টের রাজা ছিলেন ভিক্টর আমেদিউস। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য এঁরা একেবারে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। অতএব ফ্রান্সকে এঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সেনাপতি নেপোলিয়নের ডাক তো পড়বেই। যুদ্ধ, রাজনীতি—এরা মধুযামিনীর ধার ধারে না···।

নেপোলিয়নের ওপর নির্দেশ ছিল প্রথমে আল্‌প্‌স্‌ পর্বত পার হয়ে পো নদীর উপত্যকায় পীডমণ্ট ও অস্ট্রিয়ার সম্মিলিত সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করা, মিলানের বিরাট জমিদারি কেড়ে নেওয়া, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা।

আল্প্‌স্ পর্বত। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত। এর আগেও দু-দুবার চেষ্টা করা হয়েছিল আল্প্‌স্ পর্বত পার হয়ে উত্তর ইটালী জয় করবার। এক-বারও সফল হয়নি।

নেপোলিয়ন নীস্ শহরে তাঁর ইতালীয় অভিযানের প্রধান শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেখানে আরও সেনাপতিরা ছিলেন। তবে নেপোলিয়ন নিজে বেছে নিয়েছিলেন জুনট আর মুরাটকে। নেপো-লিয়নের ওপরওয়ালা সেনাপতি ছিলেন লুই আলেকজাণ্ডার বার্থিয়ার। পরিশ্রমী, দক্ষ এবং বহুযুদ্ধে অভিজ্ঞ। বার্থিয়ার অন্যের কাজের কদর বুঝতেন।

নেপোলিয়ন যে সেনাবাহিনীতে ছিলেন, সেখানে সৈন্যের সংখ্যা ছিল একচল্লিশ হাজার পাঁচশ' সত্তর। বিপ্লবের পরে ফরাসী জনতার মধ্যে "আমার দেশ, আমার জন্মভূমি" বলে একটা বোধ এসেছিল, জাতীয়তা ভাবের জাগরণ হয়েছিল। সুতরাং ইতালীয় অভিযানে যে ফরাসী সৈন্যরা যোগদান করেছিল, তাদের সাহস ছিল, কাজ করবার ইচ্ছে ছিল, তাদের অদম্য উৎসাহ ছিল। যেটা ছিল না তা হল পেটভরা উপযুক্ত খাদ্য আর যুদ্ধোপযোগী পোশাক। সর্বোপরি ছিল শৃঙ্খলার অভাব, যে অভাব কিনা যুদ্ধে সর্বনাশ ডেকে আনে।

নেপোলিয়ন প্রথমে ডিরেক্টরী সভার অনুমতি নিয়ে বেশী টাকার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। এই মর্মে তিনি সলসেটি নামে একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে জেনোয়ায় পাঠালেন। কিন্তু হলো না। সলসেটি টাকা যোগাড় করতে পারলেন না, তবে একটা কাজের কাজ করলেন। সৈনিকদের খাওয়ার জন্য সলসেটি অন্ততঃ মাস তিনেকের মতো রুটি তৈরী করবার শস্য যোগাড় করলেন। আর এদিকে নেপোলিয়ন কিনলেন সৈনিকদের পায়ের জন্য আঠারো হাজার জোড়া বুট। যতই সাহসী হোক, পরিশ্রমী হোক, খালি পেটে আর খালি পায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের লড়াই দেখানো যায় না।

যোদ্ধা হিসেবে যে কটা গুণ থাকা দরকার, নেপোলিয়নের সব কটাই ছিল। প্রথম গুণ, শারীরিক স্বাস্থ্য। নেপোলিয়ন দীর্ঘদেহী

ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রশস্ত বুক, চওড়া বলিষ্ঠ কাঁধ আর অকুণ্ঠ পরিশ্রমী মন তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপযুক্ত নায়কোচিত গুণের অধিকারী করেছিল। যুদ্ধের সময় নেপোলিয়ন কাজ করতেন অতি দ্রুতগতিতে। ঘুমোতেন, বিশ্রাম করতেন অতি অল্প সময়। এমনও দেখা গেছে নেপোলিয়ন ক্রমান্বয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে লাগাম ধরে থেকেই আধ ঘণ্টাটাক ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, আর মাত্র ঐটুকুন ঘুমিয়ে উঠেই আবার ছট-ফটিয়ে কাজ করছেন। তিনি জানতেন যুদ্ধক্ষেত্র কখনও ঝিমোয় না। সে সদা জাগ্রত। সুতরাং সেখানে শত্রুপক্ষকে সামাল দিতে গেলে বড়জোর এক আধ ঘণ্টা চোখ দুটি শুধু বুজে থাকা আর কিছু না। নেপোলিয়ন এই নীতিতে এত বিশ্বাসী ছিলেন যার জন্য প্রায়ই দেখা যেতো তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো কুড়ি ঘণ্টাই কাজ করছেন।

নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ের ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করতেন। সেটি হল ভৌগোলিক জ্ঞান। অর্থাৎ যে দেশে, যেখানে যুদ্ধ, তার চারপাশে ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে কিছু খুঁটিয়ে জানা। কোথায় নদী, নালা, খাল, বিল, কোথায় পর্বত, উপত্যকা, আর কোথায়ই বা রাস্তা ঘাট, লোকালয়, এই জ্ঞান যদি না থাকে তা হলে সেনাপতি সেনাবাহিনীকে এগিয়ে চলার নির্দেশ দেবেন কি করে। সৈনিকরাই বা যুদ্ধ করবে কোন্ দিকে মুখ করে! কোন্ দিকে সে কামান সাজাবে, পরিখা কাটবে··· !

নেপোলিয়নের কৃতিত্ব ছিল কামান সাজানোয় আর কামান দাগায়। কামান এমনভাবে সাজানো হত যে এক জায়গায় হঠে গেলে চট করে অন্য জায়গায় কামান সরিয়ে নেওয়া যেত এবং সেখান থেকে নিপুণ লক্ষ্যে কামানের গোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে শত্রুবাহিনীকে নাজেহাল করা হত।

নেপোলিয়নের কাছে খবর এল অস্ট্রিয়া আর পীডমণ্ট এই দুইয়ে মিলিয়ে সৈন্য সংখ্যা নাকি সাতচল্লিশ হাজার অর্থাৎ ফরাসী সেনা-বাহিনী থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বেশী। আরও খবর এল আল্‌্সের ওদিকে পীডমণ্ট অতি সুরক্ষিত। উপরন্তু আল্‌্স পর্বতের

ভেতর দিয়ে যে সরু উপত্যকা পথগুলি গেছে, সে সব পথগুলিতে শত্রু-সৈন্য এমনভাবে পাহারা দিচ্ছে যে এ পক্ষের একটা মাছিও নাকি গলে যেতে পারবে না।

যেতে পারবে না তো পারবে না। নেপোলিয়ন ঐ পথ দিয়ে যেতেও চান না কারণ এর আগে ফরাসী সেনাপতিরা বহুবার ঐ পথ দিয়ে আল্‌স্‌ পর্বত অতিক্রম করে উত্তর ইটালীতে যাবার চেষ্টা করেছেন, এবং প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হয়েছেন। নেপোলিয়ন চিন্তা করছিলেন অন্য পথের। সে পথ হল সমুদ্রের তীর দিয়ে দিয়ে যে পথ গেছে, সেই পথ। তারপর নিরপেক্ষ দেশ জেনোয়ার ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া।

অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন বোলোঁ। অভিজ্ঞ, খ্যাতি-সম্পন্ন। নেপোলিয়ন বোলোঁর গতিবিধি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আর সচেতন ছিলেন বলেই নেপোলিয়নের প্রথম থেকে চেষ্টা ছিল যাতে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে কিছুতেই পীডমণ্ট-বাহিনী না মিলতে পারে। বোলোঁ কিন্তু এক ফাঁকে এক প্রচণ্ড ধাক্কায় নেপোলিয়নের বেশ খানিকটা ক্ষতি করে দিলেন। কিন্তু তারপরেই নেপোলিয়ন আরও নিপুণতার সঙ্গে নিজেকে তৈরী করে নিলেন। নেপোলিয়ন সেনাবাহিনীকে সুন্দর তিনটি ভাগে ভাগ করলেন। তিনজন সুদক্ষ সেনাপতির ওপর তাদের দায়িত্ব রইল। এরপর তিনি দুজন সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন যতটা সম্ভব দ্রুত গতিতে বোলোঁর সেনাবাহিনীকে একযোগে সামনে, পেছনে ও পাশে আঘাত করতে। নেপোলিয়নের নির্দেশ এমন একটা উপযুক্ত সময়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তা এত নিখুঁতভাবে পালিত হল যে ফল হল আশ্চর্য শুভ। নেপোলিয়নের জয় হল। অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীর অন্ততঃ হাজার সৈন্য মারা গেল বা আহত হল। বন্দী হল প্রায় আড়াই হাজার। ইটালী অভিযানে নেপোলিয়নের এই প্রথম জয়।

ইতিমধ্যে পীডমণ্টের সেনাবাহিনীর দিকে নেপোলিয়ন অভিযান পাঠিয়েছিলেন। সেনাপতিদের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল, কিছুতেই যেন অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী পীডমণ্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলতে না

পারে। তার আগেই পীডমণ্ট আক্রমণ করতে হবে। পীডমণ্টের সেনাবাহিনী তুজন সেনাপতির নেতৃত্বে তুভাগে বিভক্ত ছিল। মিলেসিমো বলে যে জায়গাটায় পীডমণ্টের সামরিক প্রস্তুতি খুব জোরদার করা হয়েছিল, নেপোলিয়ন স্বয়ং সেদিকে এগিয়ে গেলেন, প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। আক্রমণটা এত হঠাৎ করেছিলেন যে মিলেসিমোর সেনাপতি প্রোভেরা হকচকিয়ে গিয়ে একেবারে বিশ্রী রকম হেরে গেলেন। তাঁর সেনাবাহিনীর প্রায় সবাই বন্দী হল নেপোলিয়নের হাতে, আর ঐ একই দিনে নেপোলিয়ন হারালেন অস্ট্রিয়ার এক সেনাবাহিনীকে, হারিয়ে দিলেন দেগো-র যুদ্ধে। পরদিন অস্ট্রিয়ার ছ'হাজার সৈন্যের আরেকটি বাহিনীর পথ আটকে দিলেন। এরা ছুটে আসছিল পীডমণ্টকে সাহায্য করতে।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত-বুদ্ধি, দ্রুত সিদ্ধান্ত, ত্বরিত গতি এবং শত্রুসৈন্য যদি প্রবল হয়, তবে তাদের টুকরো টুকরো করে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রয়োজন যে সাফল্যের পথে কত বড় চাবিকাঠি, ইটালী অভিযানে নেপোলিয়ন সেটা প্রথম থেকেই প্রমাণ করতে লাগলেন।

যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয়, আর তার সঙ্গে আল্প্স্ পর্বত অতিক্রম করা, —কখনও পাথরের খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠা, কখনও সরু উপত্যকা দিয়ে চলা—এমনি করে নেপোলিয়ন তাঁর অভিযান নিয়ে এগিয়ে চললেন কোথাও এতটুকু বিশ্রাম না নিয়ে। টানা ছিয়ানব্বই ঘণ্টা ধরে এই চলল। ক্রমে তিনি শত্রু বাহিনীকে ঘিরে ফেললেন। খানিকটা বিশ্রাম করে নেপোলিয়ন তীব্র গতিতে আরও এগিয়ে গেলেন। ভিকোর যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন পীডমণ্টের সৈন্যদের। আর মাত্র কয়েক মাইল দূরে পীডমণ্টের রাজধানী তুরিন। মাঝখানে শুধু একটা নদী—স্টুরা। ব্যাস, তারপরেই পীডমণ্টের পতন। নেপোলিয়ন যেন লাফিয়ে চললেন…। স্বপ্নের অতীত দ্রুত গতিতে নেপোলিয়নের এগিয়ে-আসা শত্রুপক্ষের চোখে ধাঁধার সৃষ্টি করল। যুদ্ধ হয়, তার বাজনা বাজে, সৈন্যরা তালে তালে এগিয়ে আসে। দেখে শুনে পরিখা খোঁড়া হয়। কামানে বারুদ গাদা হয়—তবে তো যুদ্ধের শুরু! তা

নয়, নেপোলিয়ন এগিয়ে আসছেন, এই খবরটা কানে আসতে না আসতেই দেখা গেল, নেপোলিন কেল্লা ফতে করে দিয়ে বসে আছেন। নেপোলিয়ন আর তাঁর সঙ্গী লোকজনদের পিঠে কি পাখা গজিয়েছে ? তারা পায়ে হাঁটছে না, উড়ে আসছে।

মালগ্রেভের মতো দুর্গটাও যখন নেপোলিয়নের হাতে চলে গেল, তুরিন প্রাসাদ থেকে তখন ভিক্টর এমেদিউজ সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। স্তলিয়র আর কোস্টা এই দু'জনকে বললেন, "তোমরা যাও, দেখ এই ভয়ঙ্কর লোকটাকে একটু থামাতে পার কিনা…"

২৭শে এপ্রিল রাত এগারোটায় স্তলিয়র ও কোস্টা নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। নেপোলিয়ন তাঁর শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গায়ে সামরিক পোশাক। তবে হাতে কোন তরবারি ছিল না, মাথায়ও কোন সামরিক টুপি পরা ছিল না। মুখে অসীম ক্লান্তির ছাপ। চোখ দুটি লাল। একটু বিশ্রাম তো চাই। গত ক'দিন যে একটানা চলতে হয়েছে। যুদ্ধ জয়ের পথ তো আর ফুল বিছনো নয়… !

"আপনাদের রাজা ভিক্টর এমেদিউজ আমাদের ফ্রান্সের শর্তে রাজী আছেন কি না বলুন। আমাদের হাতে কুনিও তুলে দিতে হবে… ।"

স্তলিয়র ও কোস্টা চমকে উঠলেন। লোকটা বলে কি ! কুনিও দিয়ে দেওয়া মানে তো আলপাইন অঞ্চলে প্রবেশদ্বারের চাবি দেওয়া। আর নেপোলিয়ন যদি একবার আলপাইন অঞ্চল দখল করে নেন, তা হলে আর রইল কি !

নেপোলিয়ন ওঁদের চিন্তায়-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দেখলেন। তারপর ঘড়ি বার করে বললেন,—"একটা বাজে। কুনিও না পেলে আমার নির্দেশে কাল সকাল থেকে আবার আক্রমণ চলবে… ।"

স্তলিয়র আর কোস্টা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, তারপর বললেন, "ঠিক আছে, আমরা চুক্তিপত্রে সই করতে রাজী…কুনিও আর আমাদের থাকবে না… ।"

নেপোলিয়ন ওঁদের কফি খাওয়ালেন। তার সঙ্গে কিছু কেক আর ব্রাউন পাঁউরুটি। তাঁদের সঙ্গে খানিকটা গল্পগুজব করলেন। পীডমণ্ট সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। ইতিহাস নিয়ে, শিল্পকলা নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন।

স্তুলিয়র আর কোস্টা অবাক হয়ে ভাবলেন লোকটা যুদ্ধ করছে অসুরের মতো। তার সঙ্গে আবার এত জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, নতুন কিছু জানবার জন্য এত কৌতূহল··· !

নেপোলিয়ন এবার তৈরী হলেন পো নদী পার হবার জন্য। বুলোঁ দখল করতে হবে। অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে একটু শক্ত হাতে জব্দ করতে হবে।

পো নদীর বিশালতা ও তার ঘোর বাদামী রং এর জল দেখে ফরাসী সৈন্যরা চমকে উঠল। কিছুটা সময় থমকে দাঁড়াল। এই নদী পার হতে হবে! নেপোলিয়ন সুস্থ মাথায় আছেন তো! পো নদী পার হওয়া কি একটা নর্দমা ডিঙনো···! অন্তত দু মাস লাগবে এপারের প্রতিটি সৈন্যকে ওপারে নিয়ে যেতে।

নেপোলিয়ন ডেকে পাঠালেন জঁা লেনস নামে এক ছোকরা অফি-সারকে। সাহসী, উৎসাহী এই ছেলেটিকে নেপোলিয়ন ন'শ সৈন্য নিয়ে নদী পার হতে বললেন। "নৌকো করে চলে যাও, ওপারে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য একটা শক্ত সেতুমুখ তৈরী কর। আমরা তোমাদের পেছন পেছন যাচ্ছি···।"

নেপোলিয়ন সস্নেহে জঁা লেনসের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "সাহস হারিও না—নদী পার হতেই হবে···।"

নেপোলিয়ন ঠিক লোকই বেছেছিলেন। জঁা লেনস শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করে ওপারে পৌঁছলেন। একটা সেতুমুখ তৈরী করে ফেললেন। মাত্র দুদিনের মধ্যে নেপোলিয়ন তাঁর সমস্ত সেনা-বাহিনী নিয়ে ওপারে চলে গেলেন। "আমাদের সেনাপতির অসাধ্য কিছুই নেই, নইলে যে কাজটা করতে ভেবেছিলাম পাক্কা দু'মাস লাগবে, তা কিনা মাত্র দুদিনে সারা হল···!"

সৈন্যদের মধ্যে একটা সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও উৎসাহের সঞ্চার হল।

এর পরের কাজ আরও কঠিন। আদ্দা নামে অতি খরস্রোতা আরেকটি নদী পার হতে হবে। এবার মিলান অধিকারের মহা অভিযান।

আদ্দা নদীর তীরে লোদী নামে একটা ছোট শহর। সেখান থেকে একটা কাঠের সেতু আদ্দা নদীর ওপর দিয়ে গেছে। ঐ সেতুটা দখল করতে পারলে তবেই অস্ট্রিয়াকে জব্দ করা যাবে, নইলে ওখান থেকেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে পিছু হটে আসতে হবে। দেখতে অতি সাধারণ একটা কাঠের সেতু, কিন্তু ঐ সেতুটা পাহারা দিচ্ছে বারো হাজার শত্রুসৈন্য আর খান ষোল মারাত্মক কামান···।

১০ই মে। দুপুরবেলা। নেপোলিয়ন একা ঢুকলেন লোদী শহরে। আদ্দা নদী বয়ে যাচ্ছে। তার তীরে জন নেপোমুক নামে একজন সাধুর প্রতিমূর্তি। এই মূর্তিটার পেছনে নিজেকে আড়াল করে নেপো-লিয়ন দাঁড়ালেন। সেতুটা ভাল করে লক্ষ্য করলেন। কাঠের সামান্য একটা সেতু, বারো ফুটের মতো চওড়া, দুদিকে ধরবার কিছ্ছু নেই। লম্বায় বড় জোর দু'শ গজ। তাকেই রক্ষা করবার জন্য ওপারে একটা পুরনো কেল্লাকে অস্ট্রিয়ার সৈন্যরা কী ভাবে কামান দিয়ে সাজিয়েছে আর মাঝে মাঝে দ্যাম্ দ্যাম্ করে গোলা ফাটাচ্ছে! একটা গোলা তো ছিট্‌কে এল প্রায় নেপোলিয়নের পায়ের কাছে। ভাগ্যিস জন নেপো-মুকের মূর্তিটি ছিল, নইলে নেপোলিয়নের জীবন-ইতিহাস ওখানেই শেষ হত।

নেপোলিয়ন স্থির করলেন ঐ সেতু আক্রমণ করতে হবে, আঘাত হানতে হবে ঐ পাহারাদার সৈন্যদের। ঘা মারতে হবে পাশ থেকে।

"এ কখনও হয়! দেখবে এবার আমাদের সেনাপতি কেমন নাকের জলে চোখের জলে হন···।" সৈন্যদের মধ্যে এ ধরনের নানা কথা-বার্তা চলতে লাগল।

অন্য সেনাপতিরা মন্তব্য করলেন—"পাগল"।

নেপোলিয়ন কিন্তু শত মন্তব্যেও নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। প্রথমেই নির্দেশ দিলেন অশ্বারোহী সেনাবাহিনীকে, "যত তাড়াতাড়ি পারো, ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যাও। শত্রুসৈন্যদের ডান পাশে আক্রমণ কর···"।

নেপোলিয়ন আর একদিক দিয়ে পাঠালেন হাজার চারেক পদাতিক সৈন্য, নিজে উঠে বসলেন একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন সেতুর মুখে।

নেপোলিয়নের দৃপ্ত উৎসাহ, বিদ্যুৎগতি, অসীম সাহসিকতা ও আত্মবিশ্বাসে-ভরা চেহারা দেখে সৈন্য-সেনাপতিরাও যেন নতুন জীবন পেল। সন্ধ্যা যখন ঘোর হয়ে এল, সৈন্যদের ব্যাণ্ডে বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত লা মার্সাই। সেতুমুখ থেকে মুহুর্মুহু আগুনের গোলা ছুটতে লাগল অস্ট্রীয়া বাহিনীর দিকে আর সেই আগুনের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল ফরাসী সেনাবাহিনী। সেতু পার হতেই হবে। সাদা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেপোলিয়ন চিৎকার করে বললেন, "রেপাবলিক ফ্রান্সের জয় হোক···তোমরা এগিয়ে যাও। জয় আমাদের হবেই···।"

কেল্লা থেকে অস্ট্রিয়া সৈন্যরা সব কিছু দেখে শুনে কিছুক্ষণ থ' হয়ে বসে রইল। মুখ থেকে কারোর রা বেরুলো না। কী অদম্য উৎসাহে ফরাসী সৈন্যরা ছুটে আসছে মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরতে! আশ্চর্য, ওরা কি নেপোলিয়নের নির্দেশে মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় করতে ভুলে গেছে···! ঐ তো কাঠের পোল, সৈন্যরা ছুটছে। অস্ট্রীয়রা ঘন ঘন গোলা বর্ষণ করছে, সৈন্য মরছে, জলে পড়ে যাচ্ছে, তবু আসছে। তাদের নির্দেশ দিতে দিতে এগিয়ে আসছেন নেপোলিয়নের বাছাই করা সেনা-পতিরা। তাঁদের মধ্যে সকলের আগে আছেন সেনাপতি ডুপাস। চেহারায় বিশাল, সাহসে অতুলনীয়। আর ছিলেন মাসেনা, বার্থিয়ার এবং জাঁ লেনস।

ওপারে পৌঁছাতে যখন পঞ্চাশ গজের মত বাকি, তখন সেনাপতিদের নির্দেশে সৈন্যরা আদ্দা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, উদ্দেশ্য বাকিটুকু সাঁতার কেটে ওপারে ওঠা। নইলে শত্রুদের গোলার আঘাত থেকে

নিজেদের বাঁচাবার আর কোন পথ নেই। ওদিকে অস্ট্রিয়ার সৈন্যরা কামান দাগ্‌ছে তো দাগ্‌ছেই। লোদী সেতু পার হয়ে সৈন্যরা যেন কিছুতেই ওপারে না যেতে পারে।

হঠাৎ ওদের লক্ষ্য পড়ল জলের ওপর। জলে সাঁতার কেটে তীরের দিকে একে একে উঠে আসছে কারা! ফরাসী সৈন্যরা! ওরা তো একটু আগেও ছিল সেতুর ওপর। কখন শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে জলে ঝাঁপাল! আর এদিকে কিনা শূন্য সেতুর ওপর কামান দেগে দেগে বারুদ নষ্ট হয়েছে!

অস্ট্রীয় সেনাবাহিনী থেকে এক দল সশস্ত্র অশ্বারোহী ছুটে গেল ঐ তীরে-উঠে-আসা শত্রু সেনাকে বাধা দিতে।

নেপোলিয়ন উদ্বিগ্ন হয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন—লক্ষ্য করছিলেন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনী অন্য দিক দিয়ে অস্ট্রীয় বাহিনীকে পাশ থেকে আক্রমণ করেছে কিনা, নইলে তাদের মরণঘাতী আক্রমণের সামনে ফরাসী সৈন্য আর কতক্ষণ যুঝবে!

নেপোলিয়নের চোখ দুটি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অস্ট্রীয় সৈন্যরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের পার্শ্বদেশ আক্রান্ত হয়েছে। অচিন্তনীয় ভাবে ফরাসী অশ্বারোহী সেনাদল অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে। এখন তারা কোন্ দিক সামলাবে! রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী ছুটতে লাগল—সামনে ফরাসী বাহিনীর দিকে নয়, ছুট লাগাল পেছন ফিরে, যাকে বলে পিঠ দেখিয়ে। অস্ট্রিয়ার অত গর্বের সেনাবাহিনী পালিয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইল তিনশ' পঁয়ত্রিশ জনের মতো আহত ও মৃত অস্ট্রীয় সৈন্য। ফরাসীর হাতে বন্দী হল সতেরো শ', তার সঙ্গে বেশ কয়েকখানা কামান।

লোদীর এই দুঃসাহসিক যুদ্ধে নেপোলিয়নের ইতিহাস শুরু হল। নেপোলিয়ন হারিয়েছিলেন দুশ' সৈন্য। বাকি সেনাবাহিনীর দিকে তাকিয়ে নেপোলিয়নের মন দুঃখে ভারী হয়ে উঠল। কীই-বা ওরা

খেতে পায়! আলু আর বাদাম, প্রধানতঃ এই খেয়ে ঐ মানুষগুলি যুদ্ধ করেছে, জয়লাভ করেছে, নেপোলিয়নের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে। তবেই তো যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার দুর্ধর্ষ বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হল…

লোদীর যুদ্ধের পাঁচদিন পরে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার মিলান শহরে ঢুকলেন। মিলানের চার্চে ঘণ্টা বেজে উঠল। মিলানের অধিবাসীরা রাস্তার দু পাশে দাঁড়িয়ে বিজয়ী সেনাপতিকে দেখল, হাত নাড়ল।

নেপোলিয়ন মিলানের রাজপ্রাসাদে গিয়ে উঠলেন। কারণ অস্ট্রিয়ার আর্কডিউক সেখান থেকে ইতিমধ্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এক ভোজসভায় নেপোলিয়ন ইতালীয় ভাষায় বক্তৃতা করলেন, "মিলানের অধিবাসীরা আমাদের বন্ধু। ফরাসী বন্ধুত্বে কখনও বিশ্বাসের অভাব হবে না…।"

ডিরেক্টরী সভার কাছে নেপোলিয়ন চিঠি লিখলেন…"মিলান, প্যাভিয়া, কোমো আর লম্বার্ডি অঞ্চলের সব জায়গায় ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা উড়ছে…"

পীডমণ্টের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা আর মিলান জয় নেপোলিয়নের জীবনে এক বিরাট অভিলাষ পূর্ণ করল। এবার আরেকটি বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা—অস্ট্রিয়া জয়।

কয়েকদিন পরে নেপোলিয়ন চিঠি পেলেন ডিরেক্টরী সভার কাছ থেকে। চিঠি পড়ে নেপোলিয়ন স্তম্ভিত হলেন। যুদ্ধে অমন সাফল্যের পর ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে এই প্রতিদান!

চিঠিখানায় লেখা ছিল, এতদিন পর্যন্ত একা নেপোলিয়নই ছিলেন আল্প্স্ সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। চিঠিতে এখন নির্দেশ এল, এখন থেকে নেপোলিয়ন এই পদে আর একা থাকবেন না, তাঁর সঙ্গে আরেকজন থাকবেন, তিনি সেনাপতি কেলারম্যান।

নেপোলিয়ন অবাক হলেন। হঠাৎ ডিরেক্টরী সভা তাঁর একক নেতৃত্বে অবিশ্বাসী হলেন কেন! যার ফলে কিনা কেলারম্যানের মতো একজন একষট্টি বছরের বৃদ্ধ সেনাপতিকে তাঁর সঙ্গে দেওয়া

হচ্ছে ! হতে পারে কেলারম্যান নানা যুদ্ধে অভিজ্ঞ, কিন্তু যে দ্রুত সিদ্ধান্তের জোরে, যে ত্বরিত অভিযানের ফলে নেপোলিয়ন তাঁর অর্ধা-হারে পীড়িত সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, কেলারম্যান তো সেখানেই বাধা দেবেন। কারণ প্রথমতঃ কেলারম্যান যুদ্ধক্ষেত্রে অত দ্রুতগতিতে বিশ্বাসী নন। দ্বিতীয়তঃ কেলারম্যান যে হেতু বয়সে অনেক বড়ো এবং নিজেকে ইউরোপের সেরা সেনাপতি বলে মনে করেন, সেই হেতু তিনি কিছুতেই নেপোলিয়নের কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্তে কান দেবেন না। কেলারম্যানের অহমিকাই নেপোলিয়নের সব ব্যাপারে বাধা দেবে।

নেপোলিয়ন রেগেমেগে অথচ যুক্তি দিয়ে একটা চিঠি লিখলেন ডিরেক্টরী সভাকে "যুদ্ধ জয় গায়ের জোরের ব্যাপার নয়। কৌশল, নিয়মনীতির ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে দুজন সর্বাধিনায়কের ঠোকাঠুকিতে বিপদ ঘটবে। আমি এইভাবে কাজ করতে পারব না···।"

নেপোলিয়নের এই চিঠি পেয়ে ডিরেক্টররা প্রমাদ গুণলেন। লোদীর যুদ্ধে বিজয়ী নেপোলিয়ন যদি এখন বেঁকে বসেন—তা হলে মহামুস্কিল। কারণ খবর পাওয়া গেছে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর মিলিত এক বিরাট সেনাবাহিনী সেনাপতি উরম্‌সারের অধিনায়কত্বে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আসছে। সেই সেনাবাহিনীকে বাধা দিতে হবে আর এদের বাধা দেবার আগে ইটালীতে পোপের অধিকৃত অঞ্চল আর ট্যাসকানী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জয় করা দরকার। এই দ্রুত অভিযানে নেপো-লিয়ন ছাড়া আর যোগ্যতর কে আছে··· !

ডিরেক্টরী সভার সিদ্ধান্ত হল নেপোলিয়নই এই ইটালী অভিযানে একক সর্বাধিনায়ক থাকবেন। তাঁর সঙ্গে কেলারম্যান থাকবেন না।

নেপোলিয়ন খুশি হলেন।

নেপোলিয়ন এইবার দেখাতে লাগলেন যুদ্ধের খেলা। বিদ্যুৎগতি কাকে বলে ! নেপোলিয়ন মনে মনে ভালো করে হিসেব করলেন উরম্‌সুরের আসতে আর কদিন লাগবে, কারণ উরম্‌সুর পৌঁছবার আগেই এদিকের খেলা শেষ করতে হবে।

নেপোলিয়ন সত্যিই খেলা দেখালেন। ঝড়ের গতিতে পো নদী পার হলেন। পোপের রাজ্যসীমায় এসে তাঁর আঠারো হাজার সৈন্যের একটি দলকে তছনছ্ করে দিলেন। ঝাঁ করে ফ্লোরেন্সে ঢুকলেন। ইংরেজদের হাত থেকে ছোঁ মেরে লেগহর্ন নিয়ে নিলেন। সেখানে প্রচুর সোনাদানা পেলেন। ইংরেজদের জাহাজ আটকে ফেললেন। এমন কি লেগহর্নে পাঁচশর মতন যে কর্সিকান ছিল তাদের নিয়ে নেপোলিয়ন একটা বিশেষ বাহিনী তৈরি করে তাদেরই সাহায্যে কর্সিকাকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করলেন। তাকে ফরাসী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

নেপোলিয়নের মনে সেদিন আনন্দের বান ডেকেছিল। তাঁর মাতৃভূমি লতাপাতায় ঢাকা কর্সিকা দ্বীপ, তাঁর জন্মভূমিকে অবশেষে ইংরেজদের হাত থেকে তিনি ছিনিয়ে নিতে পেরেছেন। মনে পড়ল সেদিনের কথা, যেদিন তিনি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মা-ভাই-বোনদের নিয়ে কর্সিকা থেকে ফ্রান্সে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এরপর নেপোলিয়ন ছ'সপ্তাহের মধ্যে তিনশ' মাইল পাড়ি দিয়ে মিলানে গেলেন। সেখান থেকে জয় করলেন গোটা মধ্য ইটালী। এখানেও প্রচুর সোনা-দানা পেলেন। নগদ পেলেন চার কোটি টাকা।

নেপোলিয়ন একদিকে এই কাজ করছেন, অন্যদিকে ঠিক খেয়াল রাখছেন উরম্স্নুর কোথায় যাচ্ছেন, কত দূর যাচ্ছেন। ফলে, উরম্স্নুর যদিও হাজার পঞ্চাশেক সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ক্যাসটিগলিওন বলে একটা জায়গায় নেপোলিয়নের হাতে জোর ধাক্কা খেলেন। এরপর উরম্স্নুর গেলেন বোভারেডো তারপর বাসানো। কিন্তু কোন জায়গাতেই তাল সামলাতে পারলেন না, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন।

ছ'মাস পরেই আলভিন্‌জি নামে এক সেনাপতির অধিনায়কত্বে আবার নতুন এক অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল নেপোলিয়নের যুদ্ধ-ক্লান্ত সেনাবাহিনীর ওপর। যুদ্ধ হল আরকোলায়।

যুদ্ধে জয়ী হলেন নেপোলিয়ন, তবে এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের জীবনের ওপর এক মস্ত বড় ফাঁড়া নেমে এসেছিল। লোদীর যুদ্ধের মতো আরকোলার যুদ্ধও ছিল নদীর ওপর একটা সেতু পার হবার যুদ্ধ। যুদ্ধ আরম্ভ হল। নেপোলিয়ন যথারীতি তাঁর ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন। ঘোড়াটা শত্রুসৈন্যের আক্রমণে আহত হয়ে নেপোলিয়নকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটে গেল সামনে নদীর দিকে, তারপর জলে ডুবে গেল। নেপোলিয়ন ছিটকে পড়েছিলেন কাদা-জলে একাকার একটা বিশ্রী জায়গার ওপরে। পড়ামাত্র নেপোলিয়নের কাঁধ পর্যন্ত ডুবে গেল সেই নরম কাদায়। কী সাংঘাতিক ভয়াবহ অবস্থা! ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের গোলা। অস্ট্রীয় সৈন্যরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছে। তাদের মধ্যে কেউ যদি নেপোলিয়নকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেত তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই নেপোলিয়নের গোটা শরীরটি ডুবে যাওয়ায় অসহায় অবস্থার দিকে লক্ষ্য পড়ল ভাই লুইয়ের আর অগাস্ট মারমন্ট নামে একজন সামরিক কর্মচারীর। তারা ছুটে টেনে তুলল নেপোলিয়নকে। নেহাতই আয়ুর জোরে সেবার নেপোলিয়ন বেঁচে ফিরেছিলেন। আরকোলার যুদ্ধে নেপোলিয়নের যুদ্ধপরিচালনায় অদ্ভুত কৃতিত্বের দৃঢ় পরিচয় পাওয়া গেল। ডিরেক্টররা খুশি হলেন। যুদ্ধে তো জয় হয়েইছে, উপরন্তু নেপোলিয়ন সোনা এনেছেন কত, আর টাকা! নগদ চার কোটি টাকা। এও বড় কম নয়। তবে যতই হোক নেপোলিয়নের হাবভাব কিন্তু ডিরেক্টদের চোখে মোটেই ভাল ঠেকল না। প্রথম থেকেই কেমন যেন একটু অবাধ্য একগুঁয়ে ভাব, আর সব সময় 'আমিই আমার কাজ বুঝবো, খবরদার, কেউ যেন নাক না গলায়, আমার কাজে কেউ যেন কথা না বলতে আসে' ইত্যাদি, ইত্যাদি—নেপোলিয়নের এমনধারা কথাবার্তাতেও ডিরেক্টররা বিরক্ত হয়েছিলেন।

বিরক্ত হওয়া বাজে কথা, আসলে ডিরেক্টররা ভয় পেয়েছিলেন। কি জানি, যুদ্ধের খেল্ দেখিয়ে নেপোলিয়ন আকাঙ্ক্ষার কোন্ মগ্‌ডালে

উঠতে চাইছেন! মুখে তো খুব বলছেন, "আমার ব্যক্তিগত কোন লোভ নেই, উচ্চাশা নেই···" হেন তেন কত কী! কিন্তু কাজে বা ব্যবহারে তো অত ভালোমানুষী কিছু দেখা যাচ্ছে না ডিরেক্টরদের নির্দেশ মানতে আপত্তি, তাঁদের পাঠানো প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি—এ সব কী! রাজনীতিতে এ সব ব্যবহার অগ্রাহ্য করাটা বোকামি···।

ডিরেক্টরদের নির্দেশে হেনরী ক্লার্ক বলে এক ব্যক্তিকে পাঠানো হল নেপোলিয়ন সম্বন্ধে সব কিছু বিশদভাবে জানানোর জন্য। হেনরী ক্লার্ক যখন নেপোলিয়নকে দেখলেন তখন নেপোলিয়ন ঠাণ্ডা লেগে সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে চোখ-মুখ লাল করে বসেছিলেন। অবিরত যুদ্ধ করে শরীর তখন বেশ শীর্ণ। গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে মাথায় যেন আরও ছোট হয়ে গিয়েছিলেন।

অনেক কিছু খুঁটিয়ে দেখেও হেনরী ক্লার্ক নেপোলিয়ন সম্বন্ধে বিরোধী রিপোর্ট দেবার মতো কিছু পেলেন না। তাঁর পাঠানো চিঠি পেয়ে ডিরেক্টররা একটু নিশ্চিন্ত হলেন। যাক, নেপোলিয়নের দিক থেকে আপাতত কোন ভয়ের কারণ নেই।

খবর এল আটাশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন অস্ট্রিয়ার সেনাপতি আলভিন্‌জি, আর অন্যদিকে সতেরো হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন সেনাপতি প্রোভেরা। দু'দলেরই লক্ষ্য —বদ্ধ জলাভূমি-ঘেরা মাণ্টুয়া, যেখানে নেপোলিয়নের আক্রমণে বিশ হাজার অস্ট্রীয় সৈন্য আটকে পড়েছে, তাদের ঘিরে রেখেছে ফরাসী সৈন্য। আটক সৈন্যরা খিদে মেটানোর জন্য ঘোড়ার মাংস খেয়ে কোন মতে ধুঁকছে আর দিন গুণছে। তাদের উদ্ধার করতেই হবে।

নেপোলিয়নকে আক্রমণ করবার এই তো সুযোগ। যতই কেন না মাণ্টুয়াকে অবরোধ করে রাখুন, নেপোলিনের সৈন্য সংখ্যা কিন্তু অনেক কমে গেছে। তার ওপর প্রচুর সৈন্য জ্বরে অসুস্থ। বেশ কিছু রয়েছে মাণ্টুয়াতে। কিছু রয়েছে আবার আরকোলাতে। নেপো-

লিয়নের কাছে আছে বিশ হাজার সৈন্য, আর আলভিন্‌জি এবং প্রভেরার সৈন্য সংখ্যা হল পঁয়তাল্লিশ হাজার। সোনার মুহূর্ত আর কাকে বলে! এই সুযোগেই তো ঘায়েল করতে হবে নেপোলিয়ন নামক দুর্দান্ত সেনাপতিটিকে।

নেপোলিয়ন নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে প্রথমে আলভিন্‌জির সৈন্যদলকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। নেপোলিয়ন রিভোলী নামে একটা মালভূমি বেছে নিলেন। যুদ্ধের দিক থেকে জায়গাটা অপূর্ব। দুদিকে দুটি নদী আর দুদিকে খাড়া খাড়া পাহাড়। কোন যুদ্ধের সাফল্যের পেছনে এই ভৌগোলিক গুরুত্ব যে কতখানি সেটা নেপোলিয়ন যতটা বুঝেছিলেন, ঐ যুগে এমন কেউ বুঝত না।

নেপোলিয়ন রিভোলীতে সৈন্য সাজালেন। সেদিন রাত্রিবেলা আকাশে চাঁদ উঠেছিল। নেপোলিয়ন আকাশের দিকে না তাকিয়ে নীচে মাটির ওপর, যেখানে চাঁদের আলো পড়েছিল, সেই দিকে তাকালেন। দেখলেন রিভোলী মালভূমির চারপাশে আলভিন্‌জি তাঁর সেনাবাহিনীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে সাজিয়েছেন। শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ফরাসী সৈন্যের চাইতে অনেক বেশী দেখে নেপোলিয়ন ঠিক করলেন, ঐ পাঁচ-ভাগে বিভক্ত শত্রুবাহিনীর প্রত্যেকটিকে সমস্ত সৈন্য নিয়ে এক-এক করে আক্রমণ করতে হবে…।

পরদিন সকাল না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ হল। শত্রুপক্ষের যে দলটি সব চাইতে বেশী শক্ত সমর্থ ছিল, নেপোলিয়ন হুকুম দিলেন সব সৈন্য নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে।

যুদ্ধ শুরু হল। ভয়াবহ যুদ্ধ। প্রথমটা নেপোলিয়ন একটু বেকায়দায় পড়লেও পরে শুধু বিদ্যুৎগতিতে একের পর এক শত্রুদল ঘায়েল কবতে লাগলেন। আধুনিক কায়দায় 'ব্লিৎজ্‌ক্রিগ্‌' আক্রমণ, অকস্মাৎ আক্রমণ চালানো —কীভাবে আক্রমণ আসছে, কত তাড়াতাড়ি আসছে, সেটা পর্যন্ত শত্রুপক্ষকে বুঝতে না দেওয়া,—এই কৌশল বোধ করি ফরাসী রাজ্যের ইতিহাসে কেন, ইউরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়নই প্রথম দেখালেন। নেপোলিয়নের আরেকটি কৌশল ছিল

শত্রুবাহিনীকে সামনে বা পেছন দিক থেকে আক্রমণ না করে একপাশ থেকে আক্রমণ করে তাকে ঘায়েল করা। এই দুটি কৌশলই দারুণ ফলপ্রদ হল রিভোলীর যুদ্ধে। অস্ট্রিয়ার অমন দুর্ধর্ষ সৈন্য পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করল। তাদের আট হাজার মারা গেল, আহত হল এবং বন্দী হল। জয়ের মালা নেপোলিয়নের গলাতেই আবার দুলে উঠল।

নেপোলিয়ন এবার তাঁর রণক্লান্ত সেনাবাহিনী নিয়ে চললেন মাণ্টুয়াতে। সেনাপতি মাসেনা ইতিমধ্যে একনাগাড়ে বারো ঘণ্টা রিভোলীতে যুদ্ধ করেছেন। এবার সারারাত, সারাদিন অবিরত হেঁটে এগিয়ে এলেন মাণ্টুয়ার দিকে। নেপোলিয়নের সঙ্গে থেকে অন্যান্য সেনাপতি ও সৈন্যরাও যেন কেমন আসুরিক মনোবলের অধিকারী হয়ে উঠেছিল।

এবার শত্রু-সেনাপতি প্রভেরার পালা। প্রভেরা যুদ্ধে তো হেরে গেলেনই, উপরন্তু তাঁর অধীন সতেরো হাজার সেনাবাহিনীর প্রায় সম্পূর্ণই নেপোলিয়নের হাতে বন্দী হল। ওদিকে পলায়মান সেনাপতি আলভিন্‌জির সাত হাজার সৈন্যও ফরাসীদের হাতের মুঠোয় আটকে পড়ল।

আর উরম্‌সার? সেনাপতি উরম্‌সার! যিনি কি না আসলে ফরাসী হয়েও অস্ট্রিয়ার দলে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের হয়েই মহা-বিক্রমের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন নেপোলিয়নকে শেষ করে দিতে। তাঁর কি হল! তিনি ঐ মাণ্টুয়াতেই একেবারে জাঁতিকলে ধরা পড়লেন এবং নেপোলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।

ডিরেক্টরী সভা আদেশ দিয়েছিলেন উরম্‌সারকে যেন গুলি করে মেরে ফেলা হয়। দেশদ্রোহীর এটাই একমাত্র শাস্তি। নেপোলিয়ন এই আদেশ মানলেন না। হলেই বা শত্রু! কিন্তু তাঁর বীরত্ব, সাহসিকতা, যুদ্ধকৌশল দেখে তো মুগ্ধ হতে হয়! এ সব গুণের কি কদর নেই! সেবার নেহাতই নেপোলিয়নের মহত্ত্ব বলে উরম্‌সুর অস্ট্রিয়ায় ফিরে যেতে পেরেছিলেন।

ইটালীতে নেপোলিয়নের হাতে অস্ট্রিয়ার এ-হেন পরাজয়ে গোটা ইউরোপ চমকে উঠল।

নেপোলিয়নের ইচ্ছে ছিল তিনি টানা চলে যাবেন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দিকে। জয়ের পর জয় লাভ করে সেখানে যেতে বাধা কোথায়! কিন্তু বাধা একটা এল। বাধা এল তদানীন্তন পোপ পায়াস-এর একটা ঘোষণায়। মহামান্যবর পোপ রেপাবলিক ফ্রান্সের জন্ম থেকেই ফরাসীদের ওপর চটেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের এ কেমনতর শিক্ষা যে, ঈশ্বরের মহিমাকে আগে স্থান না দিয়ে জনতার দাবিকে আগে স্বীকার করে! চার্চের দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মঙ্গল সাধন করতে চায়! যত সব বিধর্মী, বেয়াদবের দল! যারা যাজক আর সাধারণ লোকগুলোকে এক শ্রেণীতে ফেলে সমান দেখাতে চায়, ঈশ্বর তাদের একবার দেখে নেবেন! দূর হোক ফরাসী বিপ্লব আর রেপাবলিক ফরাসী দেশ। আমার অস্ট্রিয়াই ভালো। অস্ট্রিয়াই আমার রাজ্যপাট রক্ষা করবে। পোপ যদিও নেপোলিয়নের হাতে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের কথা শুনেছেন, তবু তিনি দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করলেন ফরাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যদি কেউ আশ্রয় চায় তো রোমের দরজা তার জন্য খোলা রইল…।

এ হেন ঘোষণায় অর্থাৎ পোপের প্রকাশ্য ফরাসী বিরোধিতায় নেপোলিয়ন ভিয়েনা অভিযান স্থগিত রেখে পোপের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। পোপের রাজ্যের একে একে প্রায় সবকটি অংশ খসে পড়ল নেপোলিয়নের হাতে। বাধা পেলেন অতি সামান্য। এবার পোপের সঙ্গে একটা চুক্তি করা দরকার। ওদিকে ডিরেক্টরদের মধ্যে একজন বলে বসলেন, পোপের সঙ্গে আবার চুক্তি-টুক্তি কি! পোপ বলে কেউ থাকবে না। পোপের রাজত্বের এখানেই শেষ। নেপোলিয়ন অবশ্য সাত-পাঁচ ও ভবিষ্যৎ ভেবে ঐ উনসত্তর বছরের বৃদ্ধ পোপ সম্বন্ধে অতটা কড়া হলেন না। কারণ নেপোলিয়ন জানতেন ইটালীতে পোপের সরকারের অবসান মানেই অন্যান্য রাজকীয় ভাগীদারদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। সে আবার এক উটকো বিপদ হবে। তার

চাইতে ভদ্রগোছের একটা চুক্তি করে পোপকে হাতের মুঠোয় রাখা ভালো। তাই হলো, পোপের সঙ্গে চুক্তি করে তাঁর কাছ থেকে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের হয়ে বোলোগনা, ফেরারা আর রোমাগনা জায়গা কটা নিয়ে নিলেন। এর সঙ্গে পেলেন তিন কোটি টাকার সোনা।

এবার নেপোলিয়ন ছুটলেন অস্ট্রিয়ার দিকে। শীতকাল। পুরু করে বরফ পড়েছে। এইটুকু গ্রাহ্য করবার কিছু নেই। নেপোলিয়ন স্বভাবমতো দ্রুতগতিতে আক্রমণ করলেন অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীকে। প্রথমেই জয় করলেন লিওবেন, তারপর সোজা গিয়ে হাজির হলেন রাজধানী ভিয়েনার দোর গোড়ায়। ভিয়েনা তো একেবারে থ'। কে জানতো নেপোলিয়ন এমন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসবেন! ভিয়েনায় তখন সৈন্য কোথায়! তারা তো সব চলে গেছে রাইন অঞ্চলে! এখন! উপায় নেই। অস্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ভয় পেয়ে তাঁর ছেলে মেয়েদের হাঙ্গেরীতে পাঠিয়ে দিলেন। এর মধ্যে একজন ছিল মেরী লুইসা। ফুটফুটে পুতুলের মতো মেয়ে। সেদিন কে জানত কয়েক বছর পরে নেপোলিয়নের জীবনে মেয়েটি কোন্ বাঁধনে আবদ্ধ হবে…!

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়ন লিওবেনের চুক্তি করলেন। চুক্তি অনুযায়ী ডাচি অব মিলান বা মিলানের প্রকাণ্ড জমিদারীটি এসে গেল ফ্রান্সের হাতে। ঠিক হল এবার ফ্রান্স-অস্ট্রিয়া আর শত্রু নয়। এবার থেকে তাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক, নিগূঢ় বন্ধুত্ব…।

অস্ট্রিয়ার এ-হেন চুক্তির পর নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান সম্পূর্ণ হল, সার্থক হল। ইটালাতে এত সার্থক অভিযান এর আগে ফ্রান্সের ইতিহাসে কখনও ঘটেনি, নেপোলিয়নের মতো এমন কৃতিত্বের স্বাক্ষরও এর আগে কেউ রাখেননি। নেপোলিয়ন যুদ্ধ করেছেন তাঁর সৈন্য সংখ্যার চাইতে অন্তত চারগুণ বেশী শত্রুসেনার সঙ্গে। অন্তত বারোটি বড়ো বড়ো যুদ্ধে নেপোলিয়ন জিতেছেন। তেতাল্লিশ হাজারের মতো শত্রুসেনা নিহত, আহত এবং বন্দী হয়েছে। শত্রুপক্ষের একশ' সত্তরটি পতাকা ও এগারো শ' কামান নেপোলিয়নের হস্তগত হয়েছে। এমন

জয় সত্যি এর আগে হয়নি। নেপোলিয়নের সময়নিষ্ঠা, বিদ্যুৎগতি, তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা আর সর্বোপরি প্রতিটি সৈনিক-সেনাপতিদের সম্পর্কে সযত্ন দৃষ্টি, তাদের খাওয়া-পরা, তাদের বিশ্রাম, তাদের কাজের পুরস্কার, এই সব কিছু ছিল এত বড় জয়ের মূল ভিত্তি। ভবিষ্যতে নেপোলিয়ন আরও যে চমকপ্রদ যুদ্ধাভিযান চালিয়েছিলেন তার পেছনেও ছিল এইসব বৈশিষ্ট্য।

নেপোলিয়নের এত জয়-জয়কার, তাঁকে ঘিরে এত কলকোলাহল, এর মধ্যে তাঁর সদ্য-পরিণীতা জোসেফাইনের কী খবর—! নেপোলিয়ন যখন আল্‌প্‌স্ পর্বত পার হয়ে যাচ্ছেন, যখন লোদীর যুদ্ধে সেই ভয়ঙ্কর গোলাগুলির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, যখন ভিয়েনার দিকে ছুটে যাচ্ছেন, তখন কি তাঁর সদা-ব্যস্তমনে জোসেফাইনের কোন স্থান ছিল না!

ছিল বই কি, এক মুহূর্তের জন্যও নেপোলিয়ন তাঁর মন থেকে জোসেফাইনকে মুছে ফেলতে পারেননি। ঐ ভয়াবহ যুদ্ধ-শিবির থেকে তিনি সমানে জোসেফাইনকে চিঠি লিখেছেন, "আমার জোসেফাইন, আমার প্রিয় জোসেফাইন, আমার গোটা বুকখানা জুড়ে তুমি বসে আছ আমার চিন্তায়, আমার ধ্যানে আমার সর্বকাজে। খুব ইচ্ছে করছে তোমার কাছে ছুটে চলে যাই···।"

চিঠির উত্তর আসত। তবে অনেক, অনেক দেরিতে। জেসেফাইন নাকি চিঠি লিখতে ভালোবাসতেন না। তা ছাড়া নেপোলিয়নের এমন আবেগ-উষ্ণতায়-ভরা চিঠি জোসেফাইনের বুকে কোন দোলা দিত না। তবে নেহাতই না দিলে অভদ্রতা হয়, তাই জোসেফাইন মাত্র দু'একবারই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন, আর সেই চিঠি পেয়ে নেপোলিয়ন তার প্রতিটি লাইন আঁতি-পাঁতি করে খুঁজে পেতে চাইতেন দূরে-থাকা প্রিয়তমা স্ত্রীর বুকভরা উষ্ণতা, যুদ্ধরত স্বামীর জন্য স্ত্রীর উদ্বেগ, তার প্রীতি ও শুভেচ্ছা···।

নেপোলিয়নের বুক ভেঙে যেত স্ত্রীর শুকনো চিঠিতে। চিঠি লেখায় জোসেফাইনের ইচ্ছা আর আগ্রহের অভাব—শুধু একটুকুই নেপোলিয়ন

উপলব্ধি করতে বাধ্য হতেন, বেদনাচ্ছন্ন অনুভূতিতে নেপোলিয়নের বুক ভারী হয়ে উঠত…। মাঝে মাঝে নেপোলিয়ন নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন, নিশ্চয়ই জোসেফাইন অসুস্থ, নইলে উত্তর দেবেন না কেন? আবার কখনও-বা রাগ করে নিজের মনে বলতেন, "বড় নিষ্ঠুর তুমি জোসেফাইন। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসতে তা হলে তুমি আমাকে রোজ তু'খানা করে চিঠি লিখতে। জোসেফাইন, তোমার মন পাথরের মতো কঠিন, আর আমি! তোমার অদর্শনে আমার ভালোবাসা যে সীমাহীন হয়ে উঠেছে… !"

জোসেফাইনের অদর্শন নেপোলিয়নকে এত ব্যাকুল করে তুলল যে. তিনি চেষ্টা করে ডিরেক্টরী সভার কাছ থেকে বিশেষ অনুমোদন লাভ করলেন যাতে জোসেফাইনকে অন্তত কিছুদিনের জন্যও ইটালীতে নিয়ে আসতে পারেন। এই সময় নেপোলিয়ন পীডমণ্টকে সদ্য পরাজিত করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছেন, ইটালী অভিযানে নেপোলিয়নের পরিচালনায় তখন দারুণ কৃতিত্ব, সুতরাং নেপোলিয়নকে চটানোর মতো বোকামি করার কোন মানে হয় না। অতএব ডিরেক্টরী সভা প্যারিস থেকে জোসেফাইনকে নিয়ে আসার জন্য নেপোলিয়নকে অনুমতি দিলেন। নেপোলিয়ন জাওচিম মুরাট নামে অশ্বারোহী বাহিনীর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে পাঠালেন প্যারিস থেকে জোসেফাইনকে নিয়ে আসবার জন্য।

মুরাট চলে গেলেন, আর নেপোলিয়ান মুহূর্ত গুণতে লাগলেন কখন জোসেফাইন আসবেন, তাঁকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবেন, তাঁকে আদরে আদরে আচ্ছন্ন করে দেবেন… ! সে কখন ! আর কতক্ষণ…।

কয়েকদিন পর প্যারিস থেকে মুরাট চিঠি লিখলেন…জোসেফাইন এখন ইটালীতে আসতে পারবেন না। শরীর খুব খারাপ। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে জোসেফাইন মা হতে চলেছেন…।

নেপোলিয়ন, মানুষ নেপোলিয়ন লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর সন্তান আসছে… ! জোসেফাইনের গর্ভে নেপোলিয়নের ভাবীকাল রক্ত মাংসে গড়ে উঠছে… ! এত সীমাহীন আনন্দও জীবনে আসে… !

নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠি লিখলেন, "নিজেকে সুস্থ রাখবে, শরীরের যত্ন নেবে, মনকে সব সময় প্রফুল্ল রাখবে।···জোসেফাইন, তোমাকে এখন খুব দেখতে ইচ্ছে করছে···।"

জোসেফাইনের কাছে নেপোলিয়নের কাছ থেকে আবার ঘন ঘন চিঠি যেতে লাগল—। চিঠিগুলির সারমর্ম একই—"তুমি ছাড়া আমার এখানে সব কিছুই অর্থহীন মনে হয়। যখন আমার প্রিয়তমা স্ত্রী অসুস্থ, তখন বলতো আমি কোন্ মন নিয়ে যুদ্ধ করব, শত্রু ধ্বংস করব—! আমি যে আর কিছুই ভাবতে পারছি না জোসেফাইন। তোমার যে ছবিখানা আমি সবসময় কাছে কাছে রাখি, আমার চোখের জলে এখন সেই ছবি ভিজে যাচ্ছে জোসেফাইন—!"

দিন যায়। জোসেফাইনের কাছ থেকে দু' একখানা চিঠিও আসে। কিন্তু তাঁর শারীরিক অসুস্থতা সম্বন্ধে কই কিছু তো খবর থাকে না! জোসেফাইন কি তা হলে বর্তমানে সুস্থ আছে। যদি সুস্থই থাকে তা হলে স্বামীর কাছে আসছে না কেন! স্বামী-সাক্ষাতে কেন জোসেফাইনের এত ঔদাসীন্য! আগ্রহের এত অভাব!

নেপোলিয়ান এবার জোসেফাইনকে একখানা চিঠি দিলেন অনেক অনুযোগ করে, অনেক অভিমান জানিয়ে। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে এক চরম প্রশ্ন করে বসলেন, "তুমি কি আর কাউকে ভালোবেসেছ! যদি তাই হয় তা হলে ওথেলোর ক্রোধ সম্বন্ধেও সচেতন থেকো।"

নেপোলিয়নের রাগ অভিমান, ও ভয় দেখানো কোনো কাজেই এলো না। জোসেফাইন ইতিমধ্যে হিপ্পোলাইট চার্লস নামে একজন অতি সাধারণ সেনাপতিকে সত্যিই মন-প্রাণ সমর্পণ করে বসেছিলেন।

কি গুণ ছিল হিপ্পোলাইটের! বাপের ছিল কাপড়ের ব্যবসা। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর। জোসেফাইনের চাইতে ন'বছরের ছোট, লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুট, গায়ের রং তামাটে, নীল চোখ, কুচকুচে কালো চুল। সুদর্শন মুখ। হিপ্পোলাইটের মতো অমন সুশোভন ভাবে সাজতে কেউ পারতো না। যেমন জামাকাপড়ের পারিপাট্য, তেমনি মাথার চুল আঁচড়ানোর স্টাইল, তেমনি আবার গলায় টাই বাঁধবার কায়দা···।

তা ছাড়া কি হাসিখুশি! হিপ্পোলাইট নিজে হাসে, অন্যকে হাসায়। যখন যেখানে থাকে জমিয়ে রাখে। তা ছাড়া গল্প-গুজবের সময় কোন গুরুমশাইগিরি করে না। বার বার ঘড়ি দেখে না, বার বার জানিয়ে দেয় না···জানো, আমি সেনাপতি, আমি যুদ্ধ করি। আমার আড্ডা দেবার সময় নেই···! উঃ কী অসহ্য···। জোসেফাইন যখন এসব ভাবেন, আঁৎকে ওঠেন···। হিপ্পোলাইটের সব কিছুকে প্রশংসা করেন। জোসেফাইনের পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজবার কায়দা রীতি দেখে হিপ্পোলাইটও উল্লসিত হয়।

এই তো রীতি! মেয়েরা সাজবে, পুরুষরা তারিফ করবে। তা নয়, কেবল বই পড়, বড়ো বড়ো কথা নিয়ে আলোচনা কর, দার্শনিক বনে যাও···যত সব···। এর চাইতে হিপ্পোলাইটই ভালো। সহজ, সাধারণ মানুষ···। এই ভালো।

হালকা মনের মেয়ে জোসেফাইন কি করে তল পাবেন নেপোলিয়নের বুদ্ধিদৃপ্ত, শিক্ষিত মনোভাবের। কি করে তিনি বুঝবেন যে, নেপোলিয়ন যে দায়িত্বভার নেন, তার প্রতি তাঁর অটুট কর্তব্যনিষ্ঠা। তাই সদ্য বিয়ের পর নেপোলিয়ন যখন ইটালী অভিযানে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি হিসেবে নানারকম সামরিক তথ্যাদি সম্বলিত বই পড়ছিলেন, পূর্বের প্রথিতযশা সেনাপতিদের জীবনী খুঁটিয়ে দেখছিলেন তখন জোসেফাইন অধৈর্য হয়ে বলেছিলেন, "এই, কি রাতদিন কেবল বই নিয়ে পড়ে আছো, এসো না একটু···।" নেপোলিয়ন বইয়ের পাতা থেকে মাথা না তুলে উত্তর দিয়েছিলেন···"আগে যুদ্ধে জয় লাভ করি, তখন দুজন দুজনকে ঘনিষ্ঠ করে পাব···।"

এই লোকের সঙ্গে প্রেম! এই লোকের সঙ্গে গোটা জীবনটা কাটানো! অসম্ভব। জোসেফাইন নিজের মনে মাথা নেড়েছিলেন। "এর চাইতে আমার সঙ্গী হবে হাসিখুশিতে-ভরা একটি উচ্ছল মানুষ। দরকার নেই আমার পাণ্ডিত্যে, আর কত বড় সেনাপতি কত সৈন্য হাঁকালো এই গৌরবে···। আমি ভালোবাসি স্বাভাবিক মানুষকে। অতি-মানবে আমার দরকার নেই···।"

মধুযামিনী অসমাপ্ত রেখে বিয়ের তুদিন পরেই স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর বিদায় নেওয়াটা জোসেফাইনে একেবারেই পছন্দ হয়নি। সুতরাং হিপ্পোলাইটই ভালো, জোসেফাইনের উপযুক্ত সঙ্গী। জোসেফাইনের সাধ্য কি নেপোলিয়নের মনের নাগাল পান। ফলে নেপোলিয়নও কোনদিন জোসেফাইনের মনের নাগাল পাননি, তাঁর মনের মানুষ হননি। অথচ জোসেফাইনের স্ত্রী-সুলভ কমনীয়তা দেখে নেপোলিয়ন তাঁকে কত না ভালোবেসেছিলেন।

জোসেফাইনের ঔদাসীন্য দেখেও নেপোলিয়ন তাঁকে একবারটি ইটালীতে আসবার জন্য এত নাছোড়বান্দা অনুরোধ করতে লাগলেন যে, জোসেফাইন শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে একবার বেড়িয়েই যাবেন। অবশ্য এই ইচ্ছের পেছনে কারণ ছিল। হিপ্পোলাইট বেশ কিছুটা পথ জোসেফাইনের সঙ্গে আসবে। মিলান পর্যন্ত সমস্ত পথটা জোসেফাইন আর হিপ্পোলাইট খুব ঘনিষ্ঠভাবে এলেন।

নেপোলিয়ন এতদিন পরে জোসেফাইনকে দেখে তাঁর ব্যবহার, তাঁর ওপর রাগ, অভিমান, সব কিছু ভুলে গিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন, "ভালো আছ! এখন তোমার শরীর কেমন! আর—আর—আমাদের সন্তান··· !" নেপোলিয়নের গলার স্বরে অস্থিরতা, উত্তেজনা তুই-ই···।

জোসেফাইন একটু বিব্রত হলেন। তারপর মৃতুকণ্ঠে বললেন, "আমার শরীর ভালো, তবে ঐ খবরটা ঠিক নয়···।"

"কোন্ খবরটা···?" নেপোলিয়নের নিঃশ্বাস আটকে এল···।

"আমি···আমি সন্তান-সম্ভবা নই···" কথাটা বলে যেন জোসে-ফাইন বেঁচে গেলেন। আশাভঙ্গের এত বড় ধাক্কা নেপোলিয়নের জীবনে এই প্রথম। সন্তান তা হলে আসছে না···!

কিছুক্ষণের জন্য নেপোলিয়ন একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। তার পরেই সব তুঃখ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জোসেফাইনকে তু'হাতে জাপটে ধরে বললেন, "তুঃখ করে লাভ নেই। আমাদের সন্তান হবেই···।"

এতদিন অদর্শনের পর নেপোলিয়ন স্ত্রীকে ক'দিন সঙ্গ দিতে পেরেছিলেন! বড় জোর তু'দিন, তু' রাত! এরপরেই তো

নেপোলিয়নকে চলে যেতে হল মাণ্টুয়া অভিযানে। এবং সেই অভিযান সার্থক হল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে চিঠি লিখলেন, "জোসেফাইন, যত দিন যাচ্ছে, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা যেন কোন থই পাচ্ছে না, তোমাকে আমি এত ভালো কখনও বাসিনি— ।"

কয়েকদিন পরে আবার একখানা চিঠি এল, "জোসেফাইন, আমার এই মুহূর্তে কি ইচ্ছে করছে জান! ইচ্ছে করছে তোমার শরীর থেকে সব আচ্ছাদন খুলে ফেলি, তারপর তোমাকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে একেবারে বন্দী করে ফেলি--কেন আমি তা পারছি না জোসেফাইন— ! প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের কত ইচ্ছাই না জাগে··· ।"

আশ্চর্য, নেপোলিয়ন জোসেফাইন সম্পর্কে এত মোহ-মুগ্ধ ছিলেন যে তাঁর চোখে জোসেফাইনের হাবভাব, হিপ্পোলাইটের প্রতি তাঁর অনুরাগ-ভালোবাসা কিছুই ধরা পড়ল না। ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে তিনি জোসেফাইনের আসল চেহারাটা বুঝতে ভুল করেছিলেন।

জোসেফাইন ইটালী থেকে প্যারিসে মাদাম থেরেসা ট্যালিয়নকে চিঠি লিখলেন, "আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসে না, আমাকে পুজো করে। ও ঠিক একদিন পাগল হয়ে যাবে— ।"

জোসেফাইন প্যারিসের বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখলেন, "আর এখানে থাকতে পারছি না—বড় একঘেয়ে লাগছে···কবে যে ওখানে ফিরে যেতে পারব··· ।"

জোসেফাইনের আরও খারাপ লেগেছিল নেপোলিয়নের মা-ভাই-বোনদের। তারাও ইতিমধ্যে ইটালীতে মিলিত হয়েছিল। ল্যাটিজিয়া প্রথম থেকেই জোসেফাইনকে অপছন্দ করেছিলেন। নেপোলিয়নের বোনেরা, বিশেষ করে পলিন তো জোসেফাইনকে দেখলেই নাক কুঁচ-কতো, "দাদা আর বউ পেল না। শেষ পর্যন্ত ঐ বাজেমার্কা মেয়েটা দাদার মন মজাল··· ।"

যুদ্ধের শেষে নেপোলিয়ন বাড়ি এলেন। মা, ভাই, বোন ও

জোসেফাইনের সঙ্গে মিলিত হলেন। দুঃখ পেলেন, কেন তাঁর পরিবার জোসেফাইনকে মনের সঙ্গে গ্রহণ করল না। নেপোলিয়নের মনে এই কারণে বেদনা, জোসেফাইনের মনে এই কারণে জ্বালা, প্রচণ্ড রাগ। তার ওপর দুজনকার মানসিক গঠনভঙ্গিমাতেও ছিল আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জোসেফাইন যে-কোন মেয়ের মতো রক্ত-মাংসে-গড়া ভালোবাসা চাইতেন এবং অবিরতই এই ভালোবাসা কামনা করতেন। নেপোলিয়নের উচ্ছ্বাস-ফেনিল ভালোবাসা আবার তার সঙ্গে তাঁর কর্মময় জীবনের সহ-অবস্থান জোসেফাইন বোধহয় নিজের মনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি। তাই নেপোলিয়ন যখন জোসে-ফাইনের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিতেন, জোসেফাইনের ব্যবহার হত শীতল ও নির্লিপ্ত। নেপোলিয়ন-জোসেফাইনের বিবাহিতজীবন সর্বাঙ্গ-মধুর ছিল, বলা চলে না···।

ইটালী অভিযানে সাফল্যের পর নেপোলিয়ন ইটালীর জীবনে একটা নবজাগরণ এনে দিলেন। নেপোলিয়নের সাহায্যে অস্ট্রিয়ার হাত থেকে ইটালী স্বাধীন হল। নেপোলিয়নের নির্দেশে ইটালীকে ঢেলে সাজানো হল। ইটালীর বুকে আর রাজকীয় দম্ভের পদাঘাত নয়। এখন থেকে ইটালী—রেপাবলিক ইটালী। ইটালীর মানুষ এবার মনুষ্যত্বের অধিকার নিয়ে চলবে। শাসনবিধি, শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্ম-নীতি সব কিছুতেই এক বিরাট পরিবর্তন এল। ব্যাস্টিল দুর্গের পতন স্মরণ করে ইটালীতে এক ব্যাস্টিল দিবস পালন করা হল। ইতালীয় জনতা 'রেপাবলিক' শাসনতন্ত্রের জয়ধ্বনি করে উঠল। নেপোলিয়ন নির্দেশ দিলেন, এবার থেকে ইটালীর জনতাকে আর সামন্ত কর দিতে হবে না। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে, পরলোকের ভয় দেখিয়ে তাদের ওপর আর কোন লাঞ্ছনা, অত্যাচার চলবে না। এমন কি তাদের ভেতর থেকে রেপাবলিক সংবাদপত্র পর্যন্ত বেরোবে, যার মধ্যে তাদের স্বাধীন মনোভাব ব্যক্ত হতে পারবে, এবং এজন্য ওদের কোন শাস্তি হবে না। যাজকমণ্ডলীকে নির্দেশ দেওয়া হল, যাবতীয় কুসংস্কার, ধর্মের নামে

যাবতীয় দুর্নীতি তাঁদের এবার থেকে বর্জন করে চলতে হবে। যদি তাঁরা সত্যিই যাজকের জীবন যাপন করতে চান, তা হলে তাঁদের ন্যায়পথে পবিত্র, শুদ্ধ ও সত্য জীবন যাপন করতে হবে।

নেপোলিয়ন বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন ইহুদীরা যাজকদের দৃষ্টিতে কতখানি ঘৃণ্য এবং অবজ্ঞেয়। সমাজে নিজেদের আলাদা, অপাংক্তেয়ভাবে চিহ্নিত করবার জন্য তারা মাথায় ডেভিডের তারকা-চিহ্নখচিত হলদে টুপি পরে থাকে। শহরের বিশেষ অংশে বিশেষ বাড়িতে থাকে, আর রাত্রিবেলা সেই বাড়ির দরজায় তালাচাবি আটকে দেওয়া হয়। আলবানিয়া ও গ্রীস থেকে আগত মুসলমান অধিবাসীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষে মানুষে এ কী বিভেদ? এ কী বৈষম্য! ফরাসী বিপ্লব-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ নেপোলিয়ন কঠোর হাতে এই ধরনের বিভেদ তুলে দিলেন।

নেপোলিয়নের বিশেষ দৃষ্টি ছিল দেশের বুদ্ধিজীবীদের ওপর। তিনি জানতেন যুদ্ধ, সংগ্রাম, বিপ্লবের শেষ আছে, শেষ নেই শুধু শিক্ষা-সাধনার। তাই তাঁর কাছে বিশেষভাবে আদৃত ছিলেন দেশের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী আর স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-বৃন্দ। নেপোলিয়ন তাই দেশ জয় করেছেন, শত্রু ধ্বংস করেছেন, কিন্তু সযত্নে বাদ দিয়েছেন শিক্ষালয়, রক্ষা করেছেন পণ্ডিতদের, তাঁদের নিরলস সাধনা, আর তাঁদের সৃষ্ট রচনা। ভার্জিলের জন্মস্থান পিয়েতোলকে তিনি ইটালীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করলেন। নেপোলিয়ন ঘোষণা করলেন যত বুদ্ধিজীবী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁরা এখন থেকে ফরাসীদের ভাই। তাঁদের যে দেশেই জন্ম হোক না কেন, তাঁরা ফরাসীদের পরম আত্মীয়।

নেপোলিয়নের এই নির্দেশে, তাঁর কর্মক্ষমতার মহিমায় ইটালী উত্তাল হয়ে উঠল। এতদিন মুখ বুজে অসহায় হয়ে বসে থাকা ইটালীর জনতা শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে নোপোলিয়নকে কেউ সম্বোধন করল "সিপিও," কেউ বা নাম দিল 'হ্যানিবল', আবার কিছু লোক বলল 'জুপিটার' আর 'প্রেমেথেউস'। ইটালীর জনতা নেপোলিয়নের নামে

জয়ধ্বনি দিল, "বেঁচে থাকুন সর্বপরিত্রাতা নেপোলিয়ন। আমাদের মতো গরীবদের তিনি মা-বাপ···।"

রসসন্ধানী নেপোলিয়নের দৃষ্টি পড়ল ইটালীর বিখ্যাত সব চিত্র-পুঞ্জের ওপর। ফ্রান্সের আর্ট গ্যালারী সাজাতে হবে। নেপো-লিয়ন সযত্নে যোগাড় করলেন বিখ্যাত মনীষীদের লেখা গ্রন্থগুলি। ফ্রান্সের লাইব্রেরী সমৃদ্ধ করতে হবে। তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল আশ্চর্য ভাস্কর-শিল্পের নমুনাগুলির ওপর। ভাস্করের ছেনির স্পর্শে পাথরের মুখেও কথা ফোটে। মনের সর্বানুভূতি দিয়ে পাথরের মূর্তি তাকিয়ে থাকে···। নেপোলিয়ন লোভ সামলাতে পারলেন না। ইটালী-রোমের এই সম্পদগুলি একে একে চলে গেল ফ্রান্সে। বিপ্লবোত্তর শ্রীহীন ফ্রান্সকে এখন শোভন হতে হবে। তাই এ ছাড়া কোন উপায় নেই।

ইটালীর যে অংশ নেপোলিয়ন জয় করেছিলেন তার নতুন নাম-করণ হল সিজআলপাইন, এখন সেটি একটি স্বাধীন অঞ্চল। ফরাসী দেশের অনুকরণে সেখানে স্বাধীনদেশের সত্তা নিয়ে সিজ-আলপাইন রাষ্ট্র গড়ে উঠল। কিছুদিন পরে পোপের অধীন রাজ্যগুলিও স্বেচ্ছায়-আলপাইনের সঙ্গে যোগ দিল। মানুষের অধিকারের সীমা অনেক বেড়ে গেল। সবকিছু দেখেশুনে জেনোয়ার অধিবাসীরা চঞ্চল হয়ে উঠল। তারাও রেপাব্‌লিক গভর্ণমেণ্ট চাইল, এবং নেপোলিয়নের সহযোগিতায় তা পেল। জেনোয়ার নতুন নামকরণ হল লাইগারিয়ান রেপাবলিক। উৎসাহ অনেক, উদ্দীপনারও সীমা নেই, কিন্তু এত সব কিছুর কোথাও যেন বাড়াবাড়ি না হয়, নেপোলিয়ন সেদিকেও দৃষ্টি রাখলেন···।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এবার একটা পরিষ্কার বোঝাপড়ায় আসবার জন্য নেপোলিয়ন তৈরী হলেন। সন্ধি করতে হবে। কিন্তু কি সর্তে। মিলান না ভেনিস, কোনটা হাতে থাকবে? এদের মধ্যে অস্ট্রিয়াকে যে-কোন একটিকে তো ছাড়তেই হবে?

নেপোলিয়ন দাবী করলেন ভেনিস। ভেনিস ফ্রান্সের হাতে তুলে দিতে হবে, মিলান থাক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে। এ না হলে অশান্তি হবে। হোলও তাই। একটা ছোটখাট মারামারি হল। প্রায় চারশ' মতো অপ্রস্তুত ফরাসী হতাহত হল। হাসপাতালে যে সব ফরাসী রোগী ছিল, তাদের পর্যন্ত হত্যা করা হল। একটা ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ অবরোধ করে তার ক্যাপটেনকে মেরে ফেলা হল।

নেপোলিয়ন রাগে দুঃখে অস্থির হলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার প্রতিশোধ নিলেন। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ভেনিস জয় করে নিলেন। এরপর নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠালেন।

অস্ট্রিয়ার দিক থেকে আর কোন আপত্তি বা গোলমাল হল না। হবে কি করে? অস্ট্রিয়া তো নেপোলিয়নের দাপট দেখে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সুতরাং সন্ধি হল। ক্যামপো-ফরমিয়োর সন্ধিতে আইয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ ফ্রান্সের অধীনে এল। ফ্রান্সের সামনে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে চলাফেরা করার দরজা খুলে গেল। বছরটা ছিল ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দ।

এবার ইটালী থেকে বিদায় নেবার পালা। যাবার সময় এক সভায় নেপোলিয়নকে সম্বর্ধনা জানানো হল। উত্তরে নেপোলিয়ন আবেগ-মথিত কণ্ঠে বললেন, "দু'হাজার বছর ধরে ধর্মের নামে, শাসনের নামে জনসাধারণের ওপর যে অত্যাচার চলেছিল, এখন তার অবসান হয়েছে। এখন নতুন গণতন্ত্রী শাসনবিধি, এখন জনতার অধিকার।"

ইউরোপের দুটি দেশ। একটি জ্ঞান-তপস্যার দেশ, আরেকটি স্বাধীনতার পূজারী বিপ্লবী মানুষের দেশ। একটি ইটালী, অন্যটি ফ্রান্স। এ দুটি দেশ এখন অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ—।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে এলেন। এবার তাঁকে বলা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য প্রস্তুত হোন। ইংল্যাণ্ডের বড় প্রতাপ, বড় দম্ভ। সমুদ্রকে সে একেবারে চষে বেড়াচ্ছে, এমনই তার নৌশক্তি, এমনই তার নৌবল! সব চাইতে বড় কথা, ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের দিকে বড় বেশী চোখ লাল

করে তাকাচ্ছে। সব সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কলকাঠি নাড়ছে। এ সহ্য করা যায় না। অতএব নেপোলিয়ন এখন ইংল্যাণ্ড অভিযানের প্রধান সেনাপতি। নেপোলিয়ন তৈরী হোন কোন্ পথে কেমন করে ইংল্যাণ্ডকে বেশ ঘা কতক দেওয়া যায়···।

নেপোলিয়ন আদেশ মাথা পেতে নিলেন। কিছুদিন ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংলিশ চ্যানেলে ইংরেজ নৌবহরের নড়াচড়াও লক্ষ্য করলেন। কিন্তু এর পরেই তিনি ঘোষণা করলেন এই মুহূর্তেই ইংল্যাণ্ড অভিযান নয়। আগে মিশর, তারপর ইংল্যাণ্ডের কথা ভাবা যাবে। মিশরকে যদি একবার বাগে পাওয়া যায়, তা হলে ইংল্যাণ্ডও অনেকটা কাহিল হয়ে পড়বে। উপরন্তু আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ যখন হাতের মুঠোয়, তখন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে মিশরে যাওয়া তো অত্যন্ত সোজা···!

ডিরেক্টরী সভা নেপোলিয়নের এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বুঝে সায় দিল—।

নেপোলিয়ন মিশর অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন মিশর ছিল তুর্কী সুলতানের অধীনে। তবে সে শুধু নামে, বাস্তব ক্ষেত্রে মিশর ছিল মামেলুকদের অধীনে একটা দুর্বল দেশ। সুতরাং, সেদিক থেকে নেপোলিয়ন ভাবলেন, খুব বেশী একটা অসুবিধে হবে না। পরিকল্পনার দিক থেকে নেপোলিয়ন আরও একটু এগিয়ে গেলেন। তিনি ভেবেই নিলেন মিশর জয় করতে পারলে ইংরেজদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিবেশ ভারতবর্ষও আক্রমণ করা যাবে। আক্রমণ করার দুটি পথও আছে। একটি তুর্কী ও পারস্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে স্থলপথে। আরেকটি পথ। নেপোলিয়ন দ্বিতীয় পথটির বেলায় কল্পনাকে একটু বেশী প্রশ্রয় দিয়ে ফেললেন। আরেকটি পথ হল সুয়েজ যোজকের ভেতর দিয়ে। অর্থাৎ সুয়েজ যোজকে যে মজে-যাওয়া পুরনো খাল আছে, সেটাকে আবার খুঁড়ে একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে জাহাজ চালিয়ে একেবারে লোহিত সাগরে পড়া, আর সেখান

থেকে আবার জাহাজ ভাসিয়ে চলে যাওয়া ভারত মহাসাগরে। তারপরেই তো ভারতজয়ের পথ খুলে যাবে··· !

এখানে একটা জিনিস ভাবতে বড় অবাক লাগে যে, নেপোলিয়ন ইংলিশ চ্যানেল আর ইউরোপের সমুদ্রে ইংরেজদের প্রতাপ সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন, তিনি হঠাৎ তাঁর কল্পনার লাগামকে অতখানি ছেড়ে দিলেন কেন? একটা মহাদেশ থেকে আর একটা মহাদেশে যেতে যে সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে, যে সমুদ্র আল্প্‌স্‌ পর্বতের চাইতেও ভয়ঙ্কর ও বিক্ষুব্ধ, এইটা কেন নেপোলিয়নের মতো অভিজ্ঞ লোক বুঝলেন না! আর কেন বুঝলেন না, ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষের তিন দিকের তিনটি সমুদ্রই শাসন করছে ইংরেজ, যাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে-বসবাসকারী ফরাসী ঔপনিবেশিকরা কিছুতেই পেরে উঠছেন না। ফরাসীরা যে-সব ভারতীয় রাজন্যবর্গকে সাহায্য করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে মহিসুরের টিপু সুলতান ছিলেন সর্বাগ্রে, তাঁরা কেউ পারছেন না ইংরেজদের সঙ্গে, ইংরেজরা লড়াই করে করে তাঁদের ফৌত করে দিচ্ছে— ।

যাই হোক, নেপোলিয়ন মিশর-অভিযানের জন্য তৈরী হলেন। সৈন্য সাজালেন। সেনাবাহিনীতে পদাতিক, গোলন্দাজ, অশ্বারোহী—সবই ছিল, আর ছিলেন বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত, দার্শনিক আর শিল্পী। নেপোলিয়নের মনোগত ইচ্ছা ছিল মিশর দেশটি জয় করে সে দেশের অধিবাসীদের এই সব পণ্ডিতদের সাহায্যে জ্ঞানের আলোকে দীক্ষিত করবেন। ওদেশ থেকে নতুন কিছু তথ্যাদি পাওয়া যায় তাও সযত্নে সংগ্রহ করে আনবেন। এই অভিযান শুধু সামরিক অভিযান হবে না, হবে জ্ঞানেরও অভিযান। দেওয়া আর নেওয়া—সভ্যতার ইতিহাস তো এরই ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে! সেই কোন অতীতে খ্রীস্টের জন্মের আগে মাসিডন-অধিপতি আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণে এসেছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনীর সঙ্গেও সেদিন ছিল বহু পণ্ডিত, বহু বহু মনীষী। এত শতাব্দী পরে সেই একই মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে নেপোলিয়ন বেরোচ্ছেন। নেপোলিয়ন মনে মনে বেশ কিছুটা গর্ব বোধ করলেন।

নৌবহর, সেনাবাহিনী, সবকিছু সাজানো হল, গোছগাছ হল। নেপোলিয়ন এক ফাঁকে তুলোঁ বন্দরে এলেন। সঙ্গে জোসেফাইন। নেপোলিয়নের জীবনে আনন্দময়ী। তবু নেপোলিয়ন সময়টাকে ঠিকভাবে উপভোগ করতে পারছিলেন না, কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ ছিল। কারণটা মানসিক তুঃখ, জোসেফাইন এখনও কেন মা হচ্ছেন না। সমস্ত অন্তর দিয়ে নেপোলিয়ন কামনা করছিলেন একটি সন্তান, একটি নধর স্বাস্থ্যবান ছেলে। জোসেফাইনের সন্তান ধারণে কেন এত দেরী…! আবার অন্যদিকে জোসেফাইন হিপ্পোলাইটের নাম জড়িয়ে কিছু অকথা-কুকথাও কানে এসে নেপো-লিয়নের মনকে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল। নেপোলিয়ন জোসেফাইনের তুটি হাত টেনে নিয়ে বললেন, "তুমি ঐ লোকটার সঙ্গে একদম কথা বলবে না তো। ওর সঙ্গে একেবারে মেলামেশা করবে না…!" জোসে-ফাইন সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করে বললেন, "না, না, ওর সঙ্গে আবার মেলামেশা কি! আর কথা তো বলবোই না…।" নেপোলিয়ন মহা-খুশি। স্ত্রীকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাছে টেনে নিলেন। আর কদিনই বা এমন করে কাছাকাছি থাকা। মিশর তো হাতছানি দিচ্ছে…।

মিশর অভিযান সর্বতোভাবে প্রস্তুত হল। সব শুদ্ধ এক শ' আশি-খানা জাহাজ। এক হাজার কামান, প্রচুর গোলাগুলি, সাত শ' ঘোড়া, সতেরো হাজার সৈন্য। ইটালীর উপকূলেও আরেকটি নৌবহর প্রস্তুত হয়ে আছে, তাতে জাহাজের সংখ্যা চার শ', সৈন্য সংখ্যা পঞ্চান্ন হাজার। তুই নৌবহর মিলিয়ে অজস্র গোলাগুলি, রসদপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস। এই বিরাট, বিশাল অভিযানের নায়ক সর্বাধ্যক্ষ সেনাপতি নেপোলিয়নের বয়স তখনও ত্রিশ পেরোয়নি।

১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে মে। মিশর-যাত্রা শুরু হল। জাহাজের সারি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। নেপোলিয়ন যে জাহাজটিতে ছিলেন, তার নাম ছিল লা ওরিয়েণ্ট। নেপোলিয়নের সঙ্গে ছিল একটা ছোট-খাটো লাইব্রেরী। বেশীর ভাগ বই ইতিহাসের! জুন মাসের মাঝামাঝি

নেপোলিয়ন যাত্রাপথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাল্টা দ্বীপ জয় করে নিলেন। যুদ্ধ করে নয়, টাকা দিয়ে। মাল্টা দ্বীপরক্ষাকারী নাইটরা বেশ সহজেই টাকার বশ হল এবং মাল্টায় নেপোলিয়নের অধিকার মেনে নিল। সেখানে কদিন থেকে নেপোলিয়ন মাল্টা দ্বীপটিকে ঢেলে সাজালেন, তাকে নতুন সজ্জায় শোভিত করলেন। পুরনো রীতিনীতি, আদব-কায়দা সব তুলে দিলেন। সেখানে দু হাজারের মতো তুর্কী ও মুর সৈন্য বন্দী ছিল, তাদেরও তিনি মুক্তি দিলেন। অনেকগুলি স্কুল খুললেন আর বললেন ধর্ম নিয়ে ছেলেবেলা থেকেই পড়বার বা আলোচনা করবার কিছু দরকার নেই। ত্রিশ বছর বয়স হলে, ধর্মে মতি হলে তখনই তাতে মন দিতে হবে। প্রথম থেকেই ধর্মকে পাষাণের মতো ছোট্ট কচিমনে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। সব চাইতে ভালো কাজ হল, নেপোলিয়ন মাল্টা থেকে ঘৃণ্য দাসপ্রথা তুলে দিলেন। এতদিন পর্যন্ত এই নিপীড়িত দাসদের আমরণ শ্রমের ওপর দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছিল সামন্তপ্রথা। এই সামন্তপ্রথাও তুলে দেওয়া হল। একই সঙ্গে উঠে গেল সামন্ত করদানের প্রথা।

আবার যাত্রা শুরু হল। নেপোলিয়ন তাঁর জাহাজ থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন সমুদ্রের ওপর। কোন ইংরেজ নৌবহর চোখে পড়ে কিনা। তাঁর যাত্রা পথে কাঁটা বিছোয় কিনা। মজা হল বাইশে জুন রাত্রিবেলা। আকাশ মেঘে ঢাকা। চারদিকে কুয়াশা। ফরাসী নৌ-বহরের প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল খানকয়েক জাহাজ। কোন পক্ষের নৌ-অধ্যক্ষই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল না, কেউ কাউকে বুঝতে পারল না। নেপোলিয়ন জানতেও পারলেন না যাদের তিনি এত খোঁজখবর করেছেন, সমুদ্রের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন, তারা প্রায় কাছাকাছি এসে চলে গেল, আর ইংরেজ নৌ-অধ্যক্ষও বুঝতে পারলেন না, কত কাছে ছিলেন ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ন। ইংরেজ ফরাসী পরস্পর পরস্পরকে যদি একবার চিনতে পারত তা হলে ঐ যাত্রা-পথেই নেপোলিয়নের ইতিহাসে একটু মোড় ঘুরে যেত বৈকি। নেপোলিয়ন ক্রমে মিশরের দিকে এগিয়ে গেলেন। উত্তর মিশরে তখন

আলেকজান্দ্রিয়া ছাড়া জাহাজ লাগাবার আর কোন উপযুক্ত বন্দর ছিল না। আবার আলেকজান্দ্রিয়ায় জাহাজ লাগাতে গেলে আগে তো জায়গাটা যুদ্ধ করে দখল করতে হবে, তবে তো অন্য কথা…। নেপোলিয়ন ঠিক ঐ মুহূর্তেই যুদ্ধের মধ্যে যেতে চাইলেন না। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মাইল আষ্টেক দূরে মারাবত নামে সাদা বালিভর্তি তীরভূমিতে নেপোলিয়ন তাঁর সেনাবাহিনীকে নেমে যাবার আদেশ দিলেন। জাহাজ দূরে নোঙর করে রইল। নীল রং-এর ইউনিফর্ম পরা ফরাসী সৈন্যরা জাহাজ থেকে নেমে বাকি জলটুকু ভেঙে তীরে গিয়ে উঠল। কয়েকঘণ্টা পরে নেপোলিয়ন নিজে নেমে এলেন। মারাবত জায়গাটা ভালো করে দেখলেন। কেবল ডুমুর গাছ আর চারদিকে শুধু সাদা বালি আর বালি। জায়গাটা যে মরুভূমির কাছে তা বোঝা গেল…।

ওদিকে আলেকজান্দ্রিয়ার সৈনিকরা ফরাসী সৈন্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল। তারা আলেকজান্দ্রিয়ার সবকটি প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিল, ভুলে একটা গেট খোলা পড়ে রইল। নেপোলিয়ন এই পথেই তাঁর সেনাবাহিনী ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। সংঘর্ষ হল বটে, তবে ঐ পথেই আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে নিতে তাঁর খুব একটা কষ্ট হয়নি।

অলেকজান্দ্রিয়া জয় করে নেপোলিয়ন এগিয়ে যেতে লাগলেন বটে, তবে পদে পদে অসুবিধা হতে থাকল, বাধা পড়তে লাগল। অত্যন্ত গরম, চারদিকের বালি আগুনের মতো তপ্ত। ফলে প্রতি মুহূর্তে আকণ্ঠ পিপাসায় সেনাবাহিনী অস্থির হয়ে উঠল। এর ওপর আবার ছিল কাঁকড়াবিছে ও কালো মাছির দংশন। সৈন্যদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ল। পেটের পীড়ায় তারা অস্থির হল। তবু অভিযান এগিয়ে চলল। অবশেষে চোখে পড়ল গিজা শহর। তাঁর উঁচু উঁচু পিরামিড, আর তার বিশাল ছায়ায় ছায়ায় মিশে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুর্কী-মিশরী মামেলুক সেনাবাহিনী।

নেপোলিয়নও তৈরী হলেন। সেনাবাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করে দু-দলকে রাখলেন কামান-সাজানো একটি উপযুক্ত জায়গায়।

নির্দেশ পাওয়া মাত্র তারা কামানের মুখে আগুন ছোটাবে। অন্য দলটিকে রেখে দিলেন রিজার্ভে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে নেপোলিয়ন সৈন্যদের বললেন, "চার হাজার বছরের ইতিহাস ঐ পিরামিড-গুলির গায়ে লেখা আছে। তারা নীরবে তোমাদের অভিযান-প্রস্তুতিকে দেখছে···।"

যুদ্ধ আরম্ভ হল। মামেলুক, মিশরী বা তুর্কীরা লোক হিসেবে দুর্ধর্ষ। যখন-তখন সংঘর্ষে তারা অভ্যস্ত। কিন্তু আধুমিক যুদ্ধরীতি, কামান-বন্দুকের আধুনিক ব্যবহারে তারা অনেক পিছিয়ে ছিল। সুতরাং হুঙ্কার ছেড়ে তারা ফরাসী সেনাবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু এদিকের চমৎকার কার্যকরীভাবে সাজিয়ে রাখা কামান-গুলো থেকে এমন আগুনে-গোলা ছুটতে লাগল যে এগিয়ে-আসা মিশরী সৈন্যরা মার তো খেলই, উপরন্তু তাদের মধ্যে প্রচুর মারা পড়ল, আহত হল, বাদবাকিরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পেছন ফিরে ছুট লাগাল। পালাতে গিয়ে বেশ কিছু ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলনদের গভীর জলে। ফল যা হবার হল।

এই পিরামিডের যুদ্ধ চলেছিল মাত্র দু' ঘণ্টা। তাতেই নেপোলিয়ন শত্রুপক্ষকে কাত করে দিলেন। ফরাসী সেনা নিহত হল দুশ'র মতো। কিন্তু তার বদলে নেপোলিয়ন বন্দী করলেন প্রায় চব্বিশ হাজার শত্রু সৈন্য, আর জয় করে নিলেন মিশরের অনেকখানি। যে সব মামেলুকরা ঘোড়ার পিঠে পালিয়ে যাচ্ছিল, নেপোলিয়ন তাদের পেছন ধাওয়া করে সিনাই মরুভূমিতে তাদের ধরে ফেললেন। সালে-হার যুদ্ধে তাদের শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিলেন। তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেল প্রচুর সোনা আর দুর্মূল্য রত্ন। নেপোলিয়ন এ সব কিছু ভাগ করে দিলেন তাঁর সৈন্যদের মধ্যে।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন কায়রো শহর, তার অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা বেশ ভালো করে দেখেছিলেন। লক্ষ্য করলেন শহরটিতে কী অপূর্ব সব মসজিদ, কী বিরাট বিরাট প্রাসাদ, মামেলুকদের কী ঐশ্বর্য-ময়, বিলাসবহুল জীবন! আর সাধারণ লোকেরা! তাদের জীবন!

তারা জীবন কাটায় জীর্ণ বস্তিবাড়িতে কোন রকমে মাথা গুঁজে। খায় কুমড়ো আর মাছি-ভ্যান-ভ্যান-করা শুখনো খেজুর, ভাগ্য ভালো হলে কখনো-সখনো উটের দুধে তৈরী পনীরের টুকরো আর অতি নিকৃষ্ট রুটি।

নেপোলিয়নের গঠনমুখী মন। তিনি এই অবস্থার সমাপ্তি টেনে উন্নতি চাইলেন। মামেলুকদের প্রাসাদে তিনি তাঁর অস্থায়ী অফিস পেতেছিলেন। সেখান থেকে ঘোষণা করলেন—অতঃপর এখানে আর তুর্কী শাসন নয়। মামেলুকদের খবরদারী নয়। এবার থেকে এদেশের ন'জন শেখকে নিয়ে একটা শাসনসমিতি গঠিত হবে। সেই সমিতির উপদেষ্টা হবেন একজন ফরাসী। এখন থেকে এখানে নতুন শিক্ষা, নতুন শাসন-প্রণালী প্রচলিত হবে। এখন থেকে সর্বশ্রেণীর মানুষের অধিকার স্বীকৃত হবে।

আর ঠিক এই সময়েই নেপোলিয়ন চিঠি মারফত একটা খবর পেয়ে মাথায় হাত দিলেন। একী দুঃসংবাদ! লা ওরিয়েণ্ট ও ফরাসী-দের অন্য যে ষোলখানা জাহাজ আবুকির উপসাগরে বেশ নিরাপদ জায়গায় নোঙর করে রাখা হয়েছিল, হোরাসিও নেলসন নামে কে এক দুঃসাহসী ইংরেজ নৌ-সেনাপতি মাত্র পাঁচখানা জাহাজ নিয়ে দুদিক থেকে কামান দেগে ফরাসীদের সতেরোখানা জাহাজের মধ্যে তেরোখানাই শেষ করে দিয়েছে! লা ওরিয়েণ্ট একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে! এবার! এর পরের কথা ভেবে নেপোলিয়ন চোখে অন্ধকার দেখলেন। তিনি তাঁর পঞ্চান্ন হাজারের সেনাবাহিনী লোকলস্কর নিয়ে এবার অকূল পাথারে পড়লেন। যে সব জাহাজে খাদ্য আসবে, সৈন্য আসবে, যার সাহায্যে সরবরাহ-যোগাযোগ ঠিক থাকবে, সেই জাহাজগুলি নষ্ট করে দিল, কে এই ইংরেজ সেনাপতি হোরাসিও নেলসন···!

নেপোলিয়নের জীবনেতিহাসে এই নেলসন হলেন প্রথম নিয়তি, যিনি জলের যুদ্ধে নেপোলিয়নকে সব সময় হটিয়ে দিয়েছেন। নইলে নেপোলিয়নকে ঠেকাতেন কে···?

নেপোলিয়ন অবশ্য তখনি আবুকির বে-এর ঘটনাটি কাউকে জানালেন না। যে চিঠিখানা নিয়ে এসেছিল, তাকেও বারণ করে দিলেন চিঠির কথা যেন এখনি প্রকাশ না হয়।

নেপোলিয়ন অন্যান্য সেনাপতিদের নিয়ে একসঙ্গে ব্রেকফাস্টে বসলেন। অন্য সেনাপতিরা তখন আনন্দে উচ্ছল, উজ্জ্বল। একটু পরে নেপোলিয়ন তাঁদের সব কিছু খুলে বললেন…"শুনে রাখো, তোমাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কোন জাহাজ নেই…এক ইংরেজ ছোকরা সব নষ্ট করে দিয়েছে—।" একটু থেমে বললেন, "যাই হোক, আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না। আমাদের আরও বেশি করে গোলাগুলি তৈরী করতে হবে…।"

নেপোলিয়নের মুখ শান্ত, সমাহিত। সেনাপতিদের মনে কোন হতাশা ঠাঁই পেলো না। সবাই ধৈর্য ধরে সব কিছু শুনলেন। নেপো-খুশি হলেন।

যেটুকু জায়গা নেপোলিয়ন অধিকার করেছিলেন, সেখানে তিনি এক কর্মযজ্ঞ শুরু করে দিলেন। শাসন সমিতি তো তৈরী করলেনই। উপরন্তু কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করলেন। একটা টাঁকশাল বসিয়ে সেখানে মামেলুকদের সোনা গলিয়ে ফরাসী মুদ্রা তৈরী হতে লাগল। একটা উইণ্ডমিল বসানো হল, জল তোলা আর শস্য চূর্ণ করা এই দুই কাজই হবে। মিশর, কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার মানচিত্র তৈরী হতে লাগল। প্রধান প্রধান রাস্তায় ত্রিশ ফুট অন্তর আলো বসানো হল। তিনশ' শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হল। একই সময় স্থাপিত হল চারটে কোয়ারা-ণ্টাইন কেন্দ্র যাতে মিশরে ভীতিজনক ও ছোঁয়াচে রোগ বিউবনিক প্লেগ চারদিকে না ছড়িয়ে পড়ে।

মিশরে যাবার সময় জাহাজেই নেপোলিয়ন কোরান পড়েছিলেন। জগৎবাসী সকলে ভাই ভাই। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সকলের অধিকার। সেখানে কোন ভেদাভেদ নেই—কোরানের এই মূল সুরটুকু নেপোলিয়নের ভালো লেগেছিল এবং

এই ভালো লাগাটা তিনি মিশরীয় মুসলমান মুফ্‌তীদের কাছে খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন। বলেছিলেন, "আমরাও সেই একই আল্লাহ্‌র সন্তান···আমরা সবাই এক"···মুসলমান মুফ্‌তীদের সঙ্গে নেপোলিয়ন বেশ একটা সৌজন্যমূলক রফাতে এলেন। একেবারে যে কিছু গণ্ডগোল হল না তা নয়। একবার হঠাৎ কিছু ধর্মোন্মাদ মিশরী কায়রোতে বেশ কয়েকজন ফরাসী সৈন্যকে মেরে ফেলল। আব-হাওয়াটা একটু কেমন যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তবে ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াল না। সহজেই তাকে শক্ত হাতে থামিয়ে দেওয়া হল সেনাপতি ট্যালিয়েন চেয়েছিলেন সবকটা মসজিদ পুড়িয়ে দিতে, আর সবকজন মুফ্‌তী মৌলবীদের মেরে ফেলতে। নেপোলিয়ন এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করলেন না। নেহাতই যারা নাটের গুরু, শুধু তাদেরই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। এরপর স্বাভাবিক ভাবেই এই ধরনের ধর্মীয় পাগলামি একেবারে থেমে গেল।

মিশরের জাতীয় জীবনের সঙ্গে নেপোলিয়ন নিজেকে একাত্মভাবে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন বলেই ওখানকার সর্ব-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বন্ধুর মতন মিশতেন। উটের পিঠে চেপে মরু-ভূমিতে বেড়িয়ে বেড়াতেন। এমন কি নিজেকে একবার মিশরীয় পোশাকে সাজিয়ে মুগ্ধ হয়ে সবাইকে দেখিয়েছিলেন। সেই পাগড়ি, পা পর্যন্ত লম্বা জোব্বা, হাতে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকানো ছুরি। কিন্তু ট্যালিয়েন এ বেশ পরিধানে আপত্তি জানালেন। তিনি নেপো-লিয়নকে মনে করিয়ে দিলেন যে, কোন রেপাবলিক রাজ্যের অধি-বাসীর কখনও ঐ ধরনের প্রাচ্যের পোশাক পরা ঠিক হবে না। নেপোলিয়ন ট্যালিয়েনের কথায় যৌক্তিকতা বুঝতে পেরে আর কখনও ঐ পোশাকে হাত বাড়াননি।

মিশরের লোকেরা নেপেলিয়নকে আদর করে ডাকত 'সুলতান এল কবির' এই নামে। অর্থাৎ নেপোলিয়নই মিশরের সর্বময় শাসক, উর্ধ্বতম কর্তা। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে মিশরীয়দের এই সম্ভ্রমবোধ জেগে-ছিল অনেকগুলি কারণে। প্রথমতঃ তারা অবাক হয়ে দেখত একজন

বিদেশী লোক কোন বিলাসব্যসনের মধ্যে না গিয়ে গায়ে ইউনিফর্ম এঁটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেমন ঐ মরুভূমির বুকে কাজ করে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ সেই লোকটি কোন চাবুক বা কোঁড়া না মেরে সবাইকে কেমন এক শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে বেঁধে ফেলেছে এবং এই নিয়মে তারা কেমন নবীন উৎসাহে কাজের পর কাজ করে যাচ্ছে! সকলের ওপর তারা বিস্ময়ে অভিভূত হত যখন দেখত বিরাট কর্মযজ্ঞের কোন খুঁটিনাটিই নেপোলিয়নের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারছে না। এমন কি পরের বাগান থেকে সামান্য খেজুর চুরির ঘটনাও তিনি ধরে ফেলেছিলেন এবং অপরাধীদের অভিনব শাস্তি দিয়েছিলেন। অপরাধীদের ইউনিফর্মের ওপরে নেপোলিয়নের আদেশে লিখে দেওয়া হয়েছিল "লুঠেরা"। তারপর তাদের কয়েকদিন ধরে দিনেদুবার করে সারা সৈন্যব্যারাকে ঘোরান হল। ফলে লজ্জায়, ধিক্কারে তারা নিজেদের মনের মধ্যে যে শাস্তি পেল, তার কোন তুলনা রইল না।

ন্যায় বিচার সম্পর্কে নেপোলিয়নের অটুট নিষ্ঠা ও সতর্কতাও সবাইকে বিস্মিত করেছিল। পৃথিবীতে যে কোন অপরাধের সত্যি সত্যি বিচার হয়, বিচারে শাস্তি হয়—এসব মিশরীয়দের ধারণাতেও ছিল না। নেপোলিয়ন একদিন শুনতে পেলেন একদল আরব দস্যু এসে একটি কৃষককে হত্যা করে তার সমস্ত ভেড়া নিয়ে চলে গেছে। নেপোলিয়ন রাগে-দুঃখে অস্থির হলেন। একজন সামরিক কর্মচারীকে হুকুম দিলেন তিনি যেন এই মুহূর্তে তিন শ' ঘোড়সওয়ার আর দু শ' উষ্ট্রারোহী সৈন্য নিয়ে ছুটে যান এবং ঐ আরব দস্যুদের ধরে সমুচিত শাস্তি দেন।

এমন তো কত কৃষকই মারা যায়, গরীবেরা মুখ থুবড়ে পড়ে, কিন্তু কই তুর্কী সুলতান বা তাঁর তা-বড়ো তা-বড়ো কর্মচারীরা তো কোন দিন তাকিয়েও দেখেন না! একজন শেখ সাহেব তো আর থাকতে না পেরে নেপোলিয়নকে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, "একজন সামান্য কৃষকের মৃত্যুতে আপনি এত বিচলিত কেন! কৃষকটি কি আপনার

ভাই··· !"—"আরও বেশী", নেপোলিয়ন উত্তর দিলেন, "কারণ ঈশ্বর ওর নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব আমাকেই দিয়েছেন···।"

• "চমৎকার", শেখ সাহেব উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্-র প্রেরণা না থাকলে কেউ এমন কথা বলতে পারে না··· ।"

শুধু এদিকেই নয়, নেপোলিয়ন তাঁর সঙ্গে যে সব বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পণ্ডিত ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিলেন, মিশরে তাঁদেরও কাজে লাগালেন। মিশরে বিজ্ঞান সাধনার জন্য গবেষণাগার স্থাপন করলেন। বেশ কয়েকজন ফরাসী পণ্ডিতকে উৎসাহ ও নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন অতি অবশ্যই এই নীলনদের দেশ থেকে কিছু শিখে নেন। যাঁদের বলেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ শিখলেন কি করে নীল তৈরী করতে হয়। কেউ বা গবেষণা করলেন উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে। কারও বা মন গেল আরবীয় সঙ্গীত সাধনায়, কেউ বা হলেন চক্ষু চিকিৎসাবিশারদ। আরও কিছু পণ্ডিত মানুষ কাজ করলেন রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। এমনি করেই একদিন নীলনদে এক ধরনের মাছ পাওয়া গেল, যার সঙ্গে কোন্ সুদূর অতীতের স্তন্যপায়ী ম্যামাল মাছের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। আর থিব্স্-এর সমাধি থেকে পাওয়া গেল আইবিস বা একধরনের পাখির মমীভূত দেহ, যেগুলি সংগ্রহ করার ফলে প্রাণিতত্ত্ব বিভাগে এক বিস্ময়কর অগ্রগতির পথ খুলে গেল, মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে বেশ কয়েকটি অধ্যায় সংযোজিত হল।

নেপোলিয়ন নিজেও একটা বিরাট কাজের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি প্রায়ই খুঁজে বেড়াতেন ভূমধ্যসাগর ও লোহিত-সাগরের মাঝখানে যে সুয়েজ যোজক, যেখানে নাকি অনেক আগে একটা খাল কাটা হয়েছিল, তার সত্যিই কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, এবং তার কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা। এই অনুসন্ধান কাজে গিয়ে অবশ্য নেপোলিয়ন একদিন লোহিত সাগরের বানে প্রায় ডুবতে বসেছিলেন। যাই হোক, এই অভিযানের ফলে নেপোলিয়নের সঙ্গী এঞ্জিনিয়র লা পের সুয়েজ যোজকটি জরীপ করে মাটি পরীক্ষা

করে, আরও খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করে প্রচুর তথ্য-সম্বলিত অতি মূল্যবান যে দলিলটি তৈরী করেছিলেন, সেটি অতি প্রামাণ্য ভাবে কাজে লেগেছিল আরও কয়েক বছর পরে সুয়েজ খাল খননকারী ফরাসী এঞ্জিনিয়র ফ্রান্সিস দ্য লেসেপ্‌স্‌-এর।

শত কাজের মধ্যেও নেপোলিয়ন বেড়াতে যেতেন পিরামিড দেখতে। সব চাইতে বড়ো পিরামিড দেখে মন্তব্য করেছিলেন, ওর গায়ে যতগুলি প্রস্তরখণ্ড আছে সেগুলি দিয়ে প্যারিসের চারিদিকে এক মিটার চওড়া আর তিন মিটার উঁচু বেশ একটা শক্ত পাঁচিল হয়ে যায়। পরে হিসেব করে দেখা গিয়েছিল নেপোলিয়ন পিরামিডের গায়ে প্রস্তর খণ্ডগুলি শুধু চোখে দেখে পাঁচিল তৈরী করার যে হিসেব করেছিলেন, তা নির্ভুল। স্ফিঙ্ক্‌স্‌-এর দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কি ভেবেছিলেন নেপোলিয়ন—জানা যায় না। তবে বালিতে অনেকখানি ডুবে যাওয়া স্ফিঙ্ক্‌সের-গা থেকে তিনি নিজের হাতে অনেক বালি ঝরিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রাচীন মিশরের ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার জন্য নেপোলিয়ন মিশরের প্রায় প্রতিটি জায়গায় ইতিহাসবিদ পণ্ডিতদের পাঠিয়েছিলেন। এমন কি, তিনি চেয়েছিলেন মিশরের সর্বাপেক্ষা বিস্ময় ও মানুষের অবোধ্য চিত্রলিপির অর্থ উদ্ধার করা যায় কিনা। তবে যাঁদের এই কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারেননি। অবশেষে মন্তব্য করেছিলেন, "মিশর আর চীন দেশের ভাষা একই রকম। কতগুলি রেখাচিত্র সাঙ্কেতিক চিহ্ন বহন করছে···।"

সবচাইতে বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল এর পরে। অভাবনীয় বিস্ময়। রসেটা নামে একটা জায়গায় হঠাৎ পাওয়া গেল বেশ বড়ো কালো রং-এর একখণ্ড পাথর। লম্বায় তিন ফুট নয় ইঞ্চি, চওড়ায় দু ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। পাথরটার ওপর কি সব লেখা, আঁকিজুকি কাটা। পাঠোদ্ধারের চেষ্টা হল। বোঝা গেল, তিন রকম ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমটিতে প্রাচীন মিশরের বৈশিষ্ট্য, তার অবোধ্য চিত্র-

লিপি। তার পরের লেখাগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মিশরীয় ভাষা। আর শেষেরটা গ্রীক। ভাগ্যিস গ্রীক ভাষায় লেখাটা ছিল। তাই নেপোলিয়নের সঙ্গী ল্যানক্রেট, যিনি গ্রীক জানতেন, তিনি ঘোষণা করলেন এই মহামূল্যবান পাথরখণ্ডে লেখা আছে খ্রীঃ পূঃ ১৯৭ অব্দ থেকে ১৯৬ অব্দের মধ্যে পঞ্চম টলেমী এপিফেনিস মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং সেই স্মরণীয় দিনে টলেমীর ঘোষণা পত্রে ঘোষিত হচ্ছে, পুরোহিতদের রাজা কি দানপত্র করছেন।

ইতিহাসের জগতে রসেটা প্রস্তরলিপির আবিষ্কার সত্যিই বিস্ময়কর। কালো পাথর ইতিহাসের বুকে আলো হয়ে জ্বলে উঠল আর সেই আলোতে পথ দেখলেন জাঁ ফ্রাঁসয় শাঁপোলিয়ো—নটি প্রাচ্য দেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনিও কতগুলি অসাধারণ আবিষ্কার করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন ফারাও রামেসিসের নাম, ফারাও থটমোসের নাম। আর একই সঙ্গে আবিষ্কার করলেন প্রাচীন মিশরের অন্যতম উপাস্য দেবতাকে, যাঁর নাম ছিল 'রা'। বক্তব্যের প্রতিচ্ছায়া আর ধ্বনিগত চিত্র, এই দুইয়ে মিলে প্রাচীন মিশরের চিত্রলিপি, এই বোধটাও যেন মিশরের ইতিহাস সন্ধানের পথে বেশ খানিকটা আলোকপাত করল। একটা সফল যুদ্ধে যে গৌরব, রসেটার এই কালো পাথরের বুকের লেখা আরও অনেক বেশী যশোমণ্ডিত করল নেপোলিয়নের এই অভিনব যুদ্ধ অভিযানকে। মিশরের ইতিহাসে, মিশরের আধুনিকীকরণের কাহিনীর পিছনে নেপোলিয়নের দান অনস্বীকার্য…।

বেশ কয়েকটি মাস কেটে গেল। নেপোলিয়নের ভাব-সাব দেখে মনে হচ্ছিল না তাঁর মনে কোন চিন্তা ভাবনা আছে। কিন্তু আবার একটা দুঃসংবাদ এল। এ সংবাদ অসহনীয়। ফ্রান্স থেকে একখানা জাহাজ কোন রকমে নেলসনের দৃষ্টি এড়িয়ে মিশরে এসে পৌঁছল। সেই জাহাজে একখানা চিঠি এল। চিঠিটা নেপোলিয়নের নামে নয়, তবে ভেতরকার খবরটি ছিলই একান্তই নেপোলিয়নের। জোসেফাইন নাকি হিপ্পোলাইটের সঙ্গে বড় বেশি মেলামেশা করছেন। এবং এই

মেলামেশাটা বেশ প্রকাশ্য ও নির্লজ্জভাবেই চলছে। গোটা প্যারিসে এই ব্যাপার নিয়ে এখন জোর কানাকানি···।

নেপোলিয়ন এই খবরটিতে প্রথমটায় একেবারেই বিশ্বাস করেননি, করতে চান নি। কেন করবেন! তাঁর অমন মিষ্টি, নরম, ছোট্ট বউ জোসেফাইন, সে কি কখনও নেপোলিয়নের মতো স্বামীকে অসম্মান করে হিপ্পোলাইটের মতো একজন ফচ্‌কে প্রেমিকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হতে পারে!

নেপোলিয়ন কয়েকজন সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বলুন তো, এও কি সম্ভব!"

সহকর্মীরা এতটুকু বিস্মিত না হয়ে বললেন, "এ তো নতুন খবর নয়, আমরা তো কতদিন আগের থেকেই এই ব্যাপার জানি, সবাই জানে···।"

"সবাই জানে, শুধু আমিই···।" নেপোলিয়ন কথা শেষ করতে পারলেন না। গলায় আটকে গেল। মুখ সাদা, বিবর্ণ। ঐ ভয়ানক খবরটা মুখের সব রক্তটুকু যেন শুষে নিয়েছিল।

নেপোলিয়ন ত্বখানা হাতের মধ্যে মাথাটা ডুবিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "কী নির্বোধ আমি, আমি কী বোকা। কোন্ মূর্খের স্বর্গে আমি বাস করেছি···! হায় জোসেফাইন, ছ'শ লিগ দূরে এসে, এত কাজের মধ্যেও আমি কিনা শুধু তোমাকেই ভাবি, তোমাকেই চিন্তা করি···।"

এর পরেই রাগে-ত্বঃখে অস্থির হয়ে নেপোলিয়ন চেঁচিয়ে উঠলেন, "জোসেফাইন আর আমার জীবনে থাকবে না, তাকে আমি চাই না, তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে যাক···।"

নেপোলিয়ন বড়ো ত্বঃখে ভাই জোসেফকে লিখলেন, "আমার সব আশার সমাধি হয়েছে। প্যারিস বা বার্গাণ্ডির কাছে-পিঠে শহরতলিতে আমার জন্য ছোট্ট একটা বাসা দেখে রেখো। আমি ফিরে গিয়ে ওখানে একেবারে একা থাকব···মানুষের সঙ্গ আমার আর ভালো লাগছে না। আমার ভেতরকার সব অনুভূতি শুকিয়ে গেছে। সম্মান, খ্যাতি সব আজ আমার কাছে নিরর্থক মনে হচ্ছে···।"

নেপোলিয়ন তাঁর মিশর অভিযানে সঙ্গে নিয়েছিলেন জোসে-ফাইনের আগের পক্ষের ছেলে ইউজিনকে। সতেরো বছরের এই উৎসাহী কর্মঠ ছেলেটিকে নেপোলিয়ন পছন্দ করতেন। কিছুদিন পরে ইউজিনকে নিজের দেহরক্ষীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

ইউজিন মা জোসেফাইনকে চিঠি লিখল নেপোলিয়ন কতখানি দুঃখিত, মর্মাহত হয়েছেন হিপ্পোলাইটের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতার সংবাদ শুনে।

নেপোলিয়ন ও ইউজিন এই দুজনের লেখা দুখানা চিঠিই প্যারিস যাওয়ার পথে নেলসন হস্তগত করলেন। আর এই দুখানা চিঠিই লণ্ডনের সংবাদপত্র 'মর্নিং ক্রনিক্‌ল'-এ বড়ো বড়ো অক্ষরে ছেপে বেরোল। লণ্ডন ও প্যারিসে নেপোলিয়নকে নিয়ে হাসাহাসি হল, তাঁর দাম্পত্য জীবন নিয়ে নানা জনে নানা চুটকি ও রসালো মন্তব্য ছুঁড়ল। নেপোলিয়নের যুদ্ধ-গৌরবকে ছাপিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সকলে এক ধরনের আনন্দ উপভোগ করতে লাগল···।

নেপোলিয়ন অসাধারণ মনের জোরে এত বড়ো দুঃখ চেপে সবাইকে এক মজার খেলা দেখালেন। তাঁরই সেনাবাহিনীর মধ্যে এক লেফ-টেন্যাণ্টের স্ত্রী ছিল পলিন ফোর্স। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর ছিল না। যাই হোক, নেপোলিয়ন হঠাৎ এই মেয়েটির প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ দেখালেন। মিষ্টি চেহারার মেয়ে পলিন তো আনন্দে আত্মহারা। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সে এখন নেপোলিয়নের ঘনিষ্ঠ হল। কায়রোর পথে প্রকাশ্যভাবে নেপোলিয়ন তাঁর গাড়িতে নিজের পাশ-টিতে পলিনকে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন। লোকে দেখুক, জানুক, জোসেফাইন না থাকলেও নেপোলিয়নের কিছু যায় আসে না। তাঁর মতো লোক কোন একটি বিশেষ মেয়ের কাছে মন বাঁধা দেন না। জোসেফাইন নেই তো বয়ে গেছে। নেপোলিয়নের কেমন পলিন আছে! সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখুক আর জোসেফাইনের কানে এই খবরটি তুলুক। কিছুদিন পরে প্যারিসের পথে ঘাটে খবর রটল

মিশরে গিয়ে বিজয়ী বীর নেপোলিয়ন কেমন একজন ক্লিয়োপেট্রা পেয়েছেন···।

কিন্তু সত্যিই কি নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে ভুলতে পেরেছিলেন! বাইরে তিনি যতই পলিনকে নিয়ে মাতামাতি, হৈ-হুল্লোড় করুন না কেন এবং যতই 'কিছু হয়নি—' এমন অভিনয় করে যান না কেন, প্রাণের গভীরে কিন্তু গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠেছিল একটিই শব্দ···"জোসেফাইন···।"

বিপদ এল অন্যদিক থেকেও। এ বিপদ কোন মনের ব্যাপার নয়। এ বিপদ বড়ো কঠিন, বাস্তব বিপদ।

নেপোলিয়নের একজন বিশিষ্ট সহকর্মী ছিলেন ট্যালির‍্যাণ্ড। বিশিষ্ট বটে তবে বিশ্বস্ত কতখানি তার পরিচয় পাওয়া যাবে পরে। নেপোলিয়ন ট্যালির‍্যাণ্ডকে বার বার অনুরোধ করলেন যাতে তিনি অতি অবশ্যই কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল-এ গিয়ে তুর্কীর সুলতানের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সন্ধি করেন। ট্যালির‍্যাণ্ডের সে কথা শুনতে বয়ে গেছে। কে যাবে বাবা চোদ্দ শ' মাইল পাড়ি দিয়ে ঐ অজানা অচেনা জায়গায়! সুতরাং নেপোলিয়ন যতবারই অস্থির হয়ে ঐ সন্ধি সম্পর্কে ট্যালির‍্যাণ্ডকে চিঠি লিখলেন, ততবারই হতাশ হলেন। ট্যালির‍্যাণ্ডের কাছ থেকে 'হ্যাঁ' কি 'না' কোন চিঠিই এল না।

সুতরাং বিপদ যা হবার হল। ইংরেজদের প্ররোচনায় হঠাৎ তুর্কী দেশ ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল। শুধু ঘোষণা নয়, কিছুদিনের মধ্যে মিশর আক্রমণ করবার জন্য সিরিয়াতে এক বিরাট তুর্কীবাহিনী জমায়েত হল।

তুর্কীরা কোন জায়গা আক্রমণ করলে যে তারা কি নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করে, তা নেপোলিয়নের অজানা ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে হত্যা করা, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, যথেচ্ছ লুণ্ঠন করা ইত্যাদিকে তুর্কীরা যুদ্ধগৌরবের অঙ্গ বলেই মনে করত। এতে তারা কিছু অন্যায় দেখত না। যাই হোক নেপোলিয়নও তৈরী হলেন। তেরো হাজার পদাতিক সৈন্য, ন শ' অশ্বারোহী আর

উনপঞ্চাশটি কামান নিয়ে নেপোলিয়ন এগিয়ে গেলেন সিরিয়ার দিকে। পথে পড়ল দুঃসহ সিনাই মরুভূমি। তারপর গাজা শহর, যেটি নেপোলিয়ন সহজেই জয় করে নিলেন। তারই সঙ্গে বন্দী হল হাজার দুয়েকের মতো তুর্কী সৈন্য।

বন্দী তো হল। নেপোলিয়ন তাদের খাওয়াবেন কি। খাদ্য যা আছে তাতে তো তাঁর নিজের সেনাবাহিনীরই অত্যন্ত কষ্টে স্বষ্টে চলবে। তবে? ঠিক আছে, নেপোলিয়ন আর দ্বিধা করলেন না। তিনি তুর্কী বন্দীদের ছেড়ে দিলেন। তাদের দিয়ে সর্ত করিয়ে নিলেন, তারা যুদ্ধের কোন ব্যাপারে অংশ নেবে না।

নেপোলিয়ন এরপর জয় করলেন জাফা। এখানে বন্দী হল চার হাজারের মতো তুর্কী সৈন্য। কিছু সৈন্যকে তিনি আগেকার সর্তে মুক্তি দিলেন। কারণ একই। খাদ্যের অভাব। বাকী বন্দীদের নিয়ে কি করবেন, এই সমস্যায় নেপোলিয়ন বিব্রত হলেন। বার বার তো শত্রু-বন্দীদের মুক্তি দেওয়া যায় না। তাতে তো ফরাসী সৈন্যদেরই মৃত্যুবাণ তৈরী করা হবে। সুতরাং হয় এই সব বন্দীদের উপোসী করে রাখতে হবে, আর নইলে… !

নেপোলিয়ন শিউরে উঠলেন। বিবেকের দিক থেকে মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তো তাঁকে মেনে চলতে হবে। সমর-পরিষদে সমস্যাটি তুলতে সকলেই একবাক্যে মত দিলেন। বন্দীদের গুলি করে হত্যা করা ছাড়া আর নাকি কোন উপায় নেই। খাদ্য-দ্রব্য অত্যন্ত সীমিত। ফরাসী সেনাদেরই রেশন করে খেতে হচ্ছে। অতএব একমাত্র বন্দুকের গুলিই পারে এই সমস্যার সমাধান করতে। তাই-ই হল। সব বন্দীকে গুলিতে হত্যা করা হল। রাজনীতি, সমরনীতিতে তো ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই… !

নেপোলিয়ন আবার চলতে শুরু করলেন। গিয়ে থামলেন একার বলে একটা জায়গায়। যার তিনদিকে সমুদ্রের জল আর একদিকে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ, যেখানে তুর্কী সৈন্যরা কামান তাগ্ করে বসে আছে, আর তাদের সঙ্গে আছে আট শ' ইংরেজ নৌ-সেনা। তাদের কর্তা

সিড্‌নী স্মিথ। নেপোলিয়ন এখানে এঁটে উঠতে পারলেন না, পারা অসম্ভব। সমুদ্রপথে তিনি অধিকাংশ কামান পাঠিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি সমুদ্রের রাজা ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছিল। সুতরাং যে-কটি কামান আর বাকি ছিল, তা দিয়ে আঘাত করা যায়, জয় করা যায় না। তবুও অসমসাহসী নেপোলিয়ন তাঁর সেনাবাহিনীকে দিয়ে তিন তিনবার একার দুর্গের প্রাচীরে আঘাত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিন তিনবারই অসংখ্য তরবারির আঘাতে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আরেক পাশে, মাউণ্ট থাবোরের কাছে একই সময়ে আরেকটি খণ্ডযুদ্ধ চলছিল, সেখানে মাত্র সাড়ে চার হাজার ফরাসী সৈন্য পঁয়ত্রিশ হাজার তুর্কী সেনাকে পরাজিত করতে সক্ষম হল। হবেই, কারণ এখানে যে শুধু তুর্কীরা। একার দুর্গের যুদ্ধটা তো আসলে হয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে।

কিন্তু আখেরে কিছুই ভালো হল না। নিদারুণ গরম, শত্রুপক্ষের তীব্র আক্রমণ আর তার সঙ্গে রোগের আবির্ভাব সব কিছু ভেস্তে দিল। কয়েকজন বিশ্বস্ত দক্ষ সেনাপতি মারা গেলেন। নেপোলিয়ন নিজে কয়েকবার গোলার আঘাতে শেষ হয়ে যেতে যেতে দৈববলে বেঁচে গেলেন। চারদিকে শুধু হাহাকার আর আসন্ন পরাজয়ের বেদনা।

ষোলকলা পূর্ণ হল যখন দেখা গেল আরও ত্রিশখানা জাহাজ নতুন করে ইঙ্গ-তুর্কী সৈন্য ও রসদপত্র নিয়ে এগিয়ে আসছে। নেপোলিয়ন শেষ লড়াইয়ের চেষ্টা করলেন। তবে পারলেন না। ছ'সপ্তাহ ধরে যে একার দুর্গটিকে অবরোধ করে রেখেছিলেন, যে দুর্গটি একবার জয় করলে দামাস্কাস, কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ জয় করবার পথ খুলে যেত, ইংরেজশক্তিকে বেশ খানিকটা নাড়া দেওয়া সম্ভব হত, নেপোলিয়ন সেই অবরোধ এবার তুলে নিতে বাধ্য হলেন। তিনি এবার পিছু হঠলেন। এই প্রথম পিছু হঠা। বড় বেদনাময়, বড় দুঃখের। ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের উদ্দেশে সেদিন নেপোলিয়ন মনে মনে কি বলেছিলেন জানা যায় না। তবে ঘটনা যে আরও অনেক দূর গড়াবে, কালের ব্ল্যাকবোর্ডে তার স্বাক্ষর পড়ল। নেপোলিয়ন এবার ফিরে আসতে লাগলেন মিশরের

দিকে। হঠাৎ মহামারীর আকারে দেখা গেল বিউবনিক প্লেগ। গ্রন্থি ফুলে উঠে তীব্র জ্বর। তারপরই শেষ। সাংঘাতিক ছোঁয়াচে। রোগাক্রান্ত সৈন্যদের মধ্যে যাদের এতটুকু বাঁচবার আশা ছিল, নেপোলিয়ন হুকুম দিলেন যার যার ঘোড়া আছে, রোগীদের দিয়ে তারা, সুস্থ ব্যক্তিরা, পায়ে হেঁটে ফিরবে। নেপোলিয়ন নিজেও হেঁটে চললেন। পথের মধ্যে সৈন্য সংখ্যা কমতে লাগল। সিনাই মরুভূমির ওপর দিয়ে চলার সময় মনে হল এ যাত্রা বোধহয় আর মিশরে ফিরে যাওয়া গেল না। তার আগেই এই বালুশয্যাকে শেষ শয্যা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সূর্যদেবের তেজ এত নিষ্ঠুর! এত নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা! হেঁটে হেঁটে ফিরেচলা সৈনিকদের পায়ে ফোস্কা পড়ল, তাতে ঘা হল। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম খাদ্য খেয়ে দেহ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হল। মনে শুধু প্রশ্ন, পথের শেষ কোথায়!

পথের শেষ একদিন হল। জুন মাসের গোড়ার দিকে শেষ পর্যন্ত মিশরে পৌঁছে যাত্রাপথের অবসান হল। তবে নেপোলিয়ন বিশ্রাম করতে পারলেন না। তিনি ঠিক জানতেন তুর্কী সৈন্যরা আসবেই, এলো বলে। ঠিক তাই। তুর্কী সৈন্যরা এগারোই জুলাই জলপথে আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে আবুকির উপদ্বীপের একটা জায়গায় ছাউনি ফেলল। কদিন পরে পঁচিশে জুলাই নেপোলিয়ন তুর্কীবাহিনীকে আক্রমণ করলেন। সামনে সমতল ভূমিতে একটি সেনাবাহিনী, তার এক মাইল পেছনে পর্বতের ওপর আরেকবাহিনী, এইভাবে তুর্কী সেনারা দাঁড়িয়ে ছিল। পর্বতের পেছনেই ছিল সমুদ্র।

নেপোলিয়ন তাঁর সেনাপতিদের আদেশ দিলেন একই সঙ্গে শত্রুসেনাকে সামনে আর দু'পাশে বিদ্যুৎ গতিতে আঘাত করতে। নেপোলিয়নের এই কৌশলে সামনে দাঁড়ানো তুর্কীরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, অনেক মারা পড়ল। শত্রুসৈন্য পিছু হঠল। নেপোলিয়ন আরও এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে গেলেন সেনাপতি মুরাট। নেপোলিয়ন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, সেনাপতি মুরাট কী কৌশলে, কী বীরত্বের সঙ্গেই না যুদ্ধ করছেন। সাধ্য কি তাঁর সামনে

তুর্কীরা দাঁড়ায়। মুরাট তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে মরণপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তুর্কীদের ওপর। তারা আর পারলো না। ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু পালবে কোথায়! পেছনে সমুদ্র হাঁ করে আছে তাদের গ্রাস করবার জন্য। ঠিক তাই হল। মুরাটের তাড়া খেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার তুর্কী সৈন্য সমুদ্রের জলে লাফিয়ে ডুবে মারা গেল। দু হাজার শেষ হল যুদ্ধক্ষেত্রেই, বন্দী হল আরও দু হাজার।

নেপোলিয়ন মুরাটকে জড়িয়ে ধরলেন, "সাবাস বন্ধু! এতদিনে একারের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছো, সাবাস···"

দেখতে দেখতে তেরো মাস কেটে গেল নেপোলিয়ন মিশরে এসেছেন। মিশরকে নতুন ভাবে সংগঠন করেছেন। প্রাচীনত্বের জরা থেকে মিশরের অধিবাসীদের উদ্ধার করে তাদের এগিয়ে চলার পথের হদিস দিয়েছেন। শেষমেশ আবুকির জয়লাভটাও বড়ো কম লাভ নয়। তবে এখানে আসবার আগে নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারের পথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আর অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হচ্ছে না। বরঞ্চ যতটুকু হাতে এসেছে, সেটুকু নিয়েই আপাতত খুশি থাকা ভালো। দেখাই যাক না মিশরে আরও কিছু দিন থেকে এই দেশের আরও নতুন কিছু বাড়বৃদ্ধি করা যায় কি না। প্যারিস তো আর তাঁকে টানছে না। জোসেফাইনকে মনে করে তো আর কোন কষ্ট হয় না!

মানুষ ভাবে এক, হয়ে যায় অন্য রকম। তাই নেপোলিয়ন যখন মিশরে আরও বেশ কিছুদিন থেকে যাবার পরিকল্পনা করছেন, ঠিক সেই সময় ইউরোপ থেকে খানকতক খবরের কাগজ এলো। ইউরোপের, ফ্রান্সের খবর পাওয়া যাচ্ছে না আজ প্রায় ছ'মাস হল। দেখাই যাক, এর মধ্যে ওখানে নতুন কি ঘটল, নতুন কি খবর এল···!

খবরের কাগজে চোখ বুলিয়েই তো নেপোলিয়ন মাথায় হাত দিলেন। এ কী সর্বনাশ আজ ফ্রান্সের! ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়িয়েছে ইংল্যাণ্ড, তুর্কী, নেপল্‌স, অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়া। ইঙ্গ-রুশ সৈন্য হল্যাণ্ডে উপস্থিত। অষ্ট্রো-রুশ সেনাবাহিনী সুইজারল্যাণ্ড

আক্রমণ করে জুরিখ নিয়ে নিয়েছে। তুর্কো-রুশ নৌ-বহর আইয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে কর্ফু জয় করেছে···।

এ কী সর্বনাশ! নেপোলিয়ন বুকের মধ্যে আরও জোরে ধাক্কা খেলেন যখন তাঁর চোখ পড়ল আরেকটি সংবাদের ওপর। একটি অস্ট্রো-রুশ সেনাবাহিনী উত্তর-ইটালী আক্রমণ করে সেখান থেকে ফরাসী সেনাদলকে একেবারে হঠিয়ে দিয়ে নেপোলিয়নের অত যে সাধের গড়ে-তোলা রাজ্য "রেপাবলিক সিজ আলপাইন" একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে অর্থাৎ নেপোলিয়ন ফ্রান্সে থাকতে যে-যে গঠনমূলক শুভ-ভবিষ্যৎ-দ্যোতক কাজ করেছিলেন সব···সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর ফ্রান্সের এ কী অর্থনৈতিক দুর্দশা! ফ্রান্সের গোটা অর্থনীতিটাই আজ ধ্বংসের মুখে। তাকে না সামলালে বিপ্লবী ফ্রান্সের, রেপাবলিক ফ্রান্সের এই ক'বছরের ইতিহাস যে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। খবরের কাগজে লিখেছে ফরাসী সিংহাসনে এইবার নাকি বসবেন সেই বুরবোঁ বংশের অষ্টাদশ লুই! সব···সব অর্থহীন। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে এখন পর্যন্ত ফ্রান্সের এগিয়ে চলার যে ইতিহাস, সব নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে···।

নেপোলিয়ন কয়েকটি মুহূর্ত নিলেন শুধু চিন্তা করবার জন্য। তারপরেই লাফিয়ে উঠে নৌ-অধ্যক্ষ গ্যানটিউনকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছ থেকে খবর নিয়ে জানলেন চারখানা জাহাজ এখনি তৈরী হতে পারে···।

"ঠিক আছে, যাত্রার জন্য তৈরী হোন ঐ চারখানা জাহাজ নিয়ে আমরা ফ্রান্সের দিকে রওনা দেবো। দেশের বড় বিপদ···"

"মাত্র চারখানা জাহাজ নিয়ে আপনি সমুদ্রে পাড়ি দেবার সাহস করছেন···!" একটু কুণ্ঠিত ভাবে গ্যানটিউন বললেন।

"আমি বুঝতে পারছি আপনি ইংরেজদের কথা ভাবছেন। সমুদ্রের আনাচে-কানাচে ওরা জাহাজ নিয়ে মাছির মতো ভিড় করে আছে। তা হলেও ভয় করলে চলবে না। আমাদের যেতেই হবে···।"

গ্যানটিউন আর দ্বিরুক্তি করলেন না। মিশরের জাহাজ যাত্রার

জন্য তৈরী হল। সেনাপতি ক্লেবারের হাতে সকল দায়িত্বভার দিয়ে নেপোলিয়ন জাহাজে উঠলেন। সময়টা ছিল ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে অগাস্ট। চোদ্দ মাস পরে নেপোলিয়ন আবার ফ্রান্সের দিকে পাড়ি দিলেন।

নেপোলিয়ন প্যারিসে এসে পৌঁছলেন অক্টোবর মাসের ১৬ই ভোর বেলা। নেহাত ভাগ্যবলেই নেপোলিয়ন ইংরেজদের চোখ এড়িয়ে আসতে পেরেছিলেন। প্যারিসে নতুন বাসায় নেপোলিয়ন প্রবেশ করলেন। জোসেফাইন সেখানে ছিলেন না। এলেন দুদিন পরে। আর এই দুদিনের মধ্যে নেপোলিয়ন বেশ কয়েকবার শপথ করেছিলেন জোসেফাইনকে আর কিছুতেই ক্ষমা করা নয়। 'এবার তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ···চিরকালের মতো বিচ্ছেদ···।' নেপোলিয়ন নিজের মনে বার বার এই কথা উচ্চারণ করেছেন। অভিমান আর রাগ—পাল্লা কোনদিকে বেশী ঝুলছিল, তিনি নিশ্চয়ই সেদিন বোঝেননি। দুদিন পরে জোসেফাইন স্বামী গৃহে এসে যখন স্বামীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন, নেপোলিয়ন তাঁর এত আদরের যে জোসেফাইন, তাঁর মুখের সামনে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেদিন সমস্ত রাত নাকি জোসেফাইন বদ্ধ দরজার বাইরে চোখের জল ফেলেছেন। কেঁদেছেন আর ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেছেন, "আমি যে বার্গাণ্ডির পথে এগিয়ে গিয়েছিলাম তোমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবার জন্য। আমি কি করে জানব গো, তুমি অন্য পথে আসবে! ঐ জন্যই আমার আসতে দুদিন দেরি হল···।"

জোসেফাইন জানতেন, শুধু সেই রাতটুকুই যা কিছু কষ্ট। একটু চোখের জল আর তার সঙ্গে কান্না-ভেজানো অনুরাগে-ভরা দুটি-একটি কথা, তা হলেই নেপোলিয়ন দ্রবীভূত হবেন, তাঁর গার্হস্থ্য মন তীব্র অনুভূতিতে ভরে উঠবে কোমলাঙ্গী মধুর-ভাষিণী স্ত্রীর জন্য।

ঠিক তাই হল। পরদিন সব কিছু ভুলে গিয়ে নেপোলিয়ন স্ত্রীকে আবার কাছে টেনে নিলেন। বুকের কাছে সাপটে ধরে কানের কাছে

মুখ নিয়ে বললেন, "না, জোসেফাইন, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি তা পারবো না...।"

পারিবারিক বন্ধনে থাকতে নেপোলিয়ন ভালোবাসতেন। তাঁর কর্সিকার জীবন তো ঐ ভাবেই কেটেছিল। প্রথম জীবনে মা, বাবা, অনেক ক'টি ভাই-বোন, তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই আসে স্ত্রীর ভালোবাসা, সন্তান-সন্ততি। এই জীবনের ওপর নেপোলিয়নের অসীম তৃষ্ণা, দুর্দান্ত আকর্ষণের কথা জোসেফাইন খুব ভালো করেই জানতেন। উপরন্তু জোসেফাইন খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন, নেপোলিয়ন এখন অভ্যুদয়ের পথে। এখন আর কোন হিপ্পোলাইট নয়, কেউ নয়। এখন শুধু নেপোলিয়নের পাশটিতে থাকা।

ডিরেক্টররা নেপোলিয়নকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা বললেন নেপোলিয়ন নিজের ইচ্ছেমতো যে-কোন সৈন্য বিভাগের অধ্যক্ষ হতে পারেন। নেপোলিয়নের মন কিন্তু তখন সৈন্য পরিচালনার দিকে ছিল না। তখন তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল ঠিক সেই জায়গায় যেখানটায় ঘুণ ধরেছিল। ঘুণ ধরেছিল ডিরেক্টরদের মধ্যে অর্থাৎ যাঁদের ওপর কিনা গোটা ফ্রান্সের বর্তমান ভবিষ্যৎ -দুই-ই নির্ভর করছিল। অন্যতম ডিরেক্টর পল বারাস দেশের এই বিশৃঙ্খলার সময়েও নিজের স্বভাবমতো কাজ করে বেড়াচ্ছিলেন অর্থাৎ সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তার পেছন পেছন ঘুর-ঘুর করা, তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা। আরেকজন ডিরেক্টর, তিপান্ন বছরের প্রৌঢ় লুই গোহের তাঁরও সেই একই অবস্থা অর্থাৎ দেখতে ভালো মেয়ের জন্য পাগলের মতো আচরণ করা। চরিত্রে ন্যায় নীতির কোন বালাই ছিল না।

দেশের শাসকদের মধ্যেই যখন এই শিথিলতা, তখন তো দেশের ও দশের শাসনে শৈথিল্য আসবেই। নেপোলিয়ন জানতেন। নেপোলিয়ন খুব ভালো করেই জানতেন বিপ্লবের পেছনে চাই একরকমের প্রস্তুতি, তার চাইতেও বেশী প্রস্তুতি চাই বিপ্লবের পরে, দেশ গঠনে। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিপ্লবের ফল ব্যর্থ হয়ে যায় এই পরবর্তী

অধ্যায়ে। সেই ব্যর্থতাই ঘটতে যাচ্ছে ফ্রান্সে, যে ফ্রান্সের বিপ্লবকে, বিপ্লবের আদর্শকে বাঁচিয়ে, দেশের ওপর অপরের হামলাকে কত করে আটকে রেখে তিনি গিয়েছিলেন বিদেশে…!

শুধু কি ডিরেক্টরদের অযোগ্যতা! নেপোলিয়নের নিজের ভাই জোসেফ, লুসিয়েন, এঁদেরই বা এ কী ঔদাসীন্য ফ্রান্স সম্পর্কে! বলতে গেলে এই মাটিই তো বোনাপার্ট ভাইদের স্বদেশভূমি! এঁদের সকলের কর্ম-শৈথিল্যের ফলে তখন গোটা দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। দেশে তখন আখছার মূল্যহীন টাকা ছড়িয়ে আছে। অথচ অন্যদিকে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ উর্ধ্বগতি। দেশের শিক্ষা শাসন, সভ্যতা পতনের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, আর ঠিক এই সুযোগে থাবা বাগিয়ে এগিয়ে আসছে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, তুর্কী। সামান্যতম কাণ্ডজ্ঞানও কি লোপ পেয়েছে! দেশের তথাকথিত শাসকদের…

নেপোলিয়ন আর এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। তিনি গোটা পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করে, সব কিছু ভেবে চিন্তে দেখলেন। এই সঙ্কটে শুধু যুদ্ধ নয়, তাঁকে শাসনকার্যেও পরিচালনার দক্ষতা দেখাতে হবে। দেশকে ভালো আদর্শ, উপযুক্ত সংগঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নইলে ফ্রান্স পিছিয়ে যাবে। পিছিয়ে যাবে ১৭৮৯-এর আগের রাজত্বে। সুতরাং আবার অভাব, আবার অবিচার, অত্যাচার, আর সেই ফাঁকে ফ্রান্সের সিংহাসনে এসে বসবে বুরবোঁ রাজা অষ্টাদশ লুই।

নেপোলিয়ন নিজেকে অন্যতম ডিরেক্টর হিসেবে নির্বাচিত করতে চাইলেন। নইলে শাসননীতি পরিচালনায় কোনো অধিকারই পাবেন না। নেপোলিয়ন এই ইচ্ছাটি প্রথম প্রকাশ করলেন পল বারাসের কাছে। নেপোলিয়নের ডিরেক্টর হবার বাসনায় পল বারাস খুশি হওয়া দূরে থাক, আঁত্‌কে উঠলেন। তিনি নিজেই তখন অনেক ঘুষের বিনিময়ে বুরবোঁ রাজবংশকে আবার ফিরিয়ে আনবার নষ্টামিতে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি নেপোলিয়নকে এই ব্যাপারে লুই গোহেরের সঙ্গে পরামর্শ করতে বললেন। লুই গোহের তো নেপোলিয়নের ইচ্ছে

শুনে মনে মনে চোখ কপালে তুললেন। কী সর্বনাশ! যুদ্ধ করছিল, বেশ করছিল। নেপোলিয়ন আবার শাসনদণ্ড হাতে নিতে চাইছে কেন? ওর মতো লোক একবার এ লাইনে এলে তো তাঁদের আর করে খেতে হবে না। নেপোলিয়ন তাঁদের নীচে ফেলে অনেক ওপরে উঠে যাবেন! সে তো স্বপ্নেও সহ্য করা যাবে না!

লুই গোহের মনের ভাব মুখে এতটুকু প্রকাশ না করে ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় বললেন, "খুব ভালো কথা, তুমি দেশের ভালো করবার কাজে এগিয়ে আসতে চাইছ। খুবই ভালো কথা। তবে বাপু, একটা তো বাধা আছে!"

"বাধা আছে?" নেপোলিয়ন বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

"হ্যাঁ, তোমার তো বয়স এখন সবে ত্রিশ। তাই না!"

হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কী···?"

ঐ ত্রিশ বছর বয়সই তো তোমাকে মেরেছে। আইন অনুযায়ী তুমি তো চল্লিশ বছর হবার আগে ডিরেক্টরের নির্বাচনে নামতেই পারবে না।"

নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন এই নির্লজ্জ তথাকথিত শাসকেরা পুরোপুরি তাঁর বিরোধী। অথচ ওদিকে দেশ ভরাডুবি হতে বসেছে। নেপোলিয়ন অবশ্য হতাশ হলেন না। কারণ দেশের জনসাধারণ, যারা দুর্নীতির চাপে শেষ হয়ে যাচ্ছিল, তারা কিন্তু নেপোলিয়নকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল, যাতে নেপোলিয়ন শাসকের পদ গ্রহণ করে দেশের শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে এনে প্রজাসাধারণের মঙ্গল করেন, তাদের জীবনধারণে একটু স্বস্তি দেন। রেপাবলিক ফ্রান্সকে বিপন্মুক্ত করেন।

নেপোলিয়ন দেখলেন এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে তথাকথিত আইনের প্যাঁচ সোজাসুজি খুলে যায়। এমন একটা কাণ্ড ঘটাতে হবে যাতে তিনি দেশের শাসনদণ্ড হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলতে পারেন, কিন্তু কা করে কী হবে! ব্যক্তিগত টাকার জোর নেই, আবার সশস্ত্র সেনাবাহিনী কেবলমাত্র তাঁর একার কথার কিছু

একটা করে সব কিছু উলটে দেবে এমনও আশা করা যায় না। তবে…।

চুপ করে বসে থাকা যায় না। নেপোলিয়ন একটা কিছু পরিবর্তন আনবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। এই ব্যাপারে একজনকে সঙ্গী হিসেবে পেলেন। তাঁর নাম জোসেফ সিয়ে। অন্যতম ডিরেক্টর। বয়সে প্রৌঢ়। কিন্তু দৃষ্টিটা ছিল উদার ও আধুনিক। ডিরেক্টরী সভার অধীনে যে 'কাউন্সিল অব ফাইভ হাণ্ড্রেড্' বা পাঁচশত সদস্যের সমিতি ছিল, তার মধ্যে জোসেফ সিয়ে ছিলেন সবচাইতে বেশী প্রভাবশালী ব্যক্তি। কারণ সিয়ে বলতে কইতে পারতেন খুব ভালো। নেপোলিয়নকে পেয়ে সিয়ে খুশি হলেন। তাঁরা দুজনে মিলে পরামর্শ করলেন। বুঝতে পারলেন যতদিন না ঐ ডিরেক্টরী সভার অদলবদল হবে, ততদিন দেশে শান্তি আসবে না। সুতরাং ওঁরা সিদ্ধান্তে এলেন এই সভার পতন ঘটাতে হবেই। কথাটা দুজনের মধ্যে হলেও প্রকাশ হয়ে গেল। ডিরেক্টররা সতর্ক হলেন। ওঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে চোখ রাঙিয়ে দেশবাসীদের শক্ত মুঠোয় রেখে দিতে পারেন। কিন্তু অন্য দিকে পাঁচশ সদস্যের সমিতির কয়েকজন, যেমন ট্যালির্যাণ্ড, রোয়েডারার, নেপোলিয়নের দু ভাই জোসেফ ও লুসিয়েন ইত্যাদি নেপোলিয়নের সঙ্গে হাত মেলালেন। তাঁরা এই ডিরেক্টরী সভার পতন চাইলেন। লুই গোহরের কাছে সব খবরই পৌঁছোল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নকে একটি সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ করে দূরে পাঠিয়ে দিতে চাইলেন। নেপোলিয়ন যেতে অস্বীকার করলেন। তখন পল বারাস এবং আরও কয়েকজন মিলে নেপোলিয়নকে জপাতে চাইলেন যাতে অষ্টাদশ লুইকে ফরাসী সিংহাসনে বসানো যায়। নেপোলিয়ন এই প্রস্তাবে একেবারে সরাসরি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। আবার সেই বুরবোঁ বংশকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা!

ডিরেক্টরী সভার অধীনে 'কাউন্সিল অব ফাইভ হাণ্ড্রেড' বা পাঁচশ সদস্যের সভা ছাড়াও আরেকটা ছিল 'কাউন্সিল অব এলডার্স' বা প্রাচীনের সভা—যার সদস্য সংখ্যা ছিল আড়াইশো। নেপোলিয়ন যে

'ক্যু' বা প্রচলিত শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ চাইছিলেন, সেই ব্যাপারে এই দুটি কাউন্সিলের সমস্ত সদস্যদের পূর্ণ সমর্থন আবশ্যিক। নেপোলিয়ন এবার এই কাজে এগিয়ে গেলেন। সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন প্যারিসের তদানীন্তন সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল লেফেভারের কাছে। লেফেভার প্রথমটায় নেপোলিয়নের দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, "কি সব হচ্ছে? এ্যাঁ! মতলব কি?"

নেপোলিয়ন মিশরের যুদ্ধে যে তরবারিখানা ব্যবহার করেছিলেন সেটি লেফেভারের হাতে তুলে দিলেন। তারপর তাঁর দিকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সহজ স্পষ্ট গলায় বললেন—"এই তরবারির মাধ্যমে আমি আপনার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করছি। রেপাবলিক ফ্রান্সকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবেই।"

বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লেফেভারের চোখের দৃষ্টি নরম হল। স্নিগ্ধ, দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "ঠিক আছে, ঐ অকর্মণ্য শাসকদের আমি নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলব…।"

ওদিকে পাঁচ শ' সদস্যের সভায় একটা জরুরী মিটিং-এ অন্যতম ডিরেক্টর নেপোলিয়নের সমর্থক করনেট ঘোষণা করলেন, "বর্তমান শাসনে বিপদ ঘটতে যাচ্ছে। এ বিপদ যদি আমরা রুখতে না পারি, তাহলে রেপাবলিক ফ্রান্সের মৃত্যু অনিবার্য।" করনেটের প্রস্তাবে ঠিক হল পরদিন সেণ্ট ক্লাউড বলে একটা জায়গায় তারা সকলে মিলবেন এবং নেপোলিয়নকে প্যারিসের সর্বময় সৈন্যাধ্যক্ষ করে দেওয়া হবে, নইলে কিছুই রক্ষা পাবে না।

এরপর নেপোলিয়ন পূর্ণ সামরিক বেশ পরিধান করে ঝক্‌ঝকে চেহারার তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ছুটে গেলেন ট্যুইলারীর দিকে। তিনশ' সৈন্যের একটি বাহিনীকে পাঠালেন লাক্সেমবার্গে যেখানে গোহের, বারাস, সেলিজ এবং ডুকো ইত্যাদি নেপোলিয়ন-বিরোধী ও রেপাবলিক ফ্রান্সের সর্বনাশকারী ডিরেক্টররা ছিলেন। ওঁরা ভয় পেয়ে ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। মেঘেভরা আকাশের খানিকটা পরিষ্কার হল

পরদিন ভোরে নেপোলিয়ন ছুটে গেলেন সেণ্ট ক্লাউডে। এখানে প্রাচীনের সভার অধিবেশন বসবে। এই সভার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেলে তবেই ডিরেক্টরী সভার পতন হবে।

অধিবেশন বসতে একটু দেরি হয়ে গেল। বেলা সাড়ে তিনটের সময় প্রাচীনের সভার সভাপতি অধিবেশন উদ্বোধন করে প্রথমেই ঘোষণা করলেন, পাঁচজনের মধ্যে চারজন ডিরেক্টরই পদত্যাগ করেছেন। অতএব এখন এই-সভার সর্ব প্রধান কাজ হবে পাঁচশ' সদস্যের সভার সাহায্যে নতুন ডিরেক্টর নির্বাচন করা। ঠিক আছে, তাই হবে। এদিকে নেপোলিয়ন সামরিক অধিনায়ক হিসেবে প্রাচীনের সভার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য স্বীকার করলেন। সব সদস্যের মত উচ্চারিত হবার পর সেদিনকার মতো সভা মুলতুবী রইল। নেপোলিয়ন ধৈর্য ধরে অবিচলিত রইলেন। সেই মুহূর্তটি এবার এগিয়ে আসছে। এবারই ঠিক হবে নেপোলিয়ন ওপরে উঠবেন, না একেবারে পড়ে যাবেন···। নতুন শাসননীতি চালু করে দেশকে বাঁচাতে পারবেন, না দেশের ওপর ধ্বংসের আঘাত নেমে আসবে···।

পরদিন। সভাগৃহের সদস্য গ্যালারী ক্রমে ভরে উঠল। দৃপ্ত পদক্ষেপে নেপোলিয়ন সেই ঘরে ঢুকলেন। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, যে কাজে তিনি এসেছেন, সেকাজ খুব সহজ হবে না। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে শাসন-কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া একটু শক্তই হবে।

নেপোলিয়ান পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন, "দেশ এখন একটা আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যে-কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। দেশের একজন সৈনিক হিসেবে খোলা মন দিয়ে আমি বলছি, আমি এই সভার সদস্যদের ওপর আমার পূর্ণ আনুগত্যের শপথ রাখছি। আমি এই সভাকে রক্ষা করব। আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের এত সাধনার সাম্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করি···।"

"আর শাসন নীতি?" একজন গ্যালারী থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন।

নেপোলিয়ন উত্তর দিলেন "শাসননীতি! কই কোথাও তো তার কোন অস্তিত্ব দেখছি না···এখন শুধু ষড়যন্ত্র আর গোলমাল···।"

"কি ষড়যন্ত্র!"

"কারা করছে··!"

"ষড়যন্ত্রকারীদের নাম বলতে হবে···।" সদস্যদের প্রশ্নবাণের সামনে নেপোলিয়ন একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তবু বললেন, "আমি আপনাদের সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচাবো···আমার সৈনিক-সঙ্গীদের হাতে অস্ত্র আছে। একদা এদেরই সাহায্যে রেপাবলিক ফ্রান্সের সৃষ্টি করেছিলাম। যদি কেউ বিদেশীর অর্থে পুষ্ট হয়ে আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চেষ্টা করে, তাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমারও সশস্ত্র অনুচর আছে। তাদের আমি আরও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যারা আমার বিরোধিতা করবে, যুদ্ধের আঘাতে তারা শেষ হয়ে যাবে। তারা যেন মনে রাখে রণ-দেবতা ও ভাগ্য-দেবতা, এই দুজনেরই আশীর্বাদে আমি পুষ্ট···।" একি কথা নেপোলিয়নের মুখে! যিনি নিজেকে বিপ্লবের সন্তান ('Child of Revolution') বলে জাহির করেন, তিনি কিনা বলছেন তাঁর দুদিকে দুজন দেবতা—একজন ভাগ্যের, আরেকজন যুদ্ধের! অর্থাৎ যা চাইছি, ভালোয় ভালোয় দাও তো দাও, নইলে গোলা ছুঁড়বো, বেয়নেটে গাঁথবো···!

নেপোলিয়নের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোন যুদ্ধ-অভিযানে যাওয়ার আগে সৈন্যদের সামনে একটা মেঠো বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং সে বক্তৃতা জোলো দম্ভে ভরা। মানুষ যখন অসহায় বোধ করে, তখনই তো সে মুখে আস্ফালন করে আর বলে···আমার এই আছে, সেই আছে। আমার কথা মেনে চল···নইলে কপালে দুঃখ আছে···ইত্যাদি।

প্রাচীনদের সভার সদস্যদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল—নেপোলিয়নের এ কী অগোছালো কথাবার্তা! এই লোকটি ওপর দেশের ভাগ্য জয় করবার দায়িত্ব দিলে সে তো একদিনে তছনছ হয়ে যাবে।

একজন নেপোলিয়নের কানের কাছে এসে বললেন, "সেনাপতি, আপনি কি বলছেন আপনি বুঝতে পারছেন না…আপনি এখন চলে যান… ।"

গোটা পরিস্থিতিটা যে গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে নেপোলিয়ন এটা অন্ততঃ বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু বুঝলে কি হবে, তিনি যেন বাক্-সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় আবার বলে উঠলেন, "আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা কমিটি করে ফেলুন…"নেপোলিয়ন বেরিয়ে গেলেন।

অতএব নেপোলিয়ন প্রাচীনের সভায় বাজিমাৎ করতে পারলেন না। এবার চেষ্টা করলেন যাতে পাঁচশ' সদস্যের সমর্থন পাওয়া যায়। বিশেষ করে ভাই লুসিয়েন যখন সেই সমিতির সভাপতি, তখন একটু ভরসা আছে বই কি।

কিন্তু সেখানেও যে ইতিমধ্যে সকল সদস্যরা জেকোবিন পার্টির চালু শাসননীতির ওপর পূর্ণ আস্থা জানিয়ে নেপোলিয়নের অবস্থা সঙ্গীন করে তুলেছেন এটা তিনি আগে বুঝতে পারেননি। নেপোলিয়ন সভা-গৃহে ঢুকে লক্ষ্য করলেন সদস্যরা গম্ভীর মুখ নিয়ে বসে আছেন। একজন এসে নেপোলিয়নের হাত ধরে বললেন, "কোন্ সাহসে আপনি এখানে ঢুকেছেন। শিগ্‌গীর বেরিয়ে যান। আপনি পবিত্র আইন, নীতি লঙ্ঘন করেছেন… ।"

চারদিক থেকে গর্জন শোনা গেল, "ঐ স্বেচ্ছাচারীটাকে বার করে দাও… ।"

লুসিয়েন তাঁর আসন থেকে কী একটা বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেছে। নেপোলিয়ন নার্ভাস হয়ে পড়লেন। মুখ শুকিয়ে পাংশু হল। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। সদস্যরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। বেরিয়ে যাবার পথও আটকে দেওয়া হয়েছে। ভাগ্য ভালো যে নেপোলিয়নের অনুগত সৈন্য এসে বিপজ্জনক বেষ্টনী থেকে

নেপোলিয়নকে বার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হল। তবে নেপোলিয়ন একেবারে অক্ষত রইলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় কে বা কারা নেপোলিয়নের মুখ নখ দিয়ে চিরে দিল। মুখে রক্ত ফুটে উঠল।

ওদিকে লুসিয়েন সদস্যদের ক্রমাগত বোঝাতে লাগলেন যে, নেপোলিয়ন এই ঘরে ঢুকেছিলেন তাঁর প্রতি সভার সদস্যদের পূর্ণ সমর্থন আছে কিনা তাই জানবার জন্য। এর মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার তো কিছু ছিল না…।

"ছিল বই কি…" সদস্যরা চেঁচিয়ে উঠল…"নেপোলিয়নের কথাবার্তা, আচার আচরণ সবই তো রাজার মতো! নেপোলিয়ন একনায়কত্ব স্থাপন করতে চাইছেন…ও চলবে না…চোর তাড়িয়ে ডাকাতের পত্তন হতে দেবো না…।"

লুসিয়েন সভাপতি হিসেবে সদস্যদের বোঝাবার অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হল। সদস্যদের এক কথা, নেপোলিয়নের কথা-বার্তায় নাকি বেশ স্বেচ্ছাচারিতা ফুটে বেরুচ্ছে। এমন লোককে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। অর্থাৎ কয়েকজন বিরোধী লোক নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সবাইকে তাতিয়ে তুলেছে।

লুসিয়েন নেপোলিয়নের কাছে খবর পাঠালেন, "তৈরী হও ‥।"

নেপোলিয়ন তৈরী হলেন অর্থাৎ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। সৈনিকদের সম্বোধন করে বললেন, "আমার প্রিয় সৈনিকগণ, প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে তোমাদের নিয়ে আমি তুলোঁ, ইটালী, মিশর ও সমুদ্র বক্ষে জয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছি, আর এখন কিনা তুচ্ছ একদল খুনীর কাছে পরাজয় স্বীকার করবে! বল, আমার বীর সৈনিকেরা, আমি কি এই ব্যাপারে তোমাদের কাছে কিছু আশা করতে পারি না! বল…তোমরা বল," আবেগে উত্তেজনায় নেপোলিয়নের মুখে যেন রক্ত ফেটে পড়ল। তবে কাজ হল। সশস্ত্র সৈনিকরা একযোগে বলে উঠল, "নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দীর্ঘজীবী হোন।"

নাটকের চূড়ান্ত শীর্ষে অভিনয় করলেন লুসিয়েন স্বয়ং। তিনি খাঁ করে খাপ থেকে নিজের তরবারিখানা খুলে ফেললেন। যে-কোন

নিখুঁত কৃতী নায়কের মতোই লুসিয়েন তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করলেন নেপোলিয়নের বক্ষদেশ। তারপর চিৎকার করে বললেন, "আমি শপথ নিচ্ছি আমার ভাই যদি কোন ফরাসী দেশবাসীর অধিকার এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে, তাহলে এই তরবারি তাঁর বক্ষোদেশ ভেদ করে চলে যাবে···।"

সৈন্যবাহিনী চঞ্চল হল। তাদের প্রিয় সেনাপতিকে তারা কোন কাজে হঠে যেতে দেবে না। তারা মারমুখী হয়ে রুখে দাঁড়াল পাঁচশ' সদস্যের সভার বিরুদ্ধে। কয়েকজন সদস্য উচ্চকণ্ঠে বললেন, "আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেব, সবাই এসো···।"

আর সবাই এসো···! নেপোলিয়নের পেছন পেছন ঐ সশস্ত্র মারমুখী সেনাবাহিনী দেখে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। পাঁচশ' সদস্যের সভায় যারা উপস্থিত ছিল তারা ছিটকে পালিয়ে গেল। কেউ গেল দরজা দিয়ে, কেউ বা গেল জানলা গলে বাইরে লাফ মেরে। সত্যিই, ভাগ্যদেবতা নেপোলিয়নের পাশে ছিলেন।

নেপোলিয়ন পুরোপুরি সফল হলেন। ডিরেক্টরী সভার পতন ঘটাতে নেপোলিয়নের 'ক্যু দ্য তে' সম্পূর্ণভাবে জয়যুক্ত হল। সমর-নায়ক নেপোলিয়ন ফ্রান্সের শাসন-ইতিহাসে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটালেন। এই বিপ্লবে বিস্ময়কর ঘটনা এই যে অস্ত্রে-অস্ত্রে সংঘর্ষ হল না, রক্তপাত হল না। কোন কিছু ধ্বংস হল না। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ৯ এবং ১০ তারিখ, এই দুদিনের ঘটনায় ফ্রান্সের ইতিহাস এক নতুন পথ ধরে চলতে শুরু করল।

আসল কাজ আরম্ভ হল এখন থেকে। নেপোলিয়ন প্রধানতঃ সিয়ের সাহায্য নিয়ে ফ্রান্সের শাসননীতি পুনর্গঠন করতে চাইলেন। অবশ্য দুজনের মধ্যে এই ব্যাপারে বাদানুবাদও যথেষ্ট হল। শেষ পর্যন্ত তিনজন কন্সাল বা শাসনকর্তাকে নিয়ে একটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা কর্মপরিষদ গঠিত হল। ঠিক হল কন্সাল তিন জন দশ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। দশ বছর কেটে গেলে কন্সালরা পুন-র্নির্বাচনের জন্য দাঁড়াতে পারবেন। প্রথম কন্সাল হলেন নেপোলিয়ন

বোনাপার্ট। প্রথম কন্সালকে মন্ত্রী ও বিচারক নিয়োগ করার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হল। উপরন্তু প্রথম কন্সালই শাসন বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার অধিকারী হলেন। আর দুজন কন্সাল হলেন তাঁর উপদেষ্টা। তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটা আইন পরিষদ গঠিত হল। আইন প্রণয়ন করবার জন্য হল কাউন্সিল অব স্টেট, আইন আলোচনা করবার জন্য তৈরী করা হল এক শ সদস্য-বিশিষ্ট একটি ট্রিবিউনেট, আরেকটি হল লেজিসলেটিভ বডি। যার সদস্য সংখ্যা হল তিন শ, যে তিন শ জন সদস্য গোপন ভোটপত্র বা ব্যালটের সাহায্যে যে-কোন আইন গ্রহণ বা বর্জন করবার অধিকারী হলেন। একটা সেনেট সভা গঠিত হল। তার সদস্য সংখ্যা আশি পর্যন্ত উঠতে পারবে বলে স্থির হল। প্রত্যেক সদস্যের ন্যূনতম বয়স স্থির হল চল্লিশ। সেনেটরদের মধ্যে প্রথম দিকে যাঁরা আসবেন, তাঁদের নিযুক্ত করবেন প্রথম কন্সাল। এঁরা এসে অন্যান্য সদস্যদের নির্বাচিত করবেন। শাসন-ক্ষমতা পরিচালনার ব্যাপারে এই সেনেটররা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেন। কেননা কালক্রমে এঁদের হাতেই কন্সাল, ট্রিবিউনেটের সদস্য, আইন পরিষদের সদস্য—এমন কি সুপ্রীম কোর্টের নির্বাচনের অধিকার পর্যন্ত ন্যস্ত হল।

সিয়ের নির্দেশে ফ্রান্সের সর্বক্ষেত্র থেকে সেনেটের সভ্য নির্বাচন করা হল, ফলে সেনেট কোন একটা বিশেষ দল বা বিশেষ একটি মতবাদ গড়ে উঠতে পারল না, এবং এজন্য সেনেটের দৃষ্টিভঙ্গী গোঁড়ামিকে আশ্রয় না করে উদার ও সহিষ্ণু হবার সুযোগ পেল।

প্রথম কন্সাল বা শাসক প্রধান নেপোলিয়ন খুব ভেবে-চিন্তে তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্সাল নিযুক্ত করলেন। দ্বিতীয় কন্সাল হলেন জাঁ জ্যাঁক ক্যাম্বাসেরিস আইনের ব্যাপারে ঘুণ, অতি বুদ্ধিমান লোক। তৃতীয় কন্সাল পদে এলেন লেব্রাম, একজন পাকা অর্থনীতিবিদ। কর্মক্ষম, উপযুক্ত লোক বেছে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল নেপোলিয়নের। আর এই কারণেই তাঁর শাসন ও গঠন-কর্মজীবনে অতখানি সাফল্য দেখা গিয়েছিল।

নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষিত হল ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর। গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার দৃঢ় পরিচয় পাওয়া গেল নতুন শাসনরীতিতে। প্রথম কন্সাল নেপোলিয়নের ইউনিফর্ম হল লাল ভেলভেটের ওপর সোনালী কাজকরা ডব্‌ল্ ব্রেস্টের পোশাক। আর দুজন কন্সালের ঐ একই ধরনের ইউনিফর্ম, তবে রং আলাদা। নীল ভেলভেটের ওপর সোনালী কাজ করা।

রেপাবলিক যুগ শেষ হল। এল বা এক-নায়কতন্ত্রের যুগ, আর সেই একমাত্র নায়কের নাম হল নেপোলিয়ন—প্রজারঞ্জনকারী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নেপোলিয়ন। তদানীন্তন ফ্রান্সের হাল ধরবার উপযুক্ত নায়ক নেপোলিয়ন। নেপোলিয়নের সামনে এবার টানা সাফল্যের সিঁড়ি উঠে গেল। বয়স তখন ত্রিশ ছাড়িয়ে মাত্র কয়েক মাস।

প্রথম কন্সাল নেপোলিয়ন তাঁর শাসক-জীবন শুরু করলেন। এই কাজে আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়ল জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও শুভেচ্ছা। ফরাসী জনসাধারণ অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে তাকাল তাদের প্রিয় তরুণ জননায়কের দিকে। প্রথম কন্সালের বাসস্থান হল ট্যুইলারীর রাজপ্রসাদ।

নেপোলিয়নের চেহারাটা কি একটু পালটে গেছে! একটু পালটেছে বই কি। কিছুদিন আগেও নেপোলিয়নের চেহারা ছিল রোগাটে, ছিপছিপে। সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার সঙ্গে, যাই হোক, খারাপ লাগতো না। কিন্তু ত্রিশের ওপর গিয়েই চেহারাটা বেশ ভারিক্কি গোছের হয়ে গেল। নেপোলিয়নের বুক ছিল চওড়া পেটানো। মনে হতো তাঁর অস্বাভাবিক কর্মদ্যোমের প্রধান উৎস ছিল বুঝি ঐ প্রশস্ত বুক। নেপোলিয়নের কাঁধ দুটিও ছিল বেশ প্রশস্ত। দেখে শুনে মনে বেশ একটা ভীতিমিশ্রিত সমীহভাব জেগে উঠত। কিন্তু অন্যদিকে একটা ত্রুটি ছিল, তাঁর গোটা শরীরটার মধ্যে আবার কেমন যেন ঢিলেঢালে ভাব ছিল। কাঁধ বুক চওড়া হলেও অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেশীবহুল ছিল না। এই ঢিলে ভাবটা যেন বড় বেশী চোখে পড়ত

নিম্নাঙ্গে অর্থাৎ হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত। শোনা যায়, শরীরের ওপরের অংশ ও নীচের অংশের মধ্যে এই বেসামালটুকুর জন্যই নাকি নেপোলিয়ন যখন ঘোড়ার পিঠে চাপতেন, তখন দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে বসতেন। ঝুঁকে বসার আরেকটি কারণ নেপোলিয়নের মাথা ও কাঁধের মাঝখানে ঘাড় ছিল খুব ছোট। মাঝে মাঝে মনে হত ঘাড় বলে কিছু নেই। নেপোলিয়নের হাত দুখানা ছিল ফর্সা, নরম, মেয়েলি। ঐ হাতে যে তিনি কী করে অত গোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতেন, কে জানে।

নেপোলিয়নের গায়ের চামড়া ছিল সতেজ টান, আবার অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একটু বেশী শীত পড়লেই অত সুন্দর ফর্সা চামড়া কুঁচকে যেত। তাই শীত পড়ামাত্র নেপোলিয়ন কাঠ জ্বালিয়ে আগুন পোহাতেন। আগুন পোহাতে ভালোবাসতেন। অল্পবয়সে ছাত্রজীবনে নেপোলিয়ন ছিলেন মুখচোরা, লাজুক। বড় হয়ে সেই নেপোলিয়ন হয়েছিলেন অনেক চটপটে, অনেক বলিয়ে-কইয়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখখানা হল বুদ্ধিদীপ্ত। সেই মুখের ওপর চোখদুটি ছিল শাণিত, তার সঙ্গে মানানসই তীক্ষ্ণ টিকলো নাক, একটু চাপা ঠোঁট, লম্বাটে চোয়াল, সুগোল চিবুক।

নেপোলিয়ন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাই যেসব ঘরে তিনি বসতেন, খেতেন, শুতেন সে সব ঘর সদাসর্বদা একেবারে ছিমছাম্, ফিটফাট করে রাখা হত। বিশেষ করে সে সব ঘরে বা ঘরের আশে পাশে যেন কোন খারাপ গন্ধ না থাকে, এই বিষয়ে নেপোলিয়নের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ছিল অত্যন্ত সচেতন, সজাগ। এর জন্য নেপোলিয়ন মাঝে মাঝেই ঘরের মধ্যে সুগন্ধি কাঠ জ্বালিয়ে রাখতেন।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও নেপোলিয়ন রুচি ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন। শরীরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য এমনিতে বেশ ভালোই ছিল, তবে মাঝে মাঝে অসুখে ভুগতেন বই কি।

নেপোলিয়ন ও তাঁর স্ত্রী জোসেফাইনের শয্যাগৃহ ছিল ট্যুইলারী

প্রাসাদের এক তলায়। প্রশস্ত ঘর। প্রচুর আলো, হাওয়া আর তার সঙ্গে আভিজাত্য। মেহগনি কাঠের ডবল খাটে স্বামী-স্ত্রীর জন্য প্রশস্ত, নরম শয্যা বিছানো থাকত। গোটা ঘরটিতে তার প্রতিটি জিনিসপত্রে ছিল জোসেফাইনের সৌন্দর্য-রুচির ছাপ। সমস্ত দিন এবং রাতের অনেকটা পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রমের পর এই ঘরটিতে এসে নেপোলিয়নের মন শান্তির আনন্দে ভরে উঠত।

ভোর ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে নেপোলিয়নের দৈনন্দিন কাজ শুরু হত। তাঁর একান্ত ভৃত্য কনস্ট্যাণ্ট প্রভুকে ঘুম থেকে ডেকে তুলত। শয্যা ত্যাগ করে নেপোলিয়ন ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপাতেন। পায়ে গলিয়ে নিতেন মরক্কো লেদারের চটি। তারপর যেতেন একান্ত নিজের বিশ্রাম-ঘরটিতে। সেখানে এক কাপ চা নিয়ে আগুনের সামনে খানিকক্ষণ বসতেন। চিঠিপত্র পড়তেন। খবরের কাগজে চোখ বুলোতেন। এরপর যেতেন স্নান-ঘরে। সেখানে নিতেন টার্কিশ বাথ বা স্টিম বাথ, বাষ্প-স্নান। এই স্নানে নেপোলিয়ন এক ঘণ্টার ওপর সময় দিতেন। এই ধরনের স্নান নেপোলিয়নের শরীর-মনকে সতেজ ঝরঝরে করে দিত। সারাদিনের কাজের উৎসাহ দিত। নেপোলিয়ন স্টিম বাথ নিতেন আর কনস্ট্যাণ্ট খবরের কাগজ পড়ে পড়ে রাজ্যের সংবাদ নেপোলিয়নকে জানাত। স্নানের পর নেপোলিয়ন গায়ে ফ্লানেলের জামা দিতেন। ট্রাউজার পরে তার ওপর আবার ড্রেসিং গাউন চাপাতেন। তারপর দাড়ি কামাতেন। কোন নাপিত নয়, নিজের হাতে দাড়ি কামানো নেপোলিয়নের অন্যতম শখ ছিল। দাড়ি কামানোর সময় ভৃত্য রুস্তম সামনে আর্শি ধরে থাকত। কামানো হয়ে গেলে নেপোলিয়ন রোজই তাঁর এই দুই প্রিয় ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করতেন, "দেখদেখি দাড়ি কামানো কেমন হয়েছে⋯!" এরপর নেপোলিয়ন হাতে বেশ করে বাদাম বাটা মেখে হাত ধুতেন, সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন মুখঘাড় আর কান। তারপর ভালো করে দাঁত মাজতেন। ব্রাণ্ডি মেশানো বেশ খানিকটা জল নিয়ে খুব করে মুখে কুলকুচো করতেন।

নেপোলিয়ন সপ্তাহে একদিন চুল কাটতেন। প্রথম দিকে লম্বা চুল ছিল। তারপর ছোট ছোট করে চুল ছাঁটতেন। পোশাক পরবার আগে নেপোলিয়ন সারা গায়ে আর মাথায় আচ্ছা করে ও'-ডি-কোলন ঢালতেন। তারপর হাত, কাঁধ, বুক, পিঠ সব কনস্ট্যাণ্টের সাহায্যে কয়েকবার ব্রাশ করতেন এবং পোশাক পরতেন। নেপোলিয়ন ছেলে-বেলায় মা ল্যাটিজিয়ার কড়াক্রান্তি হিসেবের মধ্যে মানুষ হয়ে ছিলেন। সেই হিসেব নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত জীবনেও ঢুকে গিয়েছিল। নিজের পোশাক সম্বন্ধে বিলাসিতা দূরের কথা, নেপোলিয়ন, বলতে গেলে বেশ খানিকটা কার্পণ্যই দেখাতেন। পোশাক-আসাক ছিঁড়েছুঁড়ে গেলে সেলাই করিয়ে নিয়ে আবার সেটা গায়ে চাপাতে এতটুকু ইতস্তত করতেন না।

ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই নেপোলিয়নের কাজ আরম্ভ হত। কনস্ট্যাণ্ট ও'-ডি-কোলনে ভেজানো একটা রুমাল প্রভুর হাতে তুলে দিত। নেপোলিয়ন সুগন্ধি রুমালটা নিয়ে জামার ডান পকেট রাখতেন। আর বাঁ পকেটে রাখতেন একটা সস্তা দামের নস্যির কৌটো। ঐ কৌটো ভর্তি থাকত কড়া-তামাক। মাঝে মাঝে এক টিপ্ করে নাকের মধ্যে ঠেলে দিতেন। প্রায়ই খেতেন মৌরীর গন্ধ মেশানো মধু। নেপোলিয়ন বলতেন ঐ যে একটু কড়া তামাক আর একটু করে মধু, এতে নাকি শরীর, মন ভালো থাকে। এই দুইয়ে মিলে সঞ্জীবনী সুধার কাজ করে।

বেলা এগারোটায় ছিল লাঞ্চের সময় আর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ছিল ডিনার। লাঞ্চটা কাজের ফাঁকে একটা ছোট টেবিলে নেপো-লিয়কে একাই সারতে হতো। তবে ডিনারটা খেতেন জোসেফাইন ও দু-চারজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে। খাওয়ার মেনু ছিল একেবারে সাদা-মাঠা। ডালের স্যুপ, সাদা বিন আলু দিয়ে সুসিদ্ধমাংস আর সামান্য অন্য কিছু। রান্না তরকারী বা মাংস ভালো সেদ্ধ না হলে অসন্তুষ্ট হতেন। মুরগী পছন্দ করতেন খুব। বিশেষ করে চিকেন রোস্ট। রসুন একেবারে বাদ। গন্ধটা ভালো না। নেপোলিয়ন যে আবার

সদা সর্বদা সুগন্ধি রুমাল নিয়ে ঘোরেন। মদের ওপর নেপোলিয়নের আসক্তি ছিল, তবে সীমিত। বেশী পছন্দ করতেন লাল রং-এর বার্গাণ্ডি, একটু জলের সঙ্গে মিশিয়ে। সব শেষে ছোট কাপের এক কাপ ব্ল্যাক কফি, একেবারে র কফি। খাওয়া সারতেন মিনিট কুড়ির মধ্যে। কোনদিন একটু দেরি হয়ে গেলে মন্তব্য করতেন, "কাজ-কর্ম দেখছি সব নষ্ট হতে বসেছে···।"

নেপোলিয়ন মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠতেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্য রসিক। কিন্তু নিজে যখন গাইতেন তখন সে গান হত বেসুরো বেখাপ্পা। নেপোলিয়ন প্রায়ই গাইতেন—

Ah ! C'en est 'fait·je me marie ;
Non, non. z'il est impossible
D'avoir un plus aimable enfant.

হো, হো—আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু তার (স্ত্রী) কাছ থেকে আরও সুন্দর সুন্দর সন্তান পেতে পারি না, এ অসম্ভব।

গানের শব্দটির অর্থ আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন অর্থহীন, অসঙ্গত। এটা কি কোন খেদ!

ইতালীয় উচ্চারণের প্রভাব এসে যেত ফরাসী ভাষার গানে। তা হোক, গান গাইতেন খুব আন্তরিক ভাবে। ভৃত্য কনস্ট্যাণ্টের খুব ভালো লাগত। ভালো লাগত এই ভেবে যে প্রভুর মন মর্জি তাহলে বেশ ভালো আছে, হয়তো বা কপালগুণে প্রভুর একটু আদরও জুটে যেতে পারে। আদর মানে প্রভু কানের লতি ধরে একটু টানবেন কিংবা গালের ওপর আলতো করে একটা ঠোনা মারবেন। প্রভু ভৃত্যদের বড়ো ভালোবাসতেন। প্রভুর গান যেদিন যত বেসুরো, ভৃত্যদের সেদিন তত উল্লাস।

তবে প্রভুর রেগে যেতেই বা কতক্ষণ। যে কোন কাজে, সে রাজ-প্রাসাদেই হোক, আর সরকারী ভবনেই হোক, এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে নেপোলিয়নের মাথায় ঝট্ করে রক্ত চড়ে যেত। এই রাগ মাঝে মাঝে এত সামান্য কারণে হত যে, পরে নেপোলিয়নের সঙ্গী-

সাথী কর্মচারীদের মধ্যে বেশ খানিকটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে কতবার যে তিনি রেগে গিয়ে সেনাপতিদের মুখে আঘাত করেছেন ঠিক নেই।

সারাদিনের কাজকর্ম সেরে নেপোলিয়ন প্রায়ই থিয়েটার দেখতে যেতেন। কমেডির চাইতে ট্র্যাজেডি নাটক বেশী ভালোবাসতেন। বলতেন—"The hero must die" নায়ককে মরতেই হবে। নইলে সে হৃদয়ে দাগ কাটে না। তবে যত ভালো নাটকই হোক না কেন, নেপোলিয়ন কোন বই-ই পুরো দেখতেন না। খানিকটা হতে না হতে উঠে আসতেন। যে বইগুলো অভিনীত হতো সেগুলো তো সবই পড়া!

নেপোলিয়ন যতদূর পারতেন তাঁর কাজ, শোওয়া, খাওয়া, সবই কড়া নিয়মে বেঁধে রাখতেন। সন্ধ্যের পর বাড়িতে অতিথিরা এলে গল্প করতে গিয়ে তাঁরা যদি একটু বেশী রাত করে ফেলতেন, নেপোলিয়ন হ্যাম্ করে জোসেফাইনকে বলে উঠতেন, "চল, শুয়ে পড়িগে···" শোবার আগে নেপোলিয়ন দিনের পোশাক ছেড়ে রাতের পোশাক পরতেন। একটা বড় রুমাল দিয়ে মাথা ঢেকে বেঁধে ফেলতেন। শোবার পর ঘরের বাতি এবং আশে পাশের বারান্দা, করিডর সব জায়গার বাতি নিভিয়ে দেওয়া হত। ঘুমোবার সময় আলোর এতটুকু রেখা পর্যন্ত নেপোলিয়ন সহ্য করতে পারতেন না। এমনিতে তিনি ঘুমোতেন সাত-আট ঘণ্টা। আবার যখন কাজের চাপ পড়ত তখন সামান্য ঘুমিয়ে বা একেবারে না ঘুমিয়েও রাত কাটিয়ে দিতেন। এতটুকু ক্লান্তিবোধ করতে না। সব চাইতে মজার ব্যাপার ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন দমাদ্দম গোলাগুলি ফাটছে, তখন যদি নেপোলিয়ন একবার মনে করতেন যে একটু ঘুমিয়ে নেবেন তো তিনি ঘুমোতেন। সে কয়েক মিনিটই হোক, আর এক-দুই ঘণ্টাই হোক। নেপোলিয়নের নামে তো রটনা আছেই যে তিনি ঘোড়ার পিঠে বসে থেকেই একটু ঘুমিয়ে নিতেন, কোন অসুবিধে হত না। আসলে দেখা যাচ্ছে নেপোলিয়ন যে-কোন পরিস্থিতিতেই মনঃসংযোগ করতে পারতেন খুব তাড়াতাড়ি।

নেপোলিয়নের দাম্পত্যজীবন এখন বেশ সুখের হয়ে উঠেছিল। জোসেফাইনের নরম কোমল কথাবার্তা, মিষ্টি ব্যবহার নেপোলিয়নের মন-প্রাণ ভরিয়ে দিত। জোসেফাইনের ছোট্ট পাখির মতো শরীরটাকে নিয়ে নেপোলিয়নের আদরের সীমা পরিসীমা থাকত না। মাঝে মাঝে এমন জোরে জোসেফাইনকে কাছে টেনে নিতেন যে জোসেফাইনের চোখে জল এসে যেত। তবে কোন প্রতিবাদই জোসেফাইন করতেন না। ভালোবাসার এই আদিম উচ্ছ্বাস নিশ্চয়ই জোসেফাইনের সূক্ষ্ম-রুচিতে আঘাত দিত, তবু জোসেফাইন স্বামীর আদর সহ্য করতেন। ফরাসী রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা প্রথম কন্সাল নেপোলিয়নের আদর ফেল্না নয়, তা যতই কেন না আদরের যন্ত্রণায় চোখে জল আসুক। তবে স্বামীর প্রতি জোসেফাইনের মন বর্তমানে আন্তরিকভাবেই প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। কারণ ইদানীং নেপোলিয়ন জোসেফাইনের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে খুব সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন। স্ত্রীর কি পছন্দ, কোন রং পছন্দ, নেপোলিয়ন এখন জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জোসেফাইনের মন খুশিতে ভরে ওঠে। নেপোলিয়নের সত্যিই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিয়ের পর জোসেফাইন দেখেছেন নেপোলিয়ন বিমর্ষ, চুপচাপ। স্ত্রীর উচ্ছলতা সেখানে কোন ঠাঁই পায়নি। স্ত্রীর পোশাক নিয়ে, তাঁর সাজসজ্জা নিয়ে স্বামীর কোন ঔৎসুক্য নেই, কিছু নেই। দেহে ছোট, গোমড়া-মুখো লোকটিকে সেদিন ঐ জন্যই জোসেফাইন পছন্দ করতে পারেননি। কিন্তু এখন? এখন তো নেপোলিয়ন বেশ হাসি-খুশি! জোসেফাইন সম্বন্ধে কৌতূহলী। এই না হলে আবার দাম্পত্য জীবন কি! তবে, তবে নেপোলিয়নের শরীরটি যদি আরেকটু মানানসই হত! স্বভাবে তো নেপোলিয়ন পুরুষ-সিংহ! দেহটা কেন সেই তুলনায় এমন খর্ব! গোটা শরীরটাতে কোন ভারসাম্য নেই। যুদ্ধ পরিচালনা এক কথা। দাম্পত্যজীবনের মন্ত্র যে আবার আলাদা! জোসেফাইনের জীবনে হিপ্পোলাইটের আবির্ভাব হয়েছিল কি এই কারণেই? ঐ জন্যেই কি জোসেফাইনের সঙ্গে তার অত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল! তবে এখন আর নেপোলিয়নের

সঙ্গে জোসেফাইনের কোন প্রতারণা নেই, মিথ্যাচার নেই। এখন নেপোলিয়নই জোসেফাইনের একমাত্র প্রাণেশ্বর। কারণ নেপোলিয়ন এখন ফ্রান্সের ক্ষমতাবান প্রথম কন্সাল। তাই নেপোলিয়ন যখন একদিন জোসেফাইনকে অতি স্বচ্ছ পোশাক পরতে দেখে ভ্রু কুঁচকে ছিলেন, জোসেফাইন তাড়াতাড়ি সেই পোশাক পাল্‌টে নিলেন। জোসেফাইন ছিলেন ফ্যাসান লেডী! তাঁর ছিল নিত্যিনোতুন সাজের রীতি, পোশাক পরার, চুল বাঁধবার কায়দা। আর নেপোলিয়নও সেই কায়দা এখন একটু আধটু তারিফ করেন। পছন্দ-অপছন্দের কথা বলেন। কিন্তু আগে! সেই জায়গায় হিপ্পোলাইট চার্লস! কী উচ্ছ্বাস, কী প্রাণবন্ত! জোসেফাইনের স্বভাবের সঙ্গে পুরো খাপ খেয়ে গিয়েছিল। যাক গে, এখন আর কোন পুরুষ নয়। প্রকাশ্যে তো নয়ই। এখন শুধু স্বামী নেপোলিয়ন, ফরাসী রাজ্যের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। জোসেফাইনের হাত ছিল বড় খরচে। নেপোলিয়ন এটা পছন্দ করতেন না। মাঝে মাঝে বকাঝকাও হয়েছে কম নয়। যতই যাই হোক না কেন, দুজনের যতই উলটো স্বভাব হোক, বর্তমানে নেপোলিয়ন-জোসেফাইনের দাম্পত্য জীবন ভালোই চলছিল।

নেপোলিয়নের বুকের মধ্যে একটা দুঃখবোধ প্রায়ই গুমরে ওঠে। জোসেফাইনের গর্ভে তাঁর কোন সন্তান আসেনি। কেন? পিতৃত্বের সাধ কোন্ পুরুষের না আছে! বিশেষ করে নেপোলিয়ন যে পারিবারিক জীবনকে বড়ো ভালোবাসেন। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, জোসেফাইন কখনই নেপোলিয়নের সন্তান গর্ভ ধারণ করেননি। তবে শোনা যায়, জোসেফাইন নাকি একবার বারান্দা ভেঙে পনেরো ফুট নীচে পড়ে যান এবং তখন তাঁর দেহের অভ্যন্তর ভাগ আহত হয়। ডাক্তার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন জোসেফাইন বোধহয় জীবনে আর সন্তান ধারণ করতে পারবেন না। জোসেফাইন মাঝে মাঝেই কষ্ট পেতেন প্রচণ্ড মাথা ধরায়। ডাক্তারের দেওয়া বড়ি খেয়ে খানিকটা আরাম হত। নেপোলিয়ন তখন বলতেন, "যাও গাড়ি করে বাইরে খোলা হাওয়ায় অনেকটা বেড়িয়ে এসো, মাথা ব্যথা সেরে যাবে...।"

যে ঘরটিতে বসে নেপোলিয়ন রাজ্যশাসনের যাবতীয় নির্দেশ দিতেন ট্যুইলারী প্রাসাদের সে ঘরটা থেকে বাগান আর সিয়েন নদীর অনেকটা অংশ দেখা যেত। এই ঘরটিতে নেপোলিয়ন এবং তাঁর সেক্রেটারী ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। ঘরের মাঝখানে মেহগনি কাঠের বিরাট একটা টেবিল ছিল। তবে সাধারণতঃ নেপোলিয়ন ঘরের মধ্যে এধার থেকে ওধারে পায়চারি করতে করতে মুখে মুখে কাজের নির্দেশ দিতেন। কখনও বা আগুনের কাছে একটা সেটিতে বসে নিতেন। সেক্রেটারী দ্রুতগতিতে নেপোলিয়নের নির্দেশ লিখে ফেলতেন। নেপোলিয়নের বলা শেষ হলে সেক্রেটারী তার প্রতিলিপি করে নেপোলিয়নকে দেখাতেন। নেপোলিয়ন তখন আবার ঐটা পড়ে নিতেন। মাঝে মাঝে কালি দিয়ে সংশোধন করে দিতেন। নেপোলিয়নের হাতের লেখা অপরের অবোধ্য ছিল। তাই সহজে তিনি লেখার দিকে যেতেন না। বলতে গিয়েও যে সব সময় ঠিক উচ্চারণে সব কথা বলতেন, তাও না। সেক্রেটারী তাঁর অভিজ্ঞতার বলে সব ঠিক করে নিতেন। এই সময় নেপোলিয়ন সব প্রয়োজনীয় চিঠির উত্তর দিতেন। বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীদের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যবিবরণীর ওপর নিজের মন্তব্য পেশ করতেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন, আয়-ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা করতেন। বৈদেশিক দূতদের যথাযথ নির্দেশ দিতেন। সেনাবাহিনীর তত্ত্ব-তালাশ করতেন। এবং আরও যে কত কাজ করতেন, তা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে নেপোলিয়ন নামক ব্যক্তিটির দৈহিক হ্রস্বতা মিলিয়ে গিয়ে তার বদলে জেগে ওঠে একটা বিরাট, মহৎ মনের চেহারা, যেখানে এক বিরাট কর্মযজ্ঞের ধুনি জ্বলে উঠেছিল, যে-মন কেবল প্রজারঞ্জনের উদ্দেশ্যে চিন্তা করত। দিনের মধ্যে আট দশ ঘণ্টা শুধু এই কাজেই মন নিয়োজিত থাকত।

এর ওপর ছিল প্রাসাদে কাউন্সিল-চেম্বারে বা সভাগৃহে কাউন্সিল অব স্টেটের অধিবেশন। সাধারণতঃ বেলা দশটায় এই সভার অধিবেশন বসত। প্রতিদিন নয়। সপ্তাহে দুই বা তিন দিন। নেপোলিয়ন একটা চেয়ারে বসতেন। তাঁর দু-পাশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্সাল।

সামনে কাউন্সিলের সদস্যরা সব। জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে সদস্যরা আসতেন। নেপোলিয়ন তাঁদের সঙ্গে নানাবিষয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করতেন। কোন নতুন কর্মসূচী বা নতুন নিয়মনীতি চালু করতে গিয়ে তার ভালো মন্দ সব কিছু নিয়ে সভ্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। জিজ্ঞেস করতেন এর আগে অন্য কোথাও এমন রীতি চালু হয়েছে কি না এবং হলে কতদূর ফলপ্রদ হয়েছে। সাত-আট ঘণ্টা ধরে এই আলোচনা-সভা চলত। মাঝখানে শুধু বিশ মিনিটের বিরতি। মাঝে মাঝে সমস্ত রাত ধরে এই সভার অধিবেশন হত। গভীর আলোচনার সময় প্রায়ই দেখা যেত নেপোলিয়ন একমনে খাতার পাতায় কি সব হিজিবিজি লিখে যাচ্ছেন। এক একবার দেখা যেত কাগজে একই কথা বার বার লিখেছেন। যেমন একবার দেখা গেল "ঈশ্বর আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি"···এই একটি লাইন অন্ততঃ দশবার লিখেছেন। আরেকবার দেখা গেল তিনি অন্ততঃ আটবার লিখেছেন, "তোমরা সবাই দুর্জন···।" হয়তো বা তখন কোন একটি বিষয় নিয়ে সভাগৃহে তুমুল তর্কাতর্কি চলছিল। সদস্যদের মতামত হয়তো নেপোলিয়নের মনঃপূত হয় নি··· সুতরাং···"তোমরা সবাই দুর্জন···।"

নেপোলিয়নের সরকারী কাজের মধ্যে কোন গাফিলতি ছিল না, ফাঁক ছিল না। একবার সারারাত ধরে অধিবেশন চলাকালীন কাউন্সিলের সদস্যদের কয়েকজনকে ঢুলতে দেখে নেপোলিয়ন মন্তব্য করেছিলেন, "নিজেদের একটু জাগিয়ে রাখুন। সবে তো রাত দুটো। মনে রাখবেন আমাদের পরিশ্রমের মজুরিটা পেতেই হবে···।"

নেপোলিয়নের কড়া নির্দেশে ফলপ্রদ কিছু করবার জন্যই সবাইকে কাজ করতে হত। শুধু নাম কা ওয়াস্তে কাজ নয়। প্রায়ই দেখা যেতো গভীর রাত, যখন সমস্ত রাজপ্রাসাদ নিঝুম, নিস্তব্ধ, গোটা দেশ ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন নেপোলিয়ন শয্যা ত্যাগ করে উঠে এসেছেন। সেক্রেটারীকে মুখে মুখে জরুরী নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন, সেক্রেটারী লিখে নিচ্ছেন। ক্লান্তি দূর করবার জন্য মাঝে মাঝে দুজনেই একটু সরবত খেয়ে নিচ্ছেন।

ব্যক্তিগত চিকিৎসক নেপোলিয়নকে সতর্ক করে দিলেন, "পরিশ্রমের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, শরীর ভেঙে পড়বে···"

নেপোলিয়ন হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "ষাঁড়কে যখন একবার লাঙলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তখন তাকে চাষ করতে দাও···।"

নেপোলিয়ন সত্যিই চাষ করেছিলেন এবং ফ্রান্সের জনজীবনে সোনা ফলিয়েছিলেন···।

নেপোলিয়নের এই অতিমানবিক কর্মকাণ্ড দেখে দেশে, দেশের বাইরে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছিল। একজন মন্তব্য করেছিলেন···"ঈশ্বর বোনাপার্টকে সৃষ্টি করলেন তারপর অবসর নিলেন···" উত্তরে আরেক জন বলেছিলেন, "ঈশ্বর যদি আর কিছুদিন আগে অবসর নিতেন···।"

প্রথম কন্সাল হিসেবে নেপোলিয়নের সর্বপ্রথম কর্তব্য পতনোন্মুখ দেশের সব কিছু আগে খতিয়ে দেখা, তারপর যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, তার প্রতিকার করা। যে-কোন সুদক্ষ শাসকের মতোই নেপোলিয়ন প্রথম নজর দিলেন দেশের আর্থিক টাল-মাটালের দিকে। বিপ্লবের পরে কিছুদিন অদম্য চেষ্টা করে যে অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়েছিল, সে সব তো চুলোয় গেছেই। উপরন্তু দেশময় দেখা গেল ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি। কাগুজে-টাকায় দেশ ভরে গেছে, অথচ লোকের চাকরি নেই। পেটে ভাত নেই। পরনে কাপড় নেই। চারিদিকে কেবল নেই, নেই, নেই।

নেপোলিয়ন নগদ টাকা যোগাড়ের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইচ্ছে থাকলে কী না হয়। জেনোয়া থেকে বিশ লক্ষ, ফরাসী ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে ত্রিশ লক্ষ আর লটারী করে নেপোলিয়ন যোগাড় করলেন নব্বই লক্ষ টাকা। যোগাড় বটে! কিন্তু শুধু টাকা হলেই হয় না। ভাল প্রশাসন চাই। নেপোলিয়ন আটশ' চল্লিশ জন কর্মচারী নিয়ে একটা বিশেষ কার্যসমিতি তৈরী করলেন। এই সমিতির অধীনে সদস্যদের মধ্যে প্রতি আট জনকে নিয়ে এক একটি কর্মদপ্তর হল। এই কর্মদপ্তরগুলির আসল উদ্দেশ্য হল আয়কর ধার্য করা এবং আদায় করা

কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হল তারা প্রত্যেকে যতটা আয়কর আদায় করবে বলে হিসেব করে নিয়েছে, প্রথমেই সেই ধার্য করের হিসেবের টাকা থেকে সরকার তহবিলে শতকরা পাঁচভাগ টাকা আগাম জমা দেবে। বাকি টাকাটা দেবে কর আদায় করবার পর।

এই নীতিতে নেপোলিয়ন যথেষ্ট সফল হলেন। আর্থিক সঙ্কট বেশ খানিকটা কাটিয়ে উঠলেন। আয়কর ছাড়া অন্যান্য জিনিসের ওপরেও ক্রমে কর বসানো হল। দেশের আয়ের পথ প্রশস্ত হল। আর্থিক দুর্গতির বিভীষিকা কেটে গিয়ে ফরাসী জীবনে শান্তি এল, স্বস্তি এল। নেপোলিয়ন কড়া আদেশ দিলেন, রাজ্যে টাকার সুরাহা হয়েছে বলেই যে বেহিসেবীর মতো খরচ করতে হবে, তা যেন কিছুতেই না হয়। সবদিক দেখে, দেশের ও দশের কথা ভেবে-চিন্তে তবে টাকায় হাত দেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন দুটো অফিস খুলে দিলেন। একটা মিনিস্ট্রি অব ফিনান্স্, আরেকটা ট্রেজারী। একটা বিভাগ কর আদায় করবে। আরেকটা বিভাগে আদায়কৃত কর জমা পড়বে। একটা বিভাগ এই চাই, সেই চাই বলে দাবী করবে, আরেকটা বিভাগ জানিয়ে দেবে ঐ টাকা আদায় হয়ে জমা পড়েছে। এখন বুঝে খরচ কর অর্থাৎ আয় বুঝে ব্যয় কর।

নেপোলিয়ন এইভাবে বার্ষিক বাজেট দাঁড় করালেন। এর নীতি ছিল পুরোপুরি বাস্তব বিজ্ঞানভিত্তিক। দেশের যা পাওনা তা নিশ্চয়ই পূরণ করা হবে, তবে অযথা অতিরিক্ত দিয়ে নয়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে তিন কোটি টাকা দিয়ে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স বা ফরাসী জাতীয় ব্যাঙ্ক খোলা হল। ঠিক হল বছরের শেষে ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ মিলবে শতকরা ছ' টাকা। বাকিটা জমা পড়বে রিজার্ভ ফাণ্ডে। টাকাপয়সা লেনদেনে যাতে এতটুকু গরমিল না হয়, তার জন্য কয়েক বছর পরে খোলা হল অডিট অফিস।

নেপোলিয়ন প্রথম থেকেই জীবনধারণের মান মূল্য এক জায়গায় স্থির করে রাখলেন। দ্রব্যের মূল্য এক চুল বাড়তে দিলেন না। ক্রমে রাশিকৃত অকেজো কাগজে-টাকার পরিমাণ হ্রাস পেল। ফরাসী

জনসাধারণের জীবন-ধারণ অপরিবর্তিত নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠল। ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে স্বর্ণ মুদ্রা জমে উঠল। তার মধ্যে সবচাইতে ওজনে ভারী হল "নেপোলিয়ন" নামে স্বর্ণ মুদ্রা।—

মনে হয় আজকের দিনে এই দুর্গতির দেশে নেপোলিয়নের মতো কোন অর্থনীতিবিদ যদি শাসনকার্যের হাল ধরতেন, তা হলে কি হত! দেশের বিচার-ব্যবস্থা ও আইনের সংস্কার করতে এসে নেপোলিয়ন খুব ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, ফরাসী জাতির হাতে তিনশ'র মতো আইনের বই রয়েছে, অথচ দেশটা চলেছে একেবারে বেআইনীভাবে, কোন নিয়ম নেই, রীতি নেই। সুতরাং কোন শাস্তি নেই, শৃঙ্খলা নেই।

প্রথম কন্সাল নেপোলিয়ন উঠে পড়ে লাগলেন আইন ও বিচারের সংস্কার করে মানুষকে সমমর্যাদাসম্পন্ন করতে, আইনের চোখে সব মানুষ সমান এই আদর্শ তুলে ধরতে। বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে এক-রকম বা একক আইনবিধি ছিল না। রাজকীয় আইন, ধর্ম বিষয়ক আইন, বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় আইন, শিল্পী ও বণিক সঙ্ঘের আইন ইত্যাদি নানারকমের আইনের জটলায় বিচারকার্যে ও বিচার-বিভাগে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। বিপ্লবোত্তর আইনপরিষদ বার-বার চেষ্টা করেছে আইনের এই জটাজাল ছাড়াতে, কিন্তু পারেনি। পারবার কথাও নয়। কারণ তখন নিছক জেকোবিন দলের প্রাধান্য। সুতরাং আইনের সংস্কার কার্য ঐ একটি মাত্র দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হত। উপরন্তু ঐ দলের বাইরের আর কোন আইন-বিশারদ ব্যক্তি, তা তিনি যতই আইনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হোন না কেন, তাঁকে ডাকা যেত না। আর তা ছাড়া তখন সব চাইতে বড়ো কথা ছিল আইন বা শাসন-শৃঙ্খলা ক্ষুন্ন করেও দলীয় স্বার্থ রক্ষা করা। সুতরাং দলীয় দৃষ্টি দিয়ে আর যাই করা যাক,—আইনের চোখে সব মানুষ সমান এবং বিচারের অপেক্ষায় নীরবে, নিভৃতে কোন প্রাণ কাঁদবে না —এমন আদর্শ বাস্তবে পরিণত করা যায় না। অতএব ডিরেক্টরী সভার অধীনে অর্থাৎ জেকোবিন পার্টির প্রাধান্যকালে কিছুই

করা যায়নি। কেবল আইনের পর আইন তৈরী হয়েছে, আসল কাজ কিছুই হয়নি।

নেপোলিয়নের শাসনকালে কিন্তু কোন বিশেষ দলের হাতে শাসন-ভার ছিল না। সব শ্রেণীর, সব দলের বুদ্ধিমান লোকদের নিয়ে কাউন্সিল অব স্টেট গড়ে উঠেছিল। নেপোলিয়ন অবিলম্বে দেশের সব জায়গা থেকে অভিজ্ঞ আইন-বিশারদদের সাগ্রহে আহ্বান জানা-লেন। তাঁদের সাহায্যে অতি অল্পদিনের মধ্যে আইনের একটি খসড়া তৈরী করে ফেললেন। প্রাচীনকালের রোমীয় আইনের আদর্শে তিনি আইনের সংস্কার করলেন। নেপোলিয়ন আইনের সংস্কারের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনের ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। আর প্রস্তাব দিয়ে ছিলেন পাত্র-পাত্রীর বিয়ের বয়সের ওপর। পাত্রের বয়স কুড়ির নীচে হবে না। পাত্রীর বয়স হবে অন্ততঃ আঠারো, তবেই বিয়ে। তার আগে কিছুতেই নয়। আরেকটি নিয়ম নিশ্চয়ই করতে হবে, সেটা হল দাম্পত্য জীবনে স্বামীর প্রতি স্ত্রী থাকবে বিশ্বস্ত ও বিনয়ী। আইন পাস হল। নেপোলিয়ন নিজে যে পারিবারিক বন্ধন বড় বেশী পছন্দ করতেন! তবে তিনি অন্য দিকটাও ভেবেছিলেন। স্বামী স্ত্রীর জীবন যদি পরস্পরের প্রতি তিক্ততায় ভরে যায়, তা হলে দুজনের সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে এবং তা আইনতঃ সিদ্ধ হবে। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাস হল।

নেপোলিয়ন যে নাগরিক আইন বা সিভিল কোড প্রণয়ন করে ছিলেন, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ঐ সিভিল কোডে দু হাজার দু'শ একাশিটি ধারা সম্বলিত হল। যে কর্মযজ্ঞ নেপোলিয়ন অর্থনীতিক সংস্কারে দেখালেন, সেই একই অতি-মানবিক কর্মোদ্যম দেখালেন দেশের আইনের সংস্কারে আর সঙ্কলনে। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে আইনের সঙ্কলনটির নাম হল "কোড নেপোলিয়ন"। এই সংস্কৃত আইন শুধু ফ্রান্সে নয়, ইউরোপের নানা জায়গায় গৃহীত হল, সমাদৃত হল। ফ্রান্সে এখনও ঐ আইন তাড়িয়ে খাওয়া হচ্ছে। কিছু কর্মচারী নিযুক্ত হল, তাদের উপাধি হল প্রিফেক্ট। দেশের সব জায়গায় আনাচে-কানাচে

নেপোলিয়নের আইনবিধি ঠিক ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না, আইন ও বিচারের দৃষ্টিতে সবাই সমান কি না, এইটা তত্ত্বাবধান করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। বিপ্লবের পরেই ফরাসী দেশে জুরীর সাহায্যে বিচারপদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল। কাউন্সিল অব স্টেট এই রীতি তুলে দিতে চাইলে নেপোলিয়ন ঘোর আপত্তি জানালেন। আপত্তি সত্ত্বেও এই নিয়ম উঠে গেল। তবে এর বদলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সুবিধের জন্য একটা সমিতি করা হল। যার নাম হল, চেম্বার অব অ্যারেনমেণ্ট অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি সকলের সামনে আদালতে জবাবদিহি করতে পারবে।

এবার সেনাবিভাগ। নেপোলিয়ন বিশেষভাবে নজর দিলেন সেনাবিভাগের সুখ-সুবিধা, নিয়ম-শৃঙ্খলার ওপর। সৈন্যদের সামনে স্বাদেশিকতার আদর্শ দাঁড় করিয়ে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতেন যে প্রতিটি সৈন্য আগে দেশের নাগরিক, তারপর সে সৈনিক। অতএব যুদ্ধ বা শান্তির সময় কোন সৈনিক যদি অপরাধ করে তা হলে যে-কোন নাগরিকের মতো নাগরিক আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে, দণ্ড হবে। সৈনিক হিসেবে বিশেষ কোন সুবিধে সে পাবে না। শান্তির সময় যুদ্ধকালীন কোন রূঢ়তা সে দেখাবে না, এই ছিল নেপোলিয়নের আদেশ। নাগরিক কর্তব্য সম্বন্ধে বার বার সচেতন করার ফলে সেনাবাহিনী ছিল একজাতি, একপ্রাণ আর এই ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়েই তারা একের পর এক শত্রুকে ঘায়েল করেছে।

যত সংস্কার, বা যত নতুন নিয়ম রীতিরই চলন হোক না কেন, যাদের জন্য করা, তারা যদি শিক্ষিত না হয়, তা হলে সমস্ত ব্যাপারটাই তো ব্যর্থ হয়ে যাবে। নেপোলিয়ন এটা খুব ভালো করেই জানতেন, আর জানতেন বলেই শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের দিকে মন দিয়েছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশী টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী বিদ্যালয় তো খোলা হলই, উপরন্তু পনেরো বছর বয়সে দেখা হত ছাত্রটি কোন্ বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করতে পারবে। বিজ্ঞান বিষয়ে

না ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে। সতরো বছর বয়সে ছাত্রটিকে একটা পরীক্ষা দিতে হত, যার ফলাফল দেখে তবে তাকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হত। সব ছাত্রই মেধাবী হবে, উচ্চ শিক্ষা-লাভের উপযুক্ত হবে, এমন তো কোন মানে নেই। ছাত্র পারুবে না, তবু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে করেই হোক টেনে হিঁচড়ে পড়তে হবে এমন নির্বোধ নীতিতে নেপোলিয়ন বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং নেপোলিয়ন-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থায় কেবল প্রকৃত মেধাবী ছাত্ররাই প্যারিসের সোয়েবর্ন বা অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়বার অধিকার পেত। শিক্ষণীয় বিষয়ও ছিল নানারকম। স্কুল জীবনে একদিকে যেমন ধর্মোপদেশের ক্লাস, অন্যদিকে তেমনি সামরিক শিক্ষার ক্লাস হত। এক দিকে বিজ্ঞান-বিষয়ক, অন্যদিকে আইন, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যতালিকা ছিল। এ সবই ছিল শুধু ছেলেদের জন্য। কিছুকাল পরে নেপোলিয়ন মেয়েদের কথাও ভাবলেন। যদিও মেয়েদের ক্ষেত্র সংসার, তবু একটু আধটু ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা শিখবে এবং বেশী করে শিখবে সেলাই-ফোঁড়াই, রোগীর সেবা-কাজ, তার সঙ্গে একটু গান আর নাচ। মেয়েদের জীবনে এর চাইতে আবার বেশী কি শেখার আছে! মেয়েরা প্রধানতঃ সংসারের হাল ধরবে। আর অন্যদিকে বাড়ির ছেলেরা বাইরে এসে চাকরী করবে, দেশ বাঁচাবে মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের তফাত আছে বৈকি!

নেপোলিয়নের মনের এই ভাবটুকু বেশ মজার!

ধর্ম সম্বন্ধে নেপোলিয়নের খুব একটা বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। শান্তি স্থাপন করাই ছিল নেপোলিয়নের আসল লক্ষ্য। তাই চার্চের আংশিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে পোপের সঙ্গে একটা মৈত্রীচুক্তি বা Concordat করেছিলেন। এর মাধ্যমে প্রাক-বিপ্লব যুগের ধর্ম-ব্যবস্থা খানিকটা মেনে নিয়েছিলেন। তবে তাতে ধর্মের নামে যাজকদের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ ছিল না।

বিপ্লবের তিন আদর্শ—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—নেপোলিয়নের শাসনকালে এই তিনের শেষ কথাটা বাদ গিয়েছিল। নেপোলিয়ন

তাঁর শাসন-সংস্কারে ফরাসী প্রজাদের স্বাধীনতা দেননি। তবে সাম্য ও মৈত্রীর চরম পরকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি সকলের প্রিয় হয়েছিলেন। যাঁরা বিপ্লবের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন, তাঁরা বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন, ফরাসী দেশবাসী কেমন দুহাত তুলে অভিবাদন জানাচ্ছে তাদের সকল দুঃখের পরিত্রাতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে। অত্যাচারী সামন্ত ও অভিজাত শ্রেণীর অবসান ঘটেছে। সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য না ঘটিয়ে প্রতিভার যোগ্য সমাদরের ব্যবস্থা হয়েছে। লোকে পেট পুরে খাচ্ছে। গায়ে প্রয়োজনীয় জামাকাপড় দিচ্ছে। এততেও যদি মানুষ সুখী না হয়, তা হলে সুখ কাকে বলে! আরও একটি অভূতপূর্ব ব্যবস্থা হল। দেশের ও জাতির সেবায় যারা আদর্শ স্থাপন ও কৃতিত্ব দেখাতে পারবে, তাদের "লিজিয়ন অব অনার" নামে ফরাসী দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করবার ব্যবস্থা করা হল। এর ফলে দেশের সেবা করবার, জাতির মঙ্গল করবার উৎসাহ বেড়ে গেল। মানুষে মানুষে ভেদাভেদের সীমা নিশ্চিহ্ন হল। একটা নতুন জাতীয়তাবাদের আদর্শ গোটা ফ্রান্সে ঝলমলিয়ে উঠল। রাষ্ট্রব্যবস্থা দৃঢ় হল।

নেপোলিয়ন তাঁর ব্যক্তিগত মহত্ত্বের আরেকটি আদর্শ স্থাপন করলেন, যখন তিনি বিপ্লবের সময় দেশ-ছেড়ে পালিয়ে-যাওয়া ফরাসীদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন, "ফ্রান্সে ফিরে এসো, ভয় করো না। তোমাদের স্বদেশভূমিতে এখন তোমাদের উপস্থিতি বড়ো দরকার···।" চল্লিশ হাজারের মতো লোক এই ডাকে সাড়া দিল। নেপোলিয়নের আশ্বাসে চল্লিশ হাজারের মতো লোক নির্ভয়ে দেশে ফিরে এল। নেপোলিয়ন যোগ্যতানুযায়ী তাদের নানাকাজে নিযুক্ত করলেন। কে বিপ্লবী, কে রাজার দলের লোক, কে জেকোবিন আর কেই বা গিরোনডিস্ট—কোন ভেদাভেদ নেপোলিয়ন রাখলেন না। বিপ্লবের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হল বলে গোঁড়া বিপ্লবী নেতারা কিছুটা চেঁচামেচি করলেন বটে, তবে তা ব্যর্থ হল। নেপোলিয়ন সে কথায় কান দিলেন না। কান

দিলে চলবে না। কারণ ফ্রান্সকে এখন গড়ে তোলার সময়। এখন জনশক্তি দরকার। এখন কি বাছাবাছি করে কাউকে দূরে রাখলে চলে!

জনশক্তিকে কাজে লাগিয়েই তো নেপোলিয়ন কত রাস্তা-ঘাট করালেন, তাতে আবার ফুটপাথ। খাল খনন করালেন। বন্দর তৈরী করালেন। তাদের রক্ষা করবার ব্যবস্থা হল। আগুন লাগলে তাকে নেভানোর জন্য দমকল হল। একদিকে মাঠে শস্য ফলতে লাগল। অন্যদিকে তুলো, রেশম ইত্যাদির ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল। বাজার মন্দা হলে তার মোকাবিলা করবার জন্য টাকার বিশেষ ব্যবস্থা রইল। অন্যদিকে আবার দেশের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও হল। মানুষের জীবন তো শুধু কর্মের নয়, ভোগেরও বটে। ফরাসীরা ভেবে-চিন্তে দেখল দরকার নেই স্বাধীনতার। সাম্য আর মৈত্রীই যথেষ্ট। তবে আরেকটি জিনিস দরকার। দরকার একটি অতি মহৎ মহামানবের যাঁর নাম হবে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

প্রথম কন্সাল নেপোলিয়ন যখন নানারকম সংস্কার শাসনরীতি, অনেক নিয়ম, অনেক শৃঙ্খলা দিয়ে ফ্রান্সকে ক্রমে সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছেন, দুহাতে ফরাসী অধিবাসীদের শুভেচ্ছা-প্রীতি কুড়িয়ে নিচ্ছেন, সেই ফাঁকে অন্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধের কিন্তু বিরতি ছিল না। এক হাতে অসি, অন্য হাতে শাসনদণ্ড, এই ছিল প্রথম কন্সাল নেপোলিয়নের ব্যস্ততাময় জীবন।

এই সময় নেপোলিয়নের সবচাইতে বড় সমস্যা দেখা দিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, পোর্তুগাল, তুরস্ক ও নেপল্‌স্‌-এর জোটবদ্ধ শক্তি নিয়ে। নেপোলিয়নকে ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য এরা উঠে পড়ে লাগল। তখন হল্যাণ্ড ছিল ফ্রান্সের অধীনে একটি রেপাবলিক দেশ। তার ওপর আচমকা আক্রমণ চালালো ইংরেজ ও রাশিয়ার সেনাবাহিনী। আবার অন্য দিকে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া এগিয়ে গেল ইটালীর দিকে। সেখানকার সংঘর্ষে জয়লাভ করে তারা ম্যাণ্টুয়া

ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নিল। একদল ফরাসী সেনা আবার পরাজিত হল রুশ সেনাপতি সুভারোফের হাতে। তিনি জেনোয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। নেপোলিয়ন ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ডের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। বলা বাহুল্য ইংল্যাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। কেন করলো, তার কি মনোগত ইচ্ছে, সে কথা এখন থাক, পরে আসবে···। এখন নোপোলিয়নকে আবার তৈরী হতে হবে ইটালী অভিযানে। মিশরে যাবার আগে সেখানে যে সাফল্যের মালা পরেছিলেন, সে তো ইতিমধ্যে ছিঁড়েকুটে গিয়েছিল। সুতরাং নেপোলিয়ন আবার তৈরী হলেন।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দের এই ইটালী-অভিযান নেপোলিয়নের যোদ্ধা-জীবনে রীতিমতো একটি নাটকীয় অধ্যায়। অস্ট্রীয় সেনাবাহিনী ইটালীর প্রতিটি প্রবেশপথ আটকে ফেলেছিল। তাদের সেনাপতি মেলাস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হিসেব করে করে ফরাসীবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের অপেক্ষায় তৈরী হয়েছিলেন। নেপোলিয়ন এই অবস্থায় বড়ো কঠিন এক সংকল্প গ্রহণ করলেন। ইটালীর মধ্যে প্রবেশ করতেই হবে, যতই সেনাপতি সব পথ বন্ধ করে রাখুন। নেপোলিয়ন আল্পস্ পর্বত ডিঙিয়ে ইটালী যাবার ব্যবস্থা কর ন। কী সাংঘাতিক, অসম্ভব পরিকল্পনা! "কেন অসম্ভব! আমরা কি কার্থেজের সেনাপতি হ্যানিবলের কাহিনী পড়িনি! তিনি যদি একদা আল্পসকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত বলে গ্রাহ্য না করে ঐ উচ্চতাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে নুইয়ে ফেলে ইটালী অভিযানে যেতে পারেন, তবে আমাদেরই বা ঐ কাজে বাধা কোথায়! না, আমাদেরও এই অভিযানে আল্পস্ বলে কোন বাধা নেই। আল্পসের উঁচু মাথা নুইয়ে দিয়ে আমরাও ঐ পথেই ইটালী জয় করব, সব তৈরী হও···।" অর্থাৎ একটা বিরাট অভিযানের যাবতীয় উপকরণ নিয়ে—সেনাবাহিনী, প্রচুর অস্ত্র, কামানবাহী গাড়ি, ঘোড়া, খাদ্য ও আহত সৈন্যদের জন্য যাবতীয় চিকিৎসার সরঞ্জাম ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে—নেপোলিয়ন আল্পস্ পর্বত পার হতে লাগলেন এবং অবশেষে পারও হলেন এবং ইটালীতে প্রবেশ করে ঐ বছরেই মারেংগোর

যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করলেন। শুধু এইটুকুই নয়, ফ্রান্স ইতিমধ্যে ইটালীতে যে সব জায়গা হারিয়েছিল, তারও পুনরুদ্ধার হল। নেপোলিয়ন আরও কতটা অসম্ভব সম্ভব করতে পারেন, লোকে যখন এই সব ভাবছে, তখনই এল আরেকটি চমকপ্রদ খবর। ফরাসী সেনাপতি মোরো জয়লাভ করেছেন হোহেনলিসডেনের যুদ্ধে। তিনি ভিয়েনায় প্রবেশ করেছেন। কেউ আটকাতে পারেনি। অন্যদিকে ম্যাকডোনাল্ড নামে আরেকজন ফরাসী সেনানায়ক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এমনভাবে ধেয়ে গেলেন যে, অস্ট্রিয়া তাড়াতাড়ি করে লুনেভাইল বলে একটা জায়গায় সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল। রাইন নদীর বাম তীরস্থ অঞ্চল ও বেলজিয়ামের ওপর ফরাসী আধিপত্য স্বীকৃত হল আর একই অধিকার স্বীকৃত হল বাটাভিয়, হেল্‌ভেশিয় ও সিজ অ্যালপাইন রেপাবলিক অঞ্চলে। নেপোলিয়ন, আল্পস্ পর্বত তো জয় করলেনই, আর জয় করলেন উপরিউক্ত বিস্তীর্ণ জায়গা।

ফ্রান্সের তদানীন্তন বৈদেশিক শত্রুদের মধ্যে সবচাইতে সোচ্চার ছিল ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ডের রাজা তখন তৃতীয় জর্জ, বয়স ষাটের ওপর। দীর্ঘ দেহী, গোল মুখ, নীল চোখ, মাঝে মাঝেই পাগলামিতে ভুগতেন। নিজের রাজকীয় পদমর্যাদা সম্বন্ধে তৃতীয় জর্জ অতিরিক্ত ভাবে সচেতন ছিলেন। তৃতীয় জর্জের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উইলিয়ম পিট। বাইরে লাজুক লাজুক ভাব, আসলে দৃঢ়মনা, সুকৌশলী, অত্যন্ত কর্মক্ষম। রাজা, মন্ত্রী—এই দুজন তো বটেই, গোটা ইংল্যাণ্ডই তখন অন্তর থেকে অপছন্দ করেছিল ফরাসী বিপ্লব। এর ওপর আবার নেপোলিয়নের অভ্যুদয়! গোদের ওপর বিষফোঁড়া! এই লোকটির অভ্যুদয় তো শুধু অপছন্দের নয়, ভয়েরও বটে। এই ভয় বেড়ে গেল যখন নেপোলিয়ন একের পর এক রাজ্য জয় করতে লাগলেন, বিশেষ করে যখন অস্ট্রিয়া আক্রমণ করলেন, বেলজিয়মের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তখন। একেই তো মাত্র কয়েক বছর আগে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে উত্তর আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ডের

হাতছাড়া হয়ে গেছে। তার ওপর আবার নেপোলিয়নের যা মতিগতি, তাতে তো মনে হচ্ছে বাণিজ্যের ঘুঘু ইংরেজজাতি ইউরোপের সঙ্গে আর অত শান্তি সোয়াস্তির সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের ফলাও লেনদেন চালাতে পারবে না। ফ্রান্সের বিপ্লব, রাজা-রাণীর প্রাণদণ্ড, অভিজাততন্ত্রের উচ্ছেদ, ধর্মকে নেহাতই কোন রকমে ঠেকনো দিয়ে রাখা ইত্যাদি এই এই সবের প্রতিফলন যদি একবার ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে শুরু হয়, তা হলে! ইংল্যাণ্ড শিউরে উঠল। তা হলে আর কিছু ভাবা যায় না, তার চাইতে দেশের রাজা বেঁচে থাকুন পার্লামেণ্ট থাক আর থাক মন্ত্রিসভা, দরকার নেই সাম্য মৈত্রী ইত্যাদি বড় বড় বুলি। যেমন আছে, তেমন থাকাই ভালো, এই-ই বেশ।

কিন্তু বেশ থাকতে দিলে তো? নেপোলিয়ন নামে লোকটাকে যতদিন না আচ্ছা করে পেড়ে ফেলা যায়, ততদিন তো আর বেশ থাকার উপায় নেই! দেখা যাক কি করা যায়। কয়েক বছর আগেই উইলিয়ম পিট পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছিলেন ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে এবং চালিয়ে যাবে। এবং এটা হবে "war of extermination"···ফ্রান্স যতদিন না ধ্বংস হয়, ততদিন ইংল্যাণ্ড তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

নেপোলিয়নকে ইংল্যাণ্ডে বর্ণনা করা হল—'a clever, desperate jacobin, even terrorist." নেপোলিয়নকে নিয়ে কার্টুন আঁকা হল, —একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শয়তান, তার পিঠের ওপর ভয়ানক চেহারা নিয়ে বসে আছেন, নেপোলিয়ন, মুখ দিয়ে সমানে সৈন্য ও কামান উদ্গীরণ করে যাচ্ছেন। আরেকটা ব্যঙ্গচিত্রে দেখানো হল, নেপোলিয়ন মিশর থেকে সব সোনা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।

শুধু কি এই! ইংল্যাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় ষড়যন্ত্র করে নেপোলিয়নকে হত্যা করার চেষ্টাও তো বড় কম হয়নি। একবার নয়, বার বার। একবার নেপোলিয়ন যখন থিয়েটার দেখতে যাচ্ছিলেন, তখন পথের মাঝে প্রচণ্ড শব্দে সাংঘাতিক ভাবে একটা বোমা ফেটেছিল। আগের থেকেই ষড়যন্ত্রীরা বোমাটি নেপোলিয়নের যাবার পথে রেখে

দিয়েছিল। ভাগ্যবলে নেপোলিয়ন নিজে আহত হলেন না। তবে সঙ্গে সঙ্গেই একটি মেয়ে, একটি ঘোড়া আর একটি কোচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে থেঁৎলে গিয়েছিল, সবশুদ্ধ মারা গিয়েছিলে ন'জন, আহত হয়েছিল একুশ জন। জোসেফাইন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সন্তান-সম্ভবা বোন ক্যারোলিন এত ভয় পেয়েছিলেন যে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান যখন জন্মাল, দেখা গেল নবজাত শিশুটি মৃগী-রোগে অসুস্থ। দু'জন ষড়যন্ত্রী ধরা পড়ল। তাদের প্রাণদণ্ড হল।

আরেকটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর। ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিল কয়েকজন রাজতন্ত্রী ও জেকোবিন দলস্থ লোক এবং যথারীতি এই ষড়যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিল ইংল্যাণ্ড। এমন কি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবার জন্য ইংল্যাণ্ডে তখন রম্‌জে নামে জায়গায় একটা ট্রেনিং ক্যাম্প বা শিক্ষা-শিবির পর্যন্ত বসে গিয়েছিল। সেখানে তৈরী করা হচ্ছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশ-গ্রহণকারীদের। তারা কী ভাবে সবকিছু সন্ধান নিয়ে এগোবে, গোপনে খবর দেওয়া-নেওয়া করবে, সবকিছু ঢেকে রেখে শত্রুপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে, এ সব তো শিখতোই, এর ওপর আবার এই কেন্দ্রে ওদের গেরিলা যুদ্ধ বিদ্যাতেও ওস্তাদ করে তোলা হত। ইংল্যাণ্ড সমানে টাকা ঢালছিল যাতে রম্‌জের এই শিক্ষাদান সর্বাঙ্গ সার্থক হয়।

এবারকার ষড়যন্ত্রে কয়েকজন ফরাসী সেনাপতিও হাত মেলালেন। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টা হল নেপোলিয়নকে হত্যা করে বুঁরবোঁ বংশের রাজকুমার ডিউক অব এনঘিয়েনকে ফরাসী সিংহাসনে বসানো। এই বিরাট ষড়যন্ত্রের নেতা ছিল ক্যাডুডাল নামে এক ব্যক্তি, লোকটি পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা। নাকটা ভাঙা, তার ওপর একটা লম্বা কাটা দাগ। ইতিমধ্যে ক্যাডুডাল জনা ষাটেক ষড়যন্ত্রীকে সমুদ্রপথে ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিয়েছে। স্থির হল আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নেপোলিয়ন যখন প্যারেড গ্রাউণ্ডে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করবেন, তখন ষড়যন্ত্রকারীরা অশ্বারোহীবেশে ওখানে উপস্থিত থাকবে। তাদের মধ্যে একজন আবেদন পত্র নিয়ে নেপোলিয়নের

কাছে এগিয়ে যাবে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্যান্যরা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে নেপোলিয়নের ওপর। আঘাতে আঘাতে নেপোলিয়নের রক্তাক্ত অবস্থায় নিশ্চয়ই লুটিয়ে পড়বেন, মারা যাবেন, ষড়যন্ত্র সফল হবে আর সঙ্গে সঙ্গে ডিউক অব এনঘিয়েন ফরাসী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। এ তো একেবারে পরিষ্কার হিসেব! নিখুঁত পরিকল্পনা! ষড়যন্ত্রকারীরা একেবারে তৈরী।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকালবেলা। দাড়ি কামাচ্ছেন। যথারীতি ব্যক্তিগত পরিচারক কনস্ট্যান্ট আর্শী হাতে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় দরজা খুলে ঢুকল রিয়েল—একজন পুলিশ কর্মচারী। উত্তেজিত ভাবে ষড়যন্ত্রের খবর জানালো ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগসাজস করে ফ্রান্সের কয়েকজন সেনাপতি কী ভাবে এই ষড়যন্ত্রকে চরিতার্থ করতে উদ্যত ইত্যাদি, ইত্যাদি···। নেপোলিয়ন গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপর এদিক ওদিক প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দিয়ে নিরাপত্তার সবরকম ব্যবস্থা করলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের একজন ধরা পড়ল। নেপোলিয়ন আদেশ দিলেন যে করেই হোক সকল নাটের গুরু ক্যাডুডালকে ধরা চাই।

ঠিক এই সময় ক্যাডুডাল একটা ফলের দোকানের পেছনে ঘাপ্‌টি মেরে বসে ছিল। এমন সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো ব্যাপারটা যে শেষ মুহূর্তে ভেস্তে যাবে, তা কি কেউ জানত! ক্যাডুডাল ভেবে চিন্তে ঠিক করল, আর এখানে নয়, তাকে এবার ঠাঁই পালটাতে হবে। নেপোলিয়নের চর চারদিকে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একদিন ক্যাডুডাল সন্ধ্যায় ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে বাজারের কুলির বেশ ধরে মাথায় তাদেরই মতো বড় টুপি পরে একটা ঘোড়ার গাড়িতে লাফিয়ে উঠল। কোচোয়ান জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন?"—"যেখানেই হোক চল, খুব তাড়াতাড়ি।" ক্যাডুডালের তখন নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

ওদিকে একজন পুলিশ ক্যাডুডালকে দেখে চমকে উঠল। খবরের কাগজে চেহারার এমন বর্ণনা দিয়েই না একটা লোককে খুঁজে বার

করতে বলা হয়েছে। সেই লোকটাই না! হ্যাঁ! বর্ণনায় যেমন আছে। ঘাড়-গর্দানে চেহারা। ভাঙা নাক। তার ওপর একটা কাটা দাগ! নেপোলিয়ন আদেশ দিয়েছেন এমন চেহারার লোক দেখলেই আটকাতে হবে! সেই লোকটাই তো তাড়াহুড়ো করে পালাচ্ছে। ধর··· ধর···ধর···ধর। পুলিশটি লাফিয়ে উঠল গাড়িতে। পেছনে ছুটে এল আরও দুটি।

ক্যাডুডাল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে গুলি চালাল। প্রথম পুলিশটি মারা গেল। আরেকটি পুলিশ আহত হল। কিন্তু যতই গুলি ছুঁড়ুক, ক্যাডুডাল শেষ পর্যন্ত কাত হল, পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল। সুতরাং ডিউক অব এনঘিয়েনকে কেন্দ্র করে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে কুটিল চক্রান্ত গড়ে উঠেছিল, তার অবসান হল। ডিউক অব এনঘিয়েনকে জার্মানী থেকে বন্দী করে ফ্রান্সে নিয়ে আসা হল। জেরার উত্তরে এনঘিয়েন বলতে বাধ্য হলেন যে, তিনি এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে এই পর্যন্ত চার হাজার দুশ' গিনি পেয়েছেন।

বিচার হল। এনঘিয়েন দোষী সাব্যস্ত হ'য়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ক্যাডুডালকে নিয়ে আরো কয়েকজনের তাই হল। ইউরোপের রাজা-রাজড়ারা চম্‌কে উঠলেন। নেপোলিয়নের দিকে তাঁরা চোখ লাল করে তাকালেন। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড।

অথচ এই নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কোন বিরোধিতা করতে চাননি, যুদ্ধ চাননি, সংগ্রাম চাননি। প্রথম দিকে নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডের কাছে যে প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা ছিল শান্তির প্রস্তাব, বন্ধুত্বের প্রস্তাব। কি দরকার ইউরোপের দুটি শ্রেষ্ঠ রাজ্য—ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স—তাদের মধ্যে বিরূপতার পাঁচিল তুলে দেওয়ার! "আসুন আমরা শত্রুতা ভুলে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হই··· পরস্পরের সুহৃদ হই···।"···নেপোলিয়নের এতখানি উদার, প্রীতিপূর্ণ আহ্বানের জবাবে তৃতীয় জর্জ মন্ত্রী গ্রেনভিলকে কি জানালেন···! জানালেন, "সেই কর্সিকান দস্যুটা একটা চিঠি পাঠিয়েছে···।" গ্রেনভিলের কাছ থেকে এই ব্যাপারে সদ্‌বিবেচনা আশা করাই ভুল এবং

ইংরেজদের পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই হল অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা বলে পাঠাল, আগে ফরাসী সিংহাসনে বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তারপর দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন। আসলে ইংল্যাণ্ড তো তখন ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ভয় পাচ্ছে, পাছে ফ্রান্সের তদানীন্তন ভাবধারা ইংল্যাণ্ডের রাজভক্ত জনগণের মনের মধ্যে ঢুকে যায়। তারাও যদি বলে ওঠে বিপ্লবের আদর্শ মহৎ আদর্শ! সাম্য, মৈত্রী তাদের মধ্যেও পরিচিত করতে হবে…! দরকার নেই এ হেন ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব। বরঞ্চ শত্রুভাবে তার সঙ্গে লড়াই করে করে তাকে একেবারে শেষ করে দেওয়াই ভালো।

ইংল্যাণ্ডের দিক থেকে ফ্রান্সের বন্ধুত্বের প্রস্তাবকে এইভাবে ছুঁড়ে ফেলা হল। নেপোলিয়ন তখন রাশিয়া, তুর্কী, অস্ট্রিয়া ইত্যাদির সঙ্গে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হলেন।

যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই—এই আগ্রহ নেপোলিয়ন তাঁর জীবনে বার বার দেখিয়েছেন, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে ইতিহাসের বুকে তিনি কেবলিই কামান সাজিয়েছেন, কেবলি যুদ্ধ করেছেন। অথচ তিনি যে সত্যি সর্বগ্রাসী আক্রমণকারী হতে চাননি, এটাই তিনি ইউরোপকে বার বার বোঝাতে চেয়েছিলেন। রাশিয়া, তুর্কীর ব্যাপারে কোন গোলমাল হল না। তবে ইংল্যাণ্ড অস্ট্রিয়াকে ক্রমাগত উস্‌কানি দিতে লাগল—ফ্রান্সের সঙ্গে খবরদার, কোন বোঝাপড়া নয়। এমনকি অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য টাকা পর্যন্ত পাঠাল। তবে কোন ফল হল না। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে লুনেভাইলের সন্ধি করতে বাধ্য হল। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট ঝড় উঠল কেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধটাকে জিইয়ে রাখছে? কেন ফ্রান্সের শান্তির প্রস্তাবকে নাকচ করা হল? কেন? জবাব চাই। ঠিক এই সময় প্রধানমন্ত্রী পিটের সঙ্গে রাজা তৃতীয় জর্জের মতবিরোধ হওয়ায় পিট পদত্যাগ করলেন। তাঁর বদলে প্রধানমন্ত্রীর পদে এলেন এডিংটন। এডিংটন ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে আগ্রহ দেখালেন। এই ব্যাপারে যাবার জন্য তিনি লর্ড কর্নওয়ালিসকে পাঠালেন। ফলে ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে

এগিয়ে মার্চ মাসে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যে সন্ধিটি হল, তার নাম হল অ্যামিয়েন্সের সন্ধি। সন্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে মাল্টা দ্বীপ ফিরিয়ে দেবে, ফ্রান্সও তার বদলে কিছু কিছু হাত-ছাড়া করবে। কিছু দিন আগে পোপের সঙ্গে নেপোলিয়ন কন্‌কর্ড্যাট্ (Concordat) বা একটা চুক্তি করে ধর্মীয় ব্যাপারে আর যাতে কোন মন কষাকষি না হয়, তার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং এবার, এত-দিনে নেপোলিয়ন খুশি, মহা খুশি। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড—এই দুই রাজ্যে কূটনৈতিক দূত বিনিময় হল। সন্ধির সম্মানে আহূত ভোজ-সভায় হৈ-হুল্লোড় হল···।

কিন্তু ক'দিন! ক'বছর? নেপোলিয়ন ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে আবার গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌ শুরু হল। ধুনোর গন্ধ দিলেন পিট এবং আরও কয়েক জন সদস্য। নেপোলিয়ন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন, ইংল্যাণ্ডের দিক থেকে অ্যামিয়েন্সের সন্ধির শর্ত পালনে কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। মাল্টা দ্বীপে ইংরেজ সৈন্য যেমন ছিল, তেমনি আছে। অথচ নেপোলিয়নের দিক থেকে যা কিছু ফিরিয়ে দেবার তা কিন্তু তিনি দিয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের এই ইচ্ছাকৃত নিরাসক্ত ভাব নেপোলিয়নকে চিন্তিত করে তুলল।

অন্যদিকে যতদিন গড়াতে লাগল ফ্রান্সের অভ্যন্তরে নেপোলিয়ন-বিরোধী দলগুলির মধ্যে উল্লাসের ভাব দেখা গেল। গুলতুনি শোনা গেল ভিয়েনা, বার্লিন, রোম, নেপল্‌স্ এবং রাশিয়ায়। নেপোলিয়ন সব কিছু লক্ষ্য করলেন। বিরোধী মনোভাবের প্রথম বাস্তব পরিচয় পেলেন পীডমণ্টের রাজা চার্লস ইম্যানুয়েলের ব্যবহারে। ইতিপূর্বে নেপোলিয়ন যখন পীডমণ্ট আক্রমণ করেছিলেন, রাজা চার্লস ইম্যা-নুয়েল পালিয়ে গিয়েছিলেন রোমে। নেপোলিয়ন তাঁকে বার বার বলে পাঠালেন তিনি ফিরে আসুন। সিংহাসনে বসুন। কিন্তু চার্লস ইম্যানুয়েল এলেন না। তখন নেপোলিয়ন পীডমণ্ট রাজ্যটিকে ফ্রান্সের অধিকারে নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নিন্দের ঝড় বয়ে গেল। অথচ এই ইংল্যাণ্ডই মাত্র ছ' বছর

আগে আয়ারল্যাণ্ডকে জোর করে ইংল্যাণ্ডের অধীনে নিয়ে এসেছে। সেখানকার ক্যাথলিক অধিবাসীদের নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রতি পদে তাদের ওপর ইংরেজ শাসনের দম্ভ ফলিয়েছে। নিজের ব্যবহারের নির্লজ্জতা ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের চোখে পড়ল না। এই ইংল্যাণ্ড কি না নেপোলিয়নের সমালোচনা করতে এতটুকু ইতস্তত করল না!

ইংল্যাণ্ডের ব্যবহারে নেপোলিয়ন ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ হচ্ছিলেন। ক্ষোভের চরম কারণ ঘটল যখন নেপোলিয়নের নামে ব্রিটিশ লেখকদের ঐতিহাসিক বই-এ যাচ্ছেতাই করে কুৎসিত মন্তব্য করা হল। যেমন ইংরেজ লেখক স্যার রবার্ট উইলসনের লেখা 'হিসট্রী অব ব্রিটিশ এক্‌স্‌পিডিসন' বইয়ে নেপোলিয়নকে বর্ণনা করা হল, "নেপোলিয়ন একটা আফিমখোর, খুনে···।" নেপোলিয়ন আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। তিনি বেশ কড়া সুরে ইংল্যাণ্ডকে বলে পাঠালেন, "অ্যামিয়েন্সের সন্ধির শর্ত পালনে ইংল্যাণ্ড যদি আর এতটুকু দেরী করে, তা হলে সে উচিত শিক্ষা পাবে এ কথা যেন মনে রাখে···।"

নেপোলিয়নের এই হুমকিকে ভয় পেতে ইংল্যাণ্ডের বয়ে গেছে। বরঞ্চ সে এবার অন্য জায়গায় নষ্টামি করতে লাগল। উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ নেপোলিয়নকে উচ্‌পুচ করে মারা। সুইজারল্যাণ্ড জয় করে নেপোলিয়ন শাসনতান্ত্রিক ভাবে তাকে নতুন করে গঠন করলেন। তার নাম দিলেন হেলভেটিক রেপাবলিক। সুইজারল্যাণ্ডের পুরনো বা শাসনতান্ত্রিক বিভাগ রেখে দিয়েও সেখানে এক উদার শাসনব্যবস্থা চালু করলেন। আগে ক্যাণ্টনগুলির ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল অভিজাত বড়ো লোকদের। এই অন্যায় আধিপত্যে ঘা মেরে নেপোলিয়ন জনসাধারণের অধিকারকে বড়ো করে তুললেন, তাদের এতদিনকার জমে-থাকা অভাব অভিযোগ দূর করলেন, দু-হাতে তাদের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও বাহবা কুড়োলেন। অতএব ইংল্যাণ্ডের মন পুড়ে গেল। ঈর্ষার আগুনে পুড়তে পুড়তেই সে উস্‌কানি দিতে লাগল সুইজারল্যাণ্ডের অভিজাতদের। ফলে অচিরেই সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের

মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হল। অভিজাতরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াতে লাগল। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের নীতি সফল হল।

নেপোলিয়ন এই নষ্টামি সহ্য করতে পারলেন না। সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের এই গৃহবিবাদ থামিয়ে দিলেন। ওখানে নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে নিয়ে আলোচনা করে অ্যাক্ট অব মেডিয়েন নামে একটা শাসননীতি চালু করলেন। এই নীতি অনুযায়ী ক্যাণ্টনগুলিকে বিস্তৃত স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া হল। তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি সম্পর্কে একটা সুন্দর বন্দোবস্ত হল। সর্বোপরি সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের জন্য একটা অনাক্রমণাত্মক সন্ধি হল।

ইংল্যাণ্ড চটে লাল। যত রকম ভাবে পারল নেপোলিয়নকে নীচু করতে চাইল। রাজ্যলোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী—এসব তো বললই, উপরন্তু নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর নানারকম কুৎসিত কটাক্ষপাত করা হল। যাকে বলে চরিত্র হনন, এ হল ঠিক তাই। ইংল্যাণ্ডের কাগজে ছাপার অক্ষরে বেরোল, "সাদা-কালোর সংমিশ্রণে নেপোলিয়নের জন্ম। সে অর্ধেক ইউরোপীয়, অর্ধেক নিগ্রো…"। ব্যঙ্গ চিত্রে নেপোলিয়নকে আঁকা হল একটা হলদে চামড়ার কুতকুতে বামন, নাকটা কিন্তু ইয়া বড়ো। এছাড়া সাংঘাতিক হল যখন জোসেফাইন আর পল বারাসের নাম জড়িয়ে কুৎসিত সব গল্প-কাহিনী রচিত হল। নেপোলিয়নের নামের সঙ্গে জড়ানো হল তাঁর সৎ কন্যা, জোসেফাইনের আগের পক্ষের মেয়ে হর্টেন্সের নাম এবং সেখানেও সেই কুৎসিত কটাক্ষপাত, মনগড়া রসিকতা…। এমন কি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী ফরাসীদের উত্তেজিত করবার জন্য ইংল্যাণ্ড তাদের গোপনে ঘুষ দিতে পর্যন্ত কসুর করলো না। যুদ্ধ করার মধ্যে একটা পৌরুষ আছে, ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রম আছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের, ইংরেজ শাসন কর্তৃপক্ষের এ কী জঘন্য, অশ্লীল ব্যবহার!

নেপোলিয়ন দুর্ভাবনায় পড়লেন। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম করে যে উদার, প্রজাহিতৈষী শাসনতন্ত্র গড়ে তুলেছেন, ইংল্যাণ্ড তো তাকে

কবর দেবার ব্যবস্থা করছে! এবং এই ব্যবস্থা করছে স্বার্থ জিইয়ে রাখবার জন্য! অর্থাৎ নেপোলিয়ন নামে লোকটাকে খবরদার স্থির থাকতে দিও না, শান্তিতে থাকতে দিও না। দিলেই সেই সুযোগে লোকটা আবার এমন এক কর্মকাণ্ড শুরু করে দেবে যে, সব রাজ্যের প্রজারা ভাবতে শুরু করবে—আমাদের কেন এমনটি হয় না। সর্বনাশ প্রজা-সাধারণকে কখনও শাকের ক্ষেত দেখাতে আছে? সুতরাং নেপোলিয়নকে অর্ধসত্য, মিথ্যা ও মহামিথ্যা যে কোন অস্ত্রের সাহায্যে ঘায়েল কর।

অতএব নেপোলিয়ন অ্যামিয়েন্সের সন্ধি করে যে শান্তি ও বহু-আকাঙ্ক্ষিত ইংরেজদের বন্ধুত্ব চেয়েছিলেন, তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

"ব্যাপারটা কি, একটু খোলসা করে বলুন তো···!" নেপোলিয়ন ফ্রান্সে অবস্থানকারী ইংরেজ দূত হুইটওয়ার্থকে একদিন সরাসরি প্রশ্ন করলেন। উত্তরে হুইটওয়ার্থ একগাদা আবদেরে দাবীর ফিরিস্তি দিলেন···মাল্‌টা দ্বীপ ছাড়বো না, অন্ততঃ দশ বছরের আগে তো নয়-ই। ফরাসী-অধিকৃত ল্যামপেডুসা নামে দ্বীপটা আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এ ছাড়া হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সকে সরে দাঁড়াতে হবে···। এই দাবী পূরণ করা হবে কিনা এ খবর সাত দিনের মধ্যে জানাতে হবে···ইংল্যাণ্ডের দিক থেকে এটাই হল চরম পত্র···। নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডের এই ব্যবহারে পাথর বনে গেলেন। কিন্তু এর পরেও তিনি ইংল্যাণ্ডকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। এমন কি অ্যামিয়েন্সের সন্ধির সর্তাবলি একটু এদিক-ওদিক করে মাল্‌টা ইংরেজদের হাতেই রাখতে চাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই মে অডিয়ের্ন উপসাগরে হঠাৎ দেখা গেল দুটো নিরীহ ফরাসী জাহাজকে আটকে ফেলেছে। এই ব্যাপারের পর নেপোলিয়নের পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না।

কিন্তু কেন? কেন ইংল্যাণ্ড নেপোলিয়নকে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করল। মনে হয় নেপোলিয়ন যদি ইংরেজদের সবকটা দাবীও মিটিয়ে

দিতেন, তবু অন্য যে-কোন নির্লজ্জ ছুতো করে নেপোলিয়নকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করা হতই। কারণ নেপোলিয়নকে দিয়ে যুদ্ধ করাতেই হবে এবং সেই যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী। নেপোলিয়নের শান্তিতে থাকা মানেই ইউরোপের সর্বস্থলে তাঁর প্রভাব, তাঁর প্রতিপত্তি স্থাপিত হওয়া। একের পর এক তাইতো হচ্ছে। উপরন্তু নেপোলিয়ন যেখান যেখানে তাঁর হাত বাড়িয়েছেন, সেখানেই তাঁর শাসননীতি প্রভাব বিস্তার করেছে। সেখানকার অধিবাসীরা নেপোলিয়নের গুণমুগ্ধ হয়েছে। এমনটি যদি সারা ইউরোপে হয় তাহলে ইংল্যাণ্ড যাবে কোথায়! তার ব্যবসা বাণিজ্য? অতএব ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই হবে। ইউরোপের অন্যান্য শক্তিগুলিকে নেপোলিয়ন-বিরোধী করে তুলতেই হবে, তবে না ইংল্যাণ্ডের স্বস্তি! সাবাস্ ইংল্যাণ্ড, এই দেশের কর্তা ব্যক্তিরাই আবার নেপোলিয়নকে বলতেন, 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যুদ্ধ-লোভী, রক্তপিপাসু, খুনে··· !'

সব দিক দেখে শুনে নেপোলিয়ন এবার নিজের সম্বন্ধে ভাবতে বসলেন। ভাবতে বাধ্য হলেন। নেপোলিয়ন প্রথমে দশ বছরের জন্য প্রথম কন্সাল হয়েছিলেন, তারপর নিজেকে যাবজ্জীবন কন্সাল পদে অভিষিক্ত করলেন। যখন তাঁর বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র হতে লাগল, সেগুলি ব্যর্থ হলেও নেপোলিয়ন আবার নতুন করে চিন্তা করতে লাগলেন। রেপাবলিক ফ্রান্স। তার শাসক নেপোলিয়ন। বাইরের শক্তিগুলি একজোট হয়েছে, ফ্রান্সের প্রজা-রঞ্জনকারী এই উদার শাসননীতিকে ভেঙে দেবে। তারপর পায়ে দলবে কন্সাল নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্ব, তাঁর শাসন যোগ্যতা।

নেপোলিয়ন অনেক ভাবলেন, কাউন্সিল অব স্টেটের সঙ্গে আলো-চনা করলেন। সেনাপতিদের সঙ্গে কথা বললেন। সকলের মতামত জানলেন। এরপর নেপোলিয়ন স্থির করলেন—আজীবন তিনি শাসকই থাকবেন। ফ্রান্সের মঙ্গল করবেন। উন্নতি করবেন। তবে উপাধি পালটাবেন। আর 'প্রথম কন্সাল' নয়, এবার "সম্রাট" উপাধি নিতে হবে। শাসকের মর্যাদাকে এবার রাজোচিত করতে

হবে। নইলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বুরবোঁ বংশীয় উত্তরাধিকারীকে সামনে রেখে ষড়যন্ত্র গুলতুনির সীমা থাকবে না। ইংল্যাণ্ড পদে পদে 'কন্সাল' নেপোলিয়নকে অপমান করবে, তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে। মিথ্যে কথার ঝুড়ি দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে নানা কেচ্ছা ছড়াবে। না, আর দেরী নয়। এবার 'সম্রাট' হতে হবে, মর্যাদা বাড়াতে হবে। আপত্তি, ঘোরতর আপত্তি জানালেন জোসেফাইন। জোসেফাইন বুদ্ধিমতী। একটা জিনিস তিনি ঠিক বুঝেছিলেন। নেপোলিয়ন সম্রাট হলে স্বাভাবিক ভাবেই জোসেফাইন সম্রাজ্ঞী হবেন। কিন্তু হবেন কি? জোসেফাইন তো তাঁর স্বামীকে আজ পর্যন্ত কোন সন্তান দিতে পারেননি! সম্রাট পিতার উত্তরাধিকারী তো চাই! পিতার পর সিংহাসনে পুত্র আসবে এটাই তো নিয়ম। জোসেফাইন ভয় পেলেন। এবার নেপোলিয়ন যদি অন্য কোন চিন্তা করেন। অভিষেকের আগে যদি তিনি জোসেফাইনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করেন! তা হলে? দরকার নেই স্বামীর সম্রাট হয়ে। তার চাইতে বরং এই-ই ভালো। নেপোলিয়ন প্রথম কন্সাল হয়েই থাকুন।

জোসেফাইন ঠিকই আশঙ্কা করছিলেন। নেপোলিয়নের মনে এই চিন্তাটা যে ইদানীং দু-একবার উঁকি-ঝুঁকি না মারছিল, তা নয়। তবে আপাতত কিছু নয়। নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে বড়ো ভালোবাসেন।

নেপোলিয়ন স্থির করলেন 'সম্রাট' তিনি হবেন। রাজকীয় উপাধি তাঁকে নিতেই হবে। তিনি সম্রাট হবেন রাজ্যের নয়, ফরাসী জাতির—Emperor of the French…তাঁর 'সম্রাট' উপাধির পেছনে ভগবানের দেওয়া কোন শক্তির আস্ফালন থাকবে না, থাকবে ফরাসী জনসাধারণের অকুণ্ঠ আন্তরিক শুভেচ্ছা।

'সম্রাট' হতে গেলে মাথায় রাজমুকুট পরতে হবে। সুতরাং রাজ্যাভিষেক চাই আর এই অভিষেক-অনুষ্ঠানে পোপের উপস্থিতি অত্যন্ত দরকার। অভিষেক তো যেমন-তেমন একটা ব্যাপার নয়। অভিষেক উৎসব একটা পবিত্র অনুষ্ঠান।

নেপোলিয়ন তদানীন্তন পোপ সপ্তম পায়াসকে রোম থেকে ফ্রান্সে আসবার জন্য আহ্বান জানালেন। কারণ অভিষেক হবে প্যারিসের নোতরদাম চার্চে। এবার ঠিক করতে হবে নেপোলিয়নের রাজকীয় প্রতীক কী হবে। সিংহ? হাতী? চিতা বাঘ? না কি সাধাসিধে একটা মোরগ! অনেক আলোচনা হল। নেপোলিয়নের আর পছন্দ হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল নেপোলিয়নের রাজকীয় প্রতীক হবে ঈগল। দুদিকে দুটি বৃহৎ পাখা-মেলে-দেওয়া তীক্ষ্ণঠোঁট ঈগলপাখি। সুন্দর, চমৎকার প্রতীক। রাজোচিত প্রতীক। নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত প্রতীক হল মৌমাছি। নিশ্চয় অকুণ্ঠ অনলস পরিশ্রমের প্রতীক! প্রাচীন রোমীয় ফ্যাসানে লরেল পাতার মালা করে রাজ-মুকুট তৈরী হল। অবশ্য এ পাতা গাছের সবুজ পাতা নয়, গোটাটাই খাঁটি সোনার।

আসন্ন রাজকীয় অভিষেকের আয়োজন শুরু হল। নেপোলিয়ন একটু বেশী জঁাক-জমক, অনুষ্ঠান দেখাতে চাইলেন। প্রাচীন কালের যা কিছু অভিষেক-সম্পর্কিত রাজকীয় গৌরব, তাঁর অভিষেকের বেলায় যেন এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়। ফরাসী-অধিবাসীরা তো দেখবেই। আরও দেখবেন ইউরোপের যাবতীয় রাজা-মহারাজারা। দেখবে ইংল্যাণ্ড। তবেই না তারা নেপোলিয়ন নামে লোকটিকে একটু সমীহ করতে শিখবে! সুতরাং এই অভিষেক-অনুষ্ঠানে ধর্মীয় ভাবের চাইতে নেপোলিয়নের অনেক বেশী লক্ষ্য জঁাকজমকের দিকে। পাঁচজনে দেখুক। এবার থেকে যেন বুঝতে পারে নেপোলিয়নের মর্যাদাও রাজার মতো। আর যেন তাঁর নামে কোন কেচ্ছা না বেরোয়। ব্যঙ্গ-চিত্র এঁকে তাঁকে না খেলো করা হয়।

"তেল কোথায়! সেই স্বর্গ থেকে আনা পবিত্র তেল! যার স্পর্শে অভিষিক্ত হয়ে রাজা সিংহাসনে বসবেন!" অভাব হল না। অলিভ অয়েলের সঙ্গে একটু সুগন্ধি নির্যাস মিশিয়ে নেওয়া হল। ব্যাস। বেশ কিছুটা পবিত্র পবিত্র ভাব এসে গেল। মহামতি পোপ আসছেন, পবিত্র তেল হাতের কাছে, স্বর্ণমুকুট তৈরী। প্রাচীন যুগে সম্রাট শার্লেম্যান

যেমন অতি গৌরবের সঙ্গে সেন্ট পীটার চার্চে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তেমনি হবেন নেপোলিয়ন। মহামান্য পোপকে সেই রোম থেকে ফ্রান্সে আবাহন করে নিয়ে আসা তো ঐ জন্যই নইলে ফ্রান্সের রাজাকে অভিষিক্ত করার ব্যক্তি তো ফ্রান্সের অন্তর্গত রিম্‌স শহরের আর্ক বিশপ! নেপোলিয়ন শুধু দেখাবেন তাঁর ক্ষমতা, তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমা। ইংল্যাণ্ড দেখুক, তার সঙ্গে যারা জোট বেঁধেছে, তারাও দেখুক। শুধু এইটুকুই নয়। নেপোলিয়ন আরও একটু বেশী দেখাবেন তাঁর নিজের অভিষেকের সঙ্গে জোসেফাইনও কেমন অভিষিক্ত হন। মাথায় রাণীর মুকুট পরিয়ে তাঁকেও কেমন সম্মানিত করা হয় দেখুক, সবাই দেখুক, নেপোলিয়ন কী এবং কে।

পোপ সপ্তম পায়াস ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের ২রা নভেম্বর রোম থেকে ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা দিলেন। গোঁড়া ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছে পোপকে এই ভাবে ফ্রান্সে নিয়ে আসাটা খুব ভালো লাগেনি। নেপোলিয়ন এই চাপা অসন্তোষ বুঝেও কিছু গ্রাহ্য করলেন না। কারণ তখন তাঁর মাথায় কেবল একটি চিন্তাই খেলে বেড়াচ্ছে, সেটি হল—কী করে নিজেকে সারা ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ডের সামনে মহিমান্বিত করে তুলবেন। এই ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন মনের ভারসাম্য একটু হারিয়ে ফেলে ছিলেন বৈকি। তবে ফ্রান্সে পোপের অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি থাকল না। নেপোলিয়ন সম্মানিত অতিথিকে স্বাগত জানাবার জন্য মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ফাউন্টেন ব্লুতে এগিয়ে গেলেন এবং সেখানেই তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও অভ্যর্থনা জানালেন। ট্যুইলারীর প্রাসাদে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। নির্দিষ্ট কামরাগুলিকে হুবহু পোপের প্রাসাদের কামরার অনুকরণে সাজানো হয়েছিল। মহামান্য অতিথিকে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে বটে, তবে আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হবে না।

অভিষেকের দিন স্থির হয়েছিল ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর। নেপোলিয়নের ঘুম ভেঙে গেল। ঝকঝকে সকাল। শয্যা ত্যাগ করে নেপোলিয়ন রুটিন মাফিক সব কাজ-কর্ম সেরে নতুন জামা-কাপড়

পরলেন। সেদিনের গোটা পরিচ্ছদটা ছিল দুধের মতো সাদা সিল্কের। তার ওপর পরলেন লাল রংএর হাতকাটা জ্যাকেট, তাতে রাশিয়ান ফারের পাইপিং আর এমব্রয়ডারী করা সোনালী রং-এর মৌমাছি। মাথায় পরলেন সাদা পালক আটকানো কালো ফেল্ট টুপী।

নেপোলিয়নের ভাইয়েদের কাছেও আজকের দিনটা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁরাও সবাই সেজেগুজে এলেন। নেপোলিয়ন নিজেকে দেখলেন, ভাইদের দিকে তাকালেন। নিজের মনে একবার বললেন, "আজকের দিনটিতে বাবা যদি একবার আমাদের দেখতেন!"

জোসেফাইনও সাজলেন। হীরে বসানো একটা ব্যাণ্ড দিয়ে চুলগুলিকে গোছা করে বেঁধে নিলেন। রুচি আর পছন্দ দিয়ে রাণীর মতো সাজলেন। উজ্জ্বল মুখে সাদা ভেলভেটের গদি মোড়া সোনালি কাজ করা সুন্দর সাজানো একটি আট ঘোড়ার গাড়িতে স্বামীর পাশে গিয়ে বসলেন। ঘোড়াগুলির রং লালচে বাদামী। গায়ের লোম যেন পিছলে যাচ্ছে। পিঠে মরক্কো চামড়ার ঝক্‌মকে জিন। বেলা তখন ঠিক দশটা। গাড়ি প্যারিসের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল। রাস্তার দুপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে-থাকা ফরাসী জনতা হাত নেড়ে নেপোলিয়নকে সোল্লাস অভিনন্দন জানাতে লাগল…।

পৌনে বারোটার সময় আর্কবিশপের প্রাসাদের সামনে গাড়ি থামল। নেপোলিয়ন, জোসেফাইন গাড়ি থেকে নামলেন। নেপোলিয়নের ভাইরাও নেমে এলেন। এই বাড়ি থেকে সবাই পরে নিলেন ম্যাণ্টেল বা ক্লোক। দুই কাঁধের ওপর আটকানো পিঠের ওপর দিয়ে নেমে গিয়ে মাটির ওপর লুটানো বিরাট আচ্ছাদনী। অবশ্য মাটির গায়ে লাগল না, চারজন করে লোক দুদিক থেকে আচ্ছাদনী ধরে থাকল। নেপোলিয়নের আচ্ছাদনীটি ছিল লাল রং-এর। তার ওপর সুন্দর সূচীকর্ম। মাঝখানে বড় করে লেখা "এন" অক্ষরটি! তার চারদিকে অলিভ, লরেল আর ওক বৃক্ষের শাখা।

ঠিক দুপুরবেলা নেপোলিয়ন ও জোসেফাইন প্রবেশ করলেন নোতরদাম চার্চে। দুজনে ধীর পদে এগিয়ে এলেন। সামরিক

ব্যাণ্ডে বেজে উঠল অভিষেকের গান। উপস্থিত বিরাট জনতা সোল্লাস-শুভেচ্ছা জানালো, 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন'।

নেপোলিয়ন ইচ্ছে করেই অভিষেক-উৎসবে জনতার প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। কারণ তিনি তো "Emperor of France" নন, তিনি "Emperor of the French"। সুতরাং নোতরদাম চার্চে সেদিন যে আট হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। নেপোলিয়ন তাকিয়ে দেখলেন সিংহাসন ও অভিষেকবেদির চারদিক ঘিরে উপযুক্ত জমকালো পোশাকে সেজেগুজে তার প্রিয় সেনাপতি, কর্মচারী ও বন্ধুজনেরা।

অভিষেক-প্রার্থনা শুরু হল। পোপ পবিত্র তেল নিয়ে নেপোলিয়ন ও জোসেফাইনকে অভিষিক্ত করলেন। শরীরের ন'টি জায়গায় তৈল-স্পর্শ ঘটানো নিয়ম। নেপোলিয়নের ইচ্ছেয় শুধু দুটি জায়গায়, ভ্রূর ওপর ও হাতে ঐ তেলের স্পর্শ দেওয়া হল। আরও বেশ কিছু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কাণ্ডের পর পোপ নেপোলিয়নের হাতে তুলে দিলেন বিচারদণ্ড, রাজদণ্ড ও তরবারি। এরপর নেপোলিয়ন একা এগিয়ে গেলেন অভিষেক বেদির সিঁড়িতে। সকলের দৃষ্টিতে অভিষিক্ত নেপোলিয়ন নিজের দুহাতে তুলে নিলেন সোনার লরেল পাতার রাজ-মুকুট, তারপর সেই মুকুট ধীরে পরিয়ে দিলেন নিজের মাথায়।

নেপোলিয়ন রাজার ঘরে জন্মাননি। তিনি কোনও দিন রাজপুত্র ছিলেন না। নিজের পুরুষকার-বলেই যখন নেপোলিয়ন অভিষেক-বেদির কাছে এসে পৌঁছলেন তখন রাজকীয় মুকুটও নিজের হাতে নিজের মাথায় পরিয়ে দেবেন, এতে আর বিস্ময়ের কী আছে? বরং নিয়মের, রীতির এই ব্যতিক্রমে নেপোলিয়ন নিজেকে সম্মানিত করে-ছিলেন, নিজের ব্যক্তিত্বের মহিমাকে পাঁচজনের সামনে আরও স্পষ্ট করেছিলেন। মান্যবর পোপ নেপোলিয়নের এই অভাবনীয় ব্যবহারে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। উপস্থিত জনতা বিস্ময়ে হত-বাক্ হয়েছিল। তবু নেপোলিয়ন এতটুকু ইতস্তত করেননি নিজের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষকে শ্রদ্ধা জানাতে। আত্মবিশ্বাসে উন্নত নেপোলিয়ন

ফ্রান্সের রাজকীয় ইতিহাসেএক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রইলেন। নোতর-দাম চার্চ কেঁপে কেঁপে উঠল···Vivat Imperator in Acternum··· পৃথিবীতে সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন।

নেপোলিয়ন তাকালেন জোসেফাইনের দিকে। স্বামীর মুখের দিকে জোসেফাইন পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর ধীরপদে এগিয়ে এলেন অভিষেক-বেদির সিঁড়িতে। জানু পেতে হাত জোড় করে মাথা নীচু করে বসলেন। নেপোলিয়ন হাতে আরেকটি স্বর্ণমুকুট তুলে নিলেন, তারপর ধীরে পরিয়ে দিলেন জোসে-ফাইনের মাথায়। সযত্নে পরিয়ে দিলেন। জোসেফাইনের চুল যেন এদিক-ওদিক না হয়। জোসেফাইনও তো আজকে মহীয়সী রাণী! জোসেফাইনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল। ফোঁটা ফোঁটা পড়তে লাগল অঞ্জলিবদ্ধ হাতের ওপর···। অভিভূত জোসেফাইনের মাথা আরও নত হল···।

নেপোলিয়নের নির্দেশে শিল্পী ডেভিড ক্যানভাসের গায়ে নিপুণ হাতে তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর রবিবারের এই অভিষেককাহিনীটিকে।

আরও কিছু অনুষ্ঠানের পর পোপ কক্ষান্তরে গেলেন তাঁর আনু-ষ্ঠানিক পোশাক ছাড়তে। নেপোলিয়ন উঠে দাঁড়ালেন। প্রার্থনা-পুস্তক স্পর্শ করলেন। তারপর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আমি সকলের নাগরিক, রাজনৈতিক ও সাম্যের অধিকার রক্ষা করবার শপথ নিচ্ছি। আমি শপথ নিচ্ছি সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির ঐক্য রক্ষা করব। আমি শ্রদ্ধেয় পোপের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি এবং সকলের ধর্মীয় অর্চনাদির স্বাধীনতা রক্ষা করে চলব। আমি শপথ নিচ্ছি ফরাসী জনতার সুখ, স্বার্থ ও গৌরব রক্ষাকল্পে রাজ্যশাসন করব···।" বিশ্বস্ততার আবেগে নেপোলিয়নের কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠল। শিহরণ লাগল নোতরদাম চার্চের বিরাট স্তম্ভগুলির গায়ে। নেপোলিয়নের কণ্ঠস্বর নীরব হল। এবার ঘোষণা হল ফরাসী জাতির সম্রাট, পরম মহিমান্বিত, গৌরবমণ্ডিত নেপোলিয়ন এখন পূত ও রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত।

নেপোলিয়নের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। অভিষেক শেষ হল। নেপোলিয়ন ও জোসেফাইন ট্যুইলারীর প্রাসাদে ফিরে এলেন। নেপোলিয়ন "সম্রাট" উপাধি নিলেন, অভিষেক হল, কিন্তু তাঁর নিত্য ব্যবহারে ও নীতি নিয়মের কিছু পরিবর্তন এল না। ফ্রান্সের মুদ্রার এক পিঠে নেপোলিয়নের মুখ ছাপা হল, অন্য পিঠে লেখা রইল "রেপাবলিক" নেপোলিয়ন হলেন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজা।

"এক টুকরো কাঠ ভেলভেটে মোড়া, এই তো সিংহাসন—।" নেপোলিয়ন রাজসিংহাসন সম্বন্ধে এই নিরাসক্ত মন্তব্য করেছিলেন আর এই নিরাসক্ত ভাব নেপোলিয়নের মধ্যে অভিষেকের পরেও বজায় ছিল। জোসেফাইন একবার একখানা চিঠিতে স্বামীকে "সম্রাট" বলে সম্বোধন করেছিলেন। নেপোলিয়ন আপত্তি জানিয়েছিলেন। "আমি যা ছিলাম তাই আছি। আমাকে "সম্রাট" বলে সম্ভাষণ করার কোন দরকার নেই, কিছুই বদলায়নি—।" নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন প্রজার কল্যাণ কামনায় যে শক্তিটুকু থাকা দরকার, তাই যেন তাঁর থাকে। দেশের নিরাপত্তা যেন বিপন্ন না হয়।

কিন্তু বিপন্ন হল। বিপদটা প্রধানতঃ এল ইংল্যাণ্ডের দিক থেকে। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদে তখন আবার পিট এসেছেন, যাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উঠ্‌তি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং সেই যুদ্ধ হবে, তাঁর নিজের ভাষায়, "war of exrermination." পিট টাকা খরচ করে, কুটনীতির সাহায্য নিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেপোলিয়ন তথা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক শক্তিজোট গড়ে তুললেন। এই শক্তিজোটের মধ্যে ছিল ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, সুইডেন আর নেপ্‌ল্‌স্। জোটবদ্ধ হতেই হবে। কারণ নেপোলিয়নের "সম্রাট" উপাধি গ্রহণে ইংল্যাণ্ড একা নয়, ইউরোপের রাজারাও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। আর দেরী নয়। নেপোলিয়ন অজেয় অদমনীয় হবার আগেই তাঁকে শেষ করে দিতে হবে। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দেই এই জোটবদ্ধ শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্র ব্যাভেরিয়ার ওপর।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। কয়েক বছর চলল। বারুদের গন্ধে আকাশ বাতাস ভারী হল। ইংল্যাণ্ড খুশি মনে তার নিজের কাজ করে চলল।

নেপোলিয়ন একবার দুঃখ করে চিঠি লিখেছিলেন, "আমি আমার নিজের ইচ্ছেয় কখনও কিছু করতে পারিনি। আমাকে জীবনভোর পরিস্থিতির নির্দেশে চলতে হয়েছে—।" সত্যিই তাই। নেপোলিয়ন শান্তি চেয়ে, মৈত্রী চেয়ে শুধু যুদ্ধই পেয়েছেন।

নেপোলিয়ন প্রস্তুত ছিলেন। অভিযান শুরু হল। একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে চারশ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে রাইন নদী পার হয়ে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী ব্যাভেরিয়ায় পৌঁছল। অস্ট্রিয়া তখন পর্যন্ত বুঝতে পারেনি কত বড় আঘাত তার ওপর নেমে আসছে। অস্ট্রীয় সেনাপতি ম্যাক একেবারে হকচকিয়ে বোকা বনে গেলেন যখন ফরাসী সেনা বিদ্যুতের মতো তাঁর সেনাবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাঁকে আহত করল, তারপর চলে গেল। ম্যাক অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখলেন অস্ট্রীয় সেনাবাহিনী থেকে ঊনপঞ্চাশ হাজার সৈন্য কীভাবে বন্দী হয়ে ওদিকে চলে গেল! শুধু কী এইটুকু! নেপোলিয়ন আরও সাড়ে তিনশ' মাইল পূব দিকে এগিয়ে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা দখল করলেন। অস্ট্রিয়াধিপতি দ্বিতীয় ফ্রান্সিস রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় ফ্রান্সিস মিলিত হলেন রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে। দুজনে একাত্ম হলেন, আর সেই অবস্থাতেই ভেবে নিলেন তাঁদের দুজনের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণে নেপোলিয়ন এবার হাত-পা ভেঙে দ' হয়ে পড়ে থাকবেন। ভেবে ভেবে দুজনেই পুলকিত হলেন। নেপোলিয়নকে এবার আর ট্যাঁ ফুঁ করতে হবে না। এবার তাঁরা দুজন।

ভিয়েনার উত্তর-পুর্বে সত্তর মাইল দূরে অস্টারলিজে দুই বন্ধুর সেনাবাহিনী সম্মিলিত ভাবে দাঁড়াল—"এবার এস নেপোলিয়ন, দেখি কেমন বাপের ব্যাটা—এক হাত লড়ে যাও"···নেপোলিয়নের সৈন্য সংখ্যা ছিল রুশ-অস্ট্রিয়ার মিলিত সৈন্যের অর্ধেক। কিন্তু নেপোলিয়নের

সাহস! শক্তি! যুদ্ধ কৌশল! অস্টারলিজের যুদ্ধও যেন একটা ভেল্‌কি, ম্যাজিক। নেপোলিয়ন এলেন, যুদ্ধ করলেন, জিতলেন, আর সাতাশ হাজারের মতো শত্রুসেনা বন্দী হল, আহত হল এবং মারা গেল। শত্রুপক্ষের একশ আশিটা কামান নেপোলিয়নের হাতে এসে গেল। জার আলেকজাণ্ডার পরাজয়ের দুঃখে, বেদনায় কেঁদে ফেললেন, তারপর চোখের জল মুছে প্রেসবার্গের সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

নেপোলিয়ন ভেনেশিয়া ইটালী বা সিজ আলপাইন রেপাবলিকের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। ফ্রান্সের সঙ্গে জুড়ে দিলেন অস্ট্রিয়া ও ডালমেসিয়া। এ দুটো জায়গা জয় করেছিলেন অস্ট্রিয়া থেকে। আরও কয়েকটি জায়গা মিত্রপক্ষীয়দের ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিলেন। অন্যদিকে জার্মানীর অন্তর্গত ছোট ছোট ষোলটা রাজ্য নিয়ে একসঙ্গে করে নেপোলিয়ন নাম দিলেন কনফেডারেশন অব রাইন। নিজেকে এই অঞ্চলের "প্রোটেক্টর" বা "রক্ষাকর্তা" বলে ঘোষণা করে নেপোলিয়ন অতি-বুদ্ধিমানের মতো রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ারবিরুদ্ধে "বাফার" স্টেট খাড়া করলেন। ফ্রান্সকে শত্রুদের থাবা থেকে রক্ষা করবার সব রকম ব্যবস্থা করলেন। ফলে ফরাসী সাম্রাজ্যের শুধু সীমারেখাই বাড়ল না, তার ক্ষমতাও অনেকখানি বেড়ে গেল।

"আশা করছি তোমরা এখন থেকে একটু ভেবে-চিন্তে জোট বাঁধবে।" নেপোলিয়ন মানচিত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন। "আর তুমি কি করবে?" নেপোলিয়ন এবার প্রাশিয়ার ওপর চোখ রাখলেন- "নির্বোধ ফ্রেডারিক উইলিয়ম, সত্যিই তুমি বোকা। নইলে একবার আমার দিকে, আরেকবার রাশিয়ার দিকে ঝুঁকছ···! ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো তুমি বার বার এদিক-ওদিক দুলছ··· ।"

আসলে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়মের নিজের কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। তিনি চলতেন রাণী লুইজার নির্দেশে। রাণী লুইজা রীতিমতো সামরিক পোশাক পরে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করতেন। তাঁরই ইচ্ছেতে ইউরোপে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে আবার যখন ইংল্যাণ্ড, স্যাকসনী, রাশিয়া ও সুইডেনকে নিয়ে চতুর্থ শক্তিজোট

হল, তাতে প্রাশিয়াও হাত মেলাল। না মিলিয়ে উপায় ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে প্রাশিয়া নেপোলিয়নের কাছে জেনা ও অরস্টাড যুদ্ধে সাংঘাতিক হারা হেরেছে। শুধু কি প্রাশিয়া! নেপোলিয়নের এমন বিক্রম যে প্রায় একই সময় রাশিয়া হেরে গেল ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধে! আলেকজাণ্ডার পড়ি-মরি করে নেপোলিয়নের সঙ্গে টিলজিটের সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

নীমেন নদীর বুকে জাহাজের ডেকে নেপোলিয়ন ও রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাৎ হল। টিলজিটের সন্ধি হয়েছিল জলের ওপর বেশ একটা নতুন পরিবেশে। আলেকজাণ্ডারকে দেখে নেপোলিয়ন মুগ্ধ হলেন। বছর ত্রিশ বয়স, নীল চোখ, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, কোমল পেলব চেহারা, কথাবার্তায় অতি ভদ্র, ব্যবহারে অভিজাত। সব মিলিয়ে জার আলেকজাণ্ডার লাবণ্যময়। নেপোলিয়ন একবার মন্তব্য করেছিলেন, "আলেকজাণ্ডার যদি মেয়ে হত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তার প্রেমে পড়তাম···।"

আলেকজাণ্ডারকে নেপোলিয়নের এত ভালো লেগেছিল যে তাঁর মনে হয়েছিল ইউরোপে রাজরাজড়াদের মধ্যে যদি কাউকে বন্ধু বলে ডাকতে হয় তো সে এই জার আলেকজাণ্ডার।

আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে নেপোলিয়ন কথা-বার্তা বললেন অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে। রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন চলছে, চিনি থেকে কত আয় হয়, রাশিয়ান ফারে কত টাকা লাগান হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কথা পর্যন্ত বললেন যে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যদি আবার তিনি অভিযান চালান তাহলে তিনি আলেকজাণ্ডাকে এক বিরাট সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে দেবেন। তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন কীভাবে যুদ্ধ চালালে নেপোলিয়নের মতো সাফল্য অর্জন করা যায়। আরও কত কী। গল্প করা, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা মারা, সেই ফাঁকে, আলেকজাণ্ডার ভাগ্যগণনায় বিশ্বাসী জেনে, নেপোলিয়ন তাঁর হাতও দেখলেন এবং মন্তব্য করলেন আলেকজাণ্ডার সৌভাগ্য নিয়েই জন্মেছেন।

আলেকজাণ্ডার তো মুগ্ধ এবং বিস্মিত। নেপোলিয়ন নামে লোকটি এত ভালো, এত অমায়িক! নেপোলিয়নকে একদিন নেমন্তন্ন করে চীনা চা পানে আপ্যায়িত করলেন।

নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারের কাছ থেকে কোন কিছু দাবী করলেন না তো বটেই, বরঞ্চ বললেন রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডটাকে নিজের সঙ্গে জুড়ে নিক না কেন! কী আছে তাতে! সত্যিই এতে মনে করবার কিছু নেই, শুধু দেখা যাচ্ছে নেপোলিয়ন রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে কতখানি উদ্গ্রীব, কতটা আগ্রহী কারণ তিনি জানতেন ইউরোপে যদি একটু শান্তিতে থাকতে হয় তাহলে রাশিয়ার বন্ধুত্ব চাই-ই, রাশিয়ার বন্ধুত্ব অপরিহার্য। তাই হল। টিলজিটের সন্ধির পর রাশিয়ার দূত সাদর অভ্যর্থনা পেল ফ্রান্সে। দুই পক্ষে প্রীতি-শুভেচ্ছা সহ উপহার ও পত্র-বিনিময় হল।

অন্যদিকে নেপোলিয়ন প্রাশিয়াকে বেশ খানিকটা কাবু করে ফেললেন যখন অডার ও নীমেনের মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে ডাচি অব ওয়ার'স তৈরী করলেন ও সেটাকে ফ্রান্সের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। ফ্রান্সের সীমানা বাড়ছে। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন না একই সঙ্গে তাঁর আকাঙ্ক্ষার মিটার চড়ছে আর অলক্ষে নিয়তি হাসছে।

কিন্তু উপায়ও তো কিছু ছিল না। নেপোলিয়নের শান্তি-সৌহার্দ্যের প্রস্তাবকে ইউরোপের রাজ্যগুলি,-বিশেষ করে, ইংল্যাণ্ড বার বার নাকচ করে দিয়েছে।

কিন্তু কেন? যাতে নেপোলিয়ন সব সময় ব্যস্ত থাকেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে, বাড়িতে নয়। যোদ্ধা নেপোলিয়নের একরকম চেহারা, কিন্তু এতে যতটা না বিপদ তার চাইতেও বেশী বিপদ যে তাঁর গঠনমূলক কাজে, তাঁর সংস্কারে, তাঁর শাসন-আদর্শে। যুদ্ধ দিয়ে জয় করা যায়, আদর্শ দিয়ে জয় করা যায় মানুষের মন। ফ্রান্সে নেপোলিয়নের স্থাপিত উদার শাসননীতি, তাঁর আদর্শের ছোঁয়াচ যেন অন্যান্য দেশে কিছুতেই না লাগে, তা হলে সে সব দেশের কর্তাব্যক্তিদের বড়ো

বিপদ। অতএব নেপোলিয়নকে সদা ব্যস্ত রাখো এবং তার জন্য শক্তিজোট কর।

সবচাইতে চতুর চালাক ইংল্যাণ্ড। জলের রাজা ইংল্যাণ্ড। ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেপোলিয়নের দুর্বল নৌ-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। সেদিক থেকে অবশ্য কোন ভয় নেই। ভয় নেপোলিয়নের স্থলশক্তিকে, তাকেও যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে ক্ষইয়ে দিতে হবে। আপাতত নেপোলিয়নের জয়ধ্বনি হোক, সবাই ভয় পাক, নেপোলিয়নের কাছে হাত জোড় করুক। কিন্তু অন্যদিকে নেপোলিয়নের মানসিকতায় যে স্লো পয়জনিং হতে শুরু করেছে, তার ফল নেপোলিয়নকেই পেতে হবে। নেপোলিয়ন জানতেও পারছেন না তাঁর আদর্শবোধকে চাপা দিয়ে ধীরে ধীরে কেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সর্বগ্রাসী রাজ্যলোভ আর সেই লোভেই ক্রমে পিচ্ছিল হয়ে উঠবে তাঁর এগিয়ে যাওয়ার পথ।

বড়ো চালাক ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী ইংরেজ। তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ডের মাঝখানের ঐ সঙ্কীর্ণ ফেনিল জলরেখা ইংলিস চ্যানেলটিকে। ইংল্যাণ্ড তো ইংলিস চ্যানেলেরই দান! ঐ জলটুকুর জন্যই তো ইউরোপের ইতিহাসে ইংল্যাণ্ড স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বড়ো হতে পেরেছে। নৌ-শক্তিতে অদ্বিতীয় হয়েছে, সকলের ওপর নেপোলিয়নকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে। নইলে? ইউরোপ ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়ে থাকলে তো এতদিনে ইংল্যাণ্ডের কপালেও কোন্ না জেনা, অস্টারলিজ বা ফ্রীডল্যাণ্ডের ভাগ্য নেমে আসত!

সুতরাং যুদ্ধ চলছে, চলবে।

নেপোলিয়নের মধ্যে তখন বিষক্রিয়া ভালোভাবেই দানা পাকিয়ে উঠেছে। তিনি এর মধ্যে নেপ্‌ল্‌স্‌ আর স্পেন ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এই দুটি রাজ্যই ছিল বুরবোঁ বংশের আধিপত্য। এই আধিপত্যের শেষ হল। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে ঠিক ঠিক বোঝা গেল নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি কতখানি সীমানা বিস্তার করেছে। কতখানি? কতদূর? ইউরোপের মানচিত্র খুলে দেখা গেল পশ্চিমে আটলাণ্টিকের

তীর থেকে পূর্বে রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত, আর উত্তরে হামবুর্গ থেকে দক্ষিণের রিজিও অ্ ক্যালব্রিয়া পর্যন্ত অর্থাৎ পূবে-পশ্চিমে দু-হাজার মাইল, উত্তর-দক্ষিণে সাড়ে এগারশো মাইল ইউরোপীয় অংশ এখন নেপোলিয়নের হাতের মুঠোও। স্লো পয়জনিং-এর কাজ পুরো দমে চলেছে।

এত বড় বিজিত অঞ্চলটিকে নেপোলিয়ন তিন ভাগে ভাগ করে ছিলেন। ফ্রান্স ও তার প্রতিবেশী কিছু অঞ্চল ছিল নেপোলিয়নের একেবারে খাস অধীনে। দ্বিতীয় অংশটি হল সিজ আলপাইন রেপাবলিক অঞ্চল, আর বাকীটা ছিল সামন্ত রাষ্ট্র। তাদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ছিল, কিন্তু তাদের বৈদেশিক নীতি ছিল সম্পূর্ণ ভাবে নেপোলিয়নের হাতে। উপরন্তু এই সব রাজ্যে মুদ্রানীতি ও শাসন-নীতিও চলত নেপোলিয়নের নির্দেশে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, নেপ্‌ল্‌স্‌ আর ছিল কনফেডারেসি অব রাইন অর্থাৎ ব্যাভেরিয়া, উরটেমবার্গ স্যাকসনি, ওয়েস্টফেলিয়া ইত্যাদি।

নেপোলিয়নের এত বিস্তীর্ণ অঞ্চল সম্পর্কিত শাসনতন্ত্র ছিল পুরো-পুরি সামরিক নীতির ওপর নির্ভরশীল। যে-নীতি কিনা এতটুকু ঢিলেমি, এতটুকু বিশৃঙ্খলা, সামান্যতম শিথিলতা সহ্য করে না, যে-নীতিতে এতটুকু ত্রুটি ঘটলেই ধ্বংস অনিবার্য। নেপোলিয়ন নিজে এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতিকে তিনি অগ্রাহ্য করতেন না বা চোখ এড়িয়ে যেতে দিতেন না। এই কারণেই তিনি তাঁর বিজিত অঞ্চলের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে ন্যায়-নীতি ও আইনের শৃঙ্খলা এনেছিলেন। প্রতি খুঁটিনাটির ওপর এত নজর রেখেছিলন।

এদিকে তো সবই ভালোর দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু তবু নেপো-লিয়ন স্থির থাকতে পারছিলেন না। কারণ তিনি কিছুতেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। কী অহমিকা ঐ ইংরেজদের! এই তো, মাত্র কয়েক বছর আগে, ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে জলের

কি ঝাপ্‌টাই না মারল নেপোলিয়নের গায়ে! অর্ধেক ইউরোপ জয় করেও কি নেপোলিয়ন ভুলতে পারেন সেদিনকার কথা! রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড জোট বেঁধেছিল নেপোলিয়ন তথা ফ্রান্সকে একেবারে খতম করে দেওয়ার জন্য। সেদিন দু'দেশে কী বন্ধুত্ব? ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কী সলাপরামর্শ! ইটালী, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, হ্যানোভার থেকে ফরাসী আধিপত্যকে দূর করতে হবে, সার্ডিনিয়াকে পীডমণ্ট ফিরিয়ে দিতে হবে, ফ্রান্সকে সব দিক থেকে রুখতে হবে···আরও কত কী···!

নেপোলিয়ন সেদিন কি চেষ্টাই না করেছিলেন সমুদ্রের বুকে ইংল্যাণ্ডকে একটু জব্দ করবার জন্য! ফ্রান্সের প্রায় সব কটা জাহাজে সেদিন সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির দম্ভ আর সহ্য করা যাচ্ছে না। নীলনদের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে ফরাসী-দের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেপোলিয়ন এবার নেবেনই। ফরাসী নৌ-সেনাপতি ভিলেনুভকে ডেকে নেপোলিয়ন নির্দেশ দিলেন, "একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে। আপনি নৌবহর নিয়ে সোজা চলতে শুরু করবেন ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের দিকে। যেন ওখানে যাওয়াটাই আপনার ও আপনার নৌবহরের উদ্দেশ্য।"

ভিলেনুভ একটু অবাক হয়ে আমতা আমতা করে বললেন, "কিন্তু আমরা তো যাব ইংলিশ চ্যানেলে, মানে যেখানে শত্রু সেনাপতি নেলস্‌ন জাহাজ সাজিয়ে আর কামান উঁচিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য!"

"সে তো নিশ্চয়ই। তবু আপনাকে একটু অভিনয় করতে হবে। আপনি যেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দিকে এগোতে থাকবেন, দেখবেন ঐ নেলসনও আপনার পিছু পিছু ধাওয়া করবেন। ওকে ঐ লোভটাই দেখাতে হবে। নেলসন ওঁর ঘাঁটি থেকে এগিয়ে গেলেই চ্যানেলে ঢোকার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর আপনি সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবেন, চ্যানেলে ঢুকবেন, তারপর কি করতে হবে না হবে, সে তো আপনার জানা।···"

ভিলেনুভের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যেতেই তিনি রওনা

দিলেন। সঙ্গে নৌবহর, বেশ বড়সড় নৌবহর। ফ্রান্সের এই নৌবহর ছাড়াও স্পেন থেকে নেওয়া ত্রিশ খানা জাহাজ ছিল। নেপোলিয়নের মন আশায় ভরে উঠল যখন খবর পেলেন, যা ভেবেছিলেন তাই-ই হয়েছে। ভিলেনুভের পেছন-পেছন নেলসনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দিকে মুখ করে এগিয়ে গেছেন। ঐ পথে কিছুদূর গিয়ে নেপোলিয়নের নির্দেশ মতো ভিলেনুভ হঠাৎ জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল কেটে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

এই সোনার সুযোগ ছেড়ে দিলে চলবে না।

নেলসন বুঝতে পারলেন তিনি কত সাংঘাতিক ফাঁদে পা দিয়েছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে যা করণীয় তার নির্দেশ দিলেন। ভিলেনুভ লক্ষ্য করলেন না, একা একটি জাহাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আগে বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ খবর চলে গেল ইংল্যাণ্ডে। সুতরাং ভিলেনুভ যখন আশায়-আনন্দে উত্তেজিত হয়ে ইংলিশ চ্যানেলে ঢুকতে যাবেন, তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলেন সেখানে নেলসন না থাকলেও আছেন ইংরেজ সেনাপতি কালডার, সঙ্গে কামান সাজানো পনেরোখানা জাহাজ।

ভিলেনুভ মাথা নিচু করে, ভারী মন নিয়ে ফিরে এলেন কেডিজ বন্দরে। এত কৌশল, এত যাওয়া-আসার অভিনয়, একেবারে মিথ্যে হয়ে গেল।

আসল বিপদটা এল কিছুদিন পরে। ভিলেনুভ সাহসে ভর করে একদিন কেডিজ বন্দর থেকে বেরিয়ে এলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নেলসন। ট্রাফালগারে ভয়াবহ যুদ্ধ হল। দু-পক্ষে গোলাগুলি ছুটল অনেক। নেলসন নিজে দাঁড়িয়ে ছিলেন "ভিক্ট্রি" নামে জাহাজে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন যুদ্ধের গতি। একমাত্র এই জলের খেলাতেই নেপোলিয়নকে কাত করা যাবে, নইলে নয়।

হঠাৎ একটা আগুনে বল ছুটে এল নেলসনের দিকে। তীব্র যন্ত্রণায় নেলসনের সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল। শত্রু পক্ষের কামানের গোলা মৃত্যুর আঘাত দিয়েছে নেলসনকে। মৃত্যুর কোলে

লুটিয়ে পড়ার আগে নেলসন শুনে গেলেন ট্রাফালগারের যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের জয়, ফ্রান্সের পরাজয়। নেপোলিয়ন এবারও পারলেন না তাঁর জীবনের প্রথম নিয়তি নেলসনের শক্তি খর্ব করতে। নেলসন নিজের প্রাণ দিয়ে নেপোলিয়নের অবাধ জয়ের পথে পাথর ফেলে দিলেন।

কী করে ভুলবেন নেপোলিয়ন ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়ের সেই নিদারুণ অপমান! ইংল্যাণ্ডকে কাবু করার পথে সেই পাথুরে বাধা…!

তাই বলে কী ইংল্যাণ্ডের এই দম্ভ সহ্য করতে হবে! তার সব রকম বিরোধিতার ভূমিকা মানিয়ে নিতে হবে! মানতে হবে না… ঠিকই, তবে একটা জিনিস নেপোলিয়ন ঠিকই বুঝেছিলেন যে, তিনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, ইংল্যাণ্ডকে নৌযুদ্ধে কিছুতেই হারাতে পারবেন না। পারবেন না ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা ফেলতে। তবে!

নেপোলিয়ন ভাবলেন আর ভাবলেন। তারপর সত্যিই পথ খুঁজে পেলেন। বেনিয়া ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করবার পক্ষে এই বুদ্ধিটা খুবই কাজে লাগবে। নেপোলিয়ন লাফিয়ে উঠলেন, "এবার বুঝতে পারবে ইংরেজ, তোমাদের দম্ভের মূল শক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের কে… ভরাডুবি হয়, তোমাদের পেটে কেমন টান পড়ে। তোমাদের আমি হাতে মারতে পারবো না ঠিকই, কিন্তু এইবার তোমাদের ভাতে মারবো। দেখবে, বুঝবে, তারপর সুড়সুড় করে আমার কথা শুনতে বাধ্য হবে।" নেপোলিয়ন মনে মনে উল্লসিত হয়ে মাথা নাড়লেন "এ ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় নেই ইংরেজ, আমাকে পরে দোষ দিও না। তোমাদেরই হঠকারিতায় আমি এই পথে চলতে বাধ্য হচ্ছি। নইলে আমার দিক থেকে তোমাদের অনেক, অনেকবার বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তোমরা আমার সেই সৌহার্দ্যের আবেদন বার বার পা দিয়ে ঠেলে দিয়েছ…আমি এখন যে কাজ করতে যাচ্ছি, তার জন্য কোন অনুযোগ, অভিযোগ যেন পরে করো না ইংরেজ …।"

কিছুদিন পরেই আসল ব্যাপারটা বোঝা গেল। নেপোলিয়ন বার্লিন থেকে হঠাৎ ঘোষণা করলেন ইউরোপে মিত্ররাষ্ট্রের একখানা জাহাজও যেন পণ্যদ্রব্য নিয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং কোন ব্রিটিশ উপনিবেশে না যায়, খবরদার। ব্রিটিশ এলাকা এখন থেকে অবরুদ্ধ এলাকা। ইউরোপের বাণিজ্যজগতে এখন থেকে তার প্রবেশ নিষেধ, ইউরোপের ব্যবসাক্ষেত্রে এখন সে একঘরে, এখান থেকে সে নির্বাসিত। যদি কোন জাহাজকে ঐ নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতে দেখা যায়, তবে সেই জাহাজ, জাহাজের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য সেই মুহূর্তে বাজেয়াপ্ত হবে। এই ঘোষণা 'বার্লিন ডিক্রী' নামে পরিচিত। ঘোষণা কাল ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে নভেম্বর।

ইংল্যাণ্ডকে বাণিজ্য জগতে এইভাবে বয়কট করার নীতির নাম কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম। নেপোলিয়ন জীবনে বন্ধুর পথ বেয়ে ওপরে উঠেছিলেন। জীবন বা জীবননীতি যে সহজ বা মসৃণ নয়, তাও তিনি জানতেন। নেপোলিয়ন বুদ্ধিমান। নেপোলিয়ন অভিজ্ঞ। অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করার কৌশল তিনি ঠিকই বার করেছিলেন। কিন্তু একটা জিনিস নেপোলিয়ন তলিয়ে বুঝতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যে তিনি দ্বন্দ্বে পারেননি তার প্রধান কারণ ইংল্যাণ্ডের প্রবল নৌ শক্তি। ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করবার জন্য নেপোলিয়ন যে কৌশলটা নিয়েছেন, তার খেলাটাও তো সেই সমুদ্রের ওপরেই! যার ওপরে কিনা ইল্যাণ্ডের জাহাজের অবাধ গতি আর সদম্ভ চলা-ফেরা! সুতরাং সেই ইংল্যাণ্ডকে সমুদ্রপথে অবরুদ্ধ করবার সাহস নেপোলিয়ন পেলেন কোন্ যুক্তিবুদ্ধিতে! নেপোলিয়ন প্রায় হাতে হাতেই প্রমাণ পেলেন জলের ওপর ইংল্যাণ্ড কতখানি শক্তি ধরে। ইংল্যাণ্ড অর্ডার্স-ইন-কাউন্সিল বা পর পর কতগুলি পাল্টা ঘোষণা জারি করল, তাতে বলা হল ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের মিত্র রাষ্ট্রগুলির বন্দরে কোন জাহাজকে ঢুকতে দেখলেই ইংল্যাণ্ডের দিক থেকে তাকে বাজেয়াপ্ত করা হবে। অতএব তারা যেন একটু বুঝেসুঝে চলে। অর্থাৎ নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডকে যে চালটা দিয়েছিলেন,

সেটাই বুমেরাং হয়ে ফিরে এল নেপোলিয়নের নিজের বুকে। সমুদ্রকে কেন্দ্র করে এই যে দম্ভ, এটা নৌবলে বলীয়ান ইংল্যাণ্ডেরই সাজে, ফ্রান্সের সাজে না! ব্রিটিশ জাহাজ শ্যেনচক্ষু মেলে সমুদ্রের বুক চষে বেড়াতে লাগল।

১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে নেপোলিয়ন মিলান থেকে, আবার একটা আদেশ জারি করে আগেকার 'বার্লিন ডিক্রী'কে আরও কঠোর করে তুললেন। ভাবলেন, যতই যাই হোক না কেন ইংল্যাণ্ডকে তো বাণিজ্য করেই পেট চালাতে হয় এবং বাণিজ্যের লেনদেনটা তো ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেই! তবে! কতদিন ইংল্যাণ্ড অবরুদ্ধ অবস্থায় একঘরে হয়ে বাণিজ্য না করে থাকতে পারবে! যতই কেননা সে জলের বুকে রব্‌রবা দেখাক! তাকে পেটে খেতে হবে না!

মারাত্মক, মারাত্মক ভুল করলেন নেপোলিয়ন। বার্লিন ও মিলান থেকে ঐ সব ঘোষণা করবার আগে তাঁর উচিত ছিল দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনটা আরেকটু খতিয়ে দেখা, আরেকটু তলিয়ে বোঝা যে, সত্যই কন্টিনেণ্টাল সিস্টেমে ইংল্যাণ্ড জব্দ হবে কিনা। কি করে হবে! ইংল্যাণ্ডে তখন শিল্প বিপ্লব হয়ে গেছে। সেখানে নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার ফলে ইংল্যাণ্ডের উৎপাদনী শক্তি তখন অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে, তার ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ইউরোপের সব কটা দেশ ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে একটু বাণিজ্যিক সম্পর্ক পাতানোর জন্য তখন মুখিয়ে আছে। এই অবস্থায় নেপোলিয়ন যখন ইউরোপের মিত্র রাষ্ট্রগুলির ওপর আদেশ জারি করলেন, "খবরদার ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কোন বাণিজ্য নয়, এই বিষয়ে ওর সঙ্গে একটিও কথা নয়..." তখন ইংল্যাণ্ড যত না জব্দ হল, তার চাইতে অনেক, অনেক বেশী জব্দ হল নেপোলিয়নের অনুগত মিত্রপক্ষীয়েরা।

নেপোলিয়নের জীবনে প্রথম নিয়তি নেলসন তথা ব্রিটিশ নৌশক্তি। দ্বিতীয় নিয়তি এই কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম। দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়টি একেবারে নেপোলিয়নের নিজের হাতের তৈরী। ভুল, মহাভুল করলেন নেপোলিয়ন। এবার শুরু হবে ভুলের পর ভুল।

ইংল্যাণ্ডের নৌবল এক নাগাড়ে ফ্রান্স ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির জাহাজ আটক করতে লাগল। অন্য দিকে..নেপোলিয়নের কাছে আবেদনের পর আবেদন আসতে লাগল তাঁর মিত্রপক্ষীয় রাজ্যগুলি থেকে—"অবরোধ তুলে নিন, নইলে আমাদের বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা না খেয়ে মরবো…।" আবেদন নিবেদনে কোনই ফল হল না। নেপোলিয়ন কঠোরতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগলেন, কিন্তু কল্পনাও করতে পারলেন না তাঁর বন্ধু রাষ্ট্রগুলি কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডকে ভাতে মারবার যে কৌশল করেছিলেন, তা একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। শুধু তাই নয়, এরই ফলে একের পর এক জটিলতার সৃষ্টি হল, ভুলের গহ্বর খোঁড়া হল, আর একই সঙ্গে নেপোলিয়ন হারাতে লাগলেন মনের ভারসাম্য।

নেপোলিয়নের জীবনে এর পরের ভুল পোপের সঙ্গে বিবাদ। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ন পোপের সঙ্গে কন্‌করডট বা মৈত্রী চুক্তি করে কুটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েধর্মীয় সমস্যারসমাধান করেছিলেন। পোপ খুব একটা খুশি না থাকলেও ওদিক থেকে এতদিন বিশেষ কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু এখন এই কন্টিনেণ্টাল সিস্টেমের ফলে পোপের সঙ্গেও বিবাদ শুরু হল। কারণ পোপের অধিকারে যে সব বন্দর ছিল নেপোলিয়ন সে সব জায়গায় ইংল্যাণ্ডের জাহাজ প্রবেশ নিষেধ করে তাঁর ওপর নির্দেশ জারিকরলেন। পোপ এই নির্দেশ মানতে রাজীহলেন না। নেপোলিয়ন চটে গিয়ে পোপের সমস্ত জাগতিক অধিকার কেড়ে নিলেন এবং বলতে গেলে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখলেন। নেপোলিয়নের এই ব্যবহার পোপের পদমর্যাদায় দারুণ আঘাত হানল। পোপ মরীয়া হয়ে এবার তার ধর্মীয় অস্ত্র হানলেন। তিনি নেপোলিয়নকে এক্‌স্‌কম্যুনিকেট বা বহিষ্কার দণ্ড দিলেন অথাৎ ধর্মজগতে নেপোলিয়নকে একঘরে করা হল। তার মানে ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক সমাজ এবার থেকে নেপোলিয়নের প্রতি আর কোন রকম আনুগত্য দেখাবে না। পোপের এই দণ্ড নেপোলিয়নের জয়ের পথে কাঁটা

বিছিয়ে দিল। কারণ ধর্মীয় গুরুকে মানুষ এই অতি-আধুনিক যুগেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অংশ বলেই বিশ্বাস করে। কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম প্রয়োগ করার ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনে একদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে পোপের এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রকাশ—নেপোলিয়নের অলক্ষ্যে তাঁর জীবনে এক বিরাট ঝড়ের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে এল। একচক্ষু হরিণের মতো তখন নেপোলিয়ন এই নীতি প্রযোগ করার দিকেই শুধু নজর রেখেছিলেন আর উল্লসিত হচ্ছিলেন, ওদিকে আকাশের গায়ে যে লাল্‌চে মেঘ জমে উঠছিল, সেই দিকে আর চোখ পড়েনি।

পোর্তুগাল এই কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানতে রাজী হল না। কী করে মানবে, পেটের জ্বালায় মরতে হবে যে! নেপোলিয়ন কিন্তু পোর্তুগালের এই অবাধ্যতা দেখে, তার এই প্রতিবাদ জানানোর স্পর্ধায় একেবারে থ' বনে গেলেন। কোন কিছু চিন্তা না করে, ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে নেপোলিয়নের পোর্তুগাল আক্রমণ করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কব্‌জা করে ফেললেন। তারই সঙ্গে কব্‌জা করলেন স্পেনকে; যে স্পেন চিরকাল নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এসেছে। আসলে স্পেনীয় মন্ত্রী গডয়, স্পেনরাজ চতুর্থ চার্লস ও রাজপুত্র ফার্দিনান্দের অন্তঃকলহের ফলেই এমনটা হতে পারল। চতুর্থ চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। গডয় পালিয়ে গেলেন। ফার্দিনান্দ সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু বসে থাকতে পারলেন না। নেপোলিয়ন কৌশলে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে সেই সিংহাসনে বসালেন ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে। এর আগে জোসেফ ছিলেন নেপল্‌স্‌-এর অধিপতি। সেখান থেকে তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে এই নয়া ব্যবস্থা হল।

নেপোটিজ্‌ম বা আত্মীয় পোষণের এমন প্রকাশ্য উদাহরণ দেখাবার বুদ্ধি নেপোলিয়নের মাথায় এসেছিল তিনি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিলেন বলেই। থাক, একেবারে হাতের মুঠোয় স্পেন পোর্তুগাল থাক। সমুদ্রের ধারে এই দুটো দেশ একেবারে প্রত্যক্ষ অধীনে থাকলে কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করা সহজ হবে। অর্থাৎ

নেপোলিয়ন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে কেবল তাকিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের দিকে। তাকে গলা টিপে মারতে হবে এইখানে বসে। "ইংরেজ, তোমাকে জব্দ করবো আমি ইউরোপে, তোমাকে মারবার জন্য আমাকে আর ইংল্যাণ্ডে যেতে হবে না"—এই ছিল নেপোলিয়নের মনের বাসনা, একাগ্র সাধনা। সুতরাং স্পেনের সিংহাসন থেকে বুরবোঁ রাজাকে উৎখাত করে সেখানে নিজের ভাইকে বসানোর মধ্যে নেপোলিয়ন কোন অন্যায় দেখলেন না, দেখলেন না কোন অশুভ ইঙ্গিত। কিন্তু ঝড় উঠল এখান থেকেই।

নেপোলিয়ন নিজের দেশে শাসন-সংস্কার ও উদার নীতি দিয়ে প্রজাসাধারণকে শিখিয়েছিলেন দেশকে কি করে ভালোবাসতে হয়। স্বেচ্ছাচারিতা ও দুঃশাসন যে ঘৃণ্য, ধর্মের নামে উৎপীড়ন যে অন্যায়, এই সব আদর্শ প্রজাদের সামনে মেলে ধরেছিলেন। এমনভাবে ধরেছিলেন যে অন্যান্য ইউরোপীয় রাজামহারাজারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, পাছে ঐ আদর্শ তাঁদের দেশের এতদিন মুখ-বুজে-থাকা লোকগুলোকে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে করে সচেতন তোলে! সেই নেপোলিয়নের এ হেন স্বেচ্ছাচারিতা স্পেনীয়দের অনুভূতিতে এমন নাড়া দিল, দেশের অপমানে, দেশের রাজার অপমানে তারা নিজেদের এত অপমানিত মনে করল যে স্পেনে কিছুদিনের মধ্যেই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এক তীব্র অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল। নেপোলিয়ন একদিকে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে, অন্যদিকে কিছু কিছু শাসন-সংস্কার করে স্পেনকে নরমে-গরমে রাখতে চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তাতে তাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের আগুন কিছুতেই নেভানো গেল না। অথচ নেপোলিয়ন এক মারমুখী জনরোষের সামনে দাঁড়িয়ে তখনও ভাবছেন এমনি করেই তাঁর কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম সার্থক করে তুলবেন। এমন স্বপ্ন নেপোলিয়নের মতো বুদ্ধিমান লোক কী করে দেখলেন চিন্তা করা যায় না। চিন্তা করা যায় না, তিনি তখনও বুঝতে পারছেন না যে, তাঁর স্বপ্নের গায়ে কী গভীর, কী ভয়াবহ একটা ক্ষতচিহ্ন দেখা দিয়েছে!

নেপোলিয়ন নিজে যতদিন স্পেনে উপস্থিত ছিলেন, ততদিন স্পেনীয়রা গজগজ করলেও চুপ করে ছিল। কিন্তু কয়েকজন সেনাপতির ওপর ভার দিয়ে নেপোলিয়ন যে মুহূর্তে স্পেন ছেড়ে চলে এলেন, সেই মুহূর্তেই সেখানে বিপর্যয় শুরু হয়ে গেল। স্পেনীয়রা সশস্ত্রভাবে রুখে দাঁড়াল। ওখানে অবস্থানকারী ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রথমে ভ্যালেনসিয়া, পরে বেলনে স্পেনীয়দের হাতে পরাজিত হয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। মাদ্রিদ চলে গেল স্পেনীয়দের হাতে। জোসেফ বোনাপার্ট সবে-লাভ-করা সিংহাসন ও রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। খবর পাওয়া মাত্র নেপোলিয়ন এসে আবার নিজের অধিকার স্থাপন করলেন বটে, কিন্তু সেই অধিকার স্থায়ী হল না। কেন না তখন সারা ইউরোপে একটা চাপা উল্লাসের ঢল নেমে এসেছে। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে স্পেনীয়রা পরাজিত করেছে, এই সংবাদে গোটা ইউরোপ চমকে উঠল। নেপোলিয়নের স্থলবাহিনী তা হলে অজেয় নয়! তাদেরও তা হলে হটানো যায়! স্পেন পোর্তুগাল যেন সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান পেল। অবশ্য সুধার অনেকটাই যোগান দিচ্ছিল চতুর-চালাক ইংল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের সাহস ও সমর্থনেই পোর্তুগাল ও স্পেন ভয়শূন্য হয়ে একসঙ্গে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, ইতিহাসে যার নাম পেনিনসুলার ওয়ার বা উপদ্বীপের সংগ্রাম, যে সংগ্রাম নেপোলিয়নের জীবনে তিন নম্বরের নিয়তি। সময়টা ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ। সংগ্রাম চলেছিল আর ক্ষতচিহ্ন ক্যানসারের মতো বেড়ে গিয়েছিল।

এতদিন নৌ-শক্তিতে ইংল্যাণ্ড অদ্বিতীয় ছিল। এবার তার ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হলেন আর্থার ওয়েলেস্‌লী, ভারতবর্ষের এককালীন গভর্নর জেনারেল ওয়েলেস্‌লীর ছোট ভাই। ভারতবর্ষে দাদার আমলে আর্থার ওয়েলেস্‌লী মারাঠা আর মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হাত পাকিয়ে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। যে মুহূর্তে উপদ্বীপের সংগ্রাম শুরু হল, স্পেন ও পোর্তুগালের একেবারে পাশটিতে এসে দাঁড়াল

ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ড এবার স্থলযুদ্ধে অদ্বিতীয় নেপোলিয়নকে চ্যালেঞ্জ জানাল।

১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে জার আলেকজাণ্ডারের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হল। নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারকে অনেক করে বোঝাতে চাইলেন আসন্ন বিপদ ও অস্ট্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে যেন তিনি অতি অবশ্য নেপোলিয়নের পাশে এসে দাঁড়ান। আলেক-জাণ্ডার ঘাড় কাত করলেন বটে, তবে বোঝাই গেল এই ধরনের সম্মতি নেহাতই ভদ্রতার মুখোশ, অন্তরের সায় নয়। আলেকজাণ্ডার সায় দেবেন কি করে! টিলজিটের সন্ধির বিরুদ্ধে তো তাঁর নিজের মা, বোন, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাশিয়া শুদ্ধ সবাই। এই ক্ষেত্রে তিনি কি করে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং অন্য াবপদে নেপোলিয়নের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন!

নেপোলিয়ন সব কিছু বুঝলেন। টিলজিটের সন্ধি এখন স্মৃতি মাত্র। আলেকজাণ্ডারের বন্ধুত্ব অলীক। নেপোলিয়ন দুঃখিত হলেন, খুবই দুঃখ হল, তবু মুখে কিছু বললেন না। শুধু এমন একটা কিছু করতে চাইলেন যাতে তাঁর নিজের এবং ফ্রান্সের মর্যাদা আর তার সঙ্গে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। কী করা যায়!

নেপোলিয়ন তখন ভাবছেন অনেক কিছু। ভাবছেন মিত্র চাই, আর চাই উত্তরাধিকারী। জোসেফাইন নেপোলিয়নকে কোন সন্তান দিতে পারেননি। নেপোলিয়নের বর্তমান জটিলতায় ভরে উঠছে। ভবিষ্যৎকে অন্ধকার ঢেকে ফেলছে। তবে! চুপ করে তো কেবল ভাবলেই চলবে না! উপায় একটা চাই বই কি! এমন অবস্থায় থাকা যায় না। যিনি সম্রাট, তাঁকে তো শুধু বর্তমান দেখলেই চলবে না। তাঁকে ভবিষ্যতের ভাবনাও ভাবতে হবে।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর নেপোলিয়ন একটি উপায় বার করলেন। মনের মধ্যে একটু খচ্‌খচ্‌ করতে লাগতে লাগল বটে, তবে রাজনীতিতে সব সময় অত মনের বালাই ধরলে চলে না। নেপোলিয়ন জোসেফাইনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলেন। বিবাহ

বিচ্ছেদ করে কোন এক রাজকন্যাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ, প্রথমত সন্তান চাই। দ্বিতীয়ত শ্বশুরমশাই রাজা হলে বিপদের সময়, প্রয়োজনের সময় পরম মিত্র হিসেবে পাশে এসে দাঁড়াবেন, সাহায্য করবেন, পরামর্শ দেবেন।—এ বড় কম নয়। এমনটি হলে আখেরে দারুণ সুবিধে। অতএব পাত্রী চাই, রাজকন্যা পাত্রী। নেপোলিয়ন পাত্রীর খোঁজে এদিক-ওদিক লোক পাঠালেন। সকলের আগে লোক পাঠালেন রাশিয়ার সেণ্ট পিটার্সবার্গে। সেখানে ফরাসী দূত কলিনকোর্টের কাছে বলে পাঠালেন…"জার আলেকজাণ্ডারের বোন আনার সব কিছু বর্ণনা দিয়ে আমাকে শিগগীর জানাও। খুব জরুরী। তার কত বয়স! কেমন স্বাস্থ্য? বিয়ের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সন্তান ধারণ করতে পারবে তো …?"

কলিনকোর্ট খবর পাঠালেন, "মেয়ের বয়স প্রায় ষোল। বেশ স্বাস্থ্যবতী ডাঁটো, পাত্রী হিসেবে উপযুক্ত…।"

"তা হলে এখন আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা শুরু কর…সময় নষ্ট কোরো না…"নেপোলিয়নের নির্দেশ গেল।

কলিনকোর্ট জার আলেকজাণ্ডারের কাছে গিয়ে তাঁর বোনের সঙ্গে নেপোলিয়নের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

আলেকজাণ্ডার প্রথমটায় একটু চুপ করে থেকে তারপর বললেন, "আমি তো এই বিয়েতে এখনই রাজী। কিন্তু মুশকিল হবে মাকে নিয়ে। দেখি মার সঙ্গে কথা বলে, মা কী বলেন…।"

আলেকজাণ্ডারের মা আর দিদি ক্যাথারিন, যিনি ওল্ডেনবার্গের ডাচেস ছিলেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্তই মেনে নিলেন জার আলেকজাণ্ডার।

নেপোলিয়ন তাড়া লাগালেন, "কী হল, কলিনকোর্ট! খবর পাঠাও তোমার কাজ কতদূর এগোল!"

কলিনকোর্ট জানালেন, "না, কোন সুবিধে হল না। ওঁরা নানা বায়নাক্কা করছেন। বলছেন, আনা কী সুখী হবে। বিশেষ করে

নেপোলিয়ন যেমন মেজাজে চলেন! তাঁদের ঐটুকু মেয়ে কী পারবে অজানা রাজ্য প্যারিসে গিয়ে ঐ মেজাজে সামাল দিতে। আর তা ছাড়া নেপোলিয়নের সঙ্গে তাদের মেয়ের দাম্পত্য জীবন কেমন হবে কে জানে! না, এখন বিয়ে নয়। মেয়ে আরেকটু বড় হোক, আঠারো বছরে পা দিক, তারপর দেখা যাবে।"

নেপোলিয়ন বুঝলেন রাশিয়া তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং রাশিয়ার সঙ্গে আর নয়। এই প্রত্যাখ্যানের অপমান নেপোলিয়ন ভুলতে পারলেন না।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ইউরোপের এমন একজন তো চাই যে মিত্রভাবে এসে পাশে দাঁড়াবে? বিয়ের মাধ্যমে মিত্রতা পাতানো তো রাজারাজড়াদের মধ্যে একটা চল্‌তি নীতি। একদিকে সন্তান-উত্তরাধিকারীর ভাবনা, অন্য দিকে ইউরোপে একটু শান্তি নিরা-পত্তার জন্য, একটি মিত্র রাষ্ট্রের জন্য আকুলতা নেপোলিয়নকে অস্থির করে তুলল।

নেপোলিয়ন এবার অস্ট্রিয়ায় লোক পাঠালেন। শুনেছেন অস্ট্রিয়ার রাজা ফ্রান্সিসের একটি মেয়ে আছে, অষ্টাদশী, নাম মারি লুইজা।

অস্ট্রিয়ার দিক থেকে আপত্তির কিছু ছিল না, আপত্তি করার সাহসও ছিল না। সাহস থাকবে কী করে? এই তো সেদিন, এখনও এক এক বছর হয়নি, ওয়াগ্রামের যুদ্ধে, নেপোলিয়নের হাতে অস্ট্রিয়া কী মারটাই না খেল। আর সাহস আছে ফ্রান্সিসের পক্ষে নেপোলিয়নের কোন কথা অগ্রাহ্য করবার!

ফ্রান্সিসের সম্মতি দানের খবর পেয়ে নেপোলিয়ন আশান্বিত হলেন। সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে। প্রথম উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় অস্ট্রিয়া এবার থেকে পাশে থাকবে। বর্তমান ইউরোপীয় রাজনীতিতে এটুকুও বড় কম লাভ নয়।

প্রথমে বিবাহ বিচ্ছেদ। তারপর আবার বিয়ে। জোসেফাইনের সঙ্গে নেপোলিয়নের বিবাহ-বিচ্ছেদ হল ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর। স্থির হল, এবার থেকে জোসেফাইন মালমাইসনের

প্রাসাদে থাকবেন।…নেপোলিয়নের নির্দেশে জোসেফাইন উপযুক্ত বৃত্তি পেলেন। জোসেফাইন ইতিহাস থেকে এবার চলে যাবেন। এবার নেপোলিয়ন আবার নতুন করে তাঁর দাম্পত্য জীবন শুরু করবেন। রাজার জীবনে আগে রাজনীতি, তার নীচে তার ব্যক্তিগত অনুভূতি। জোসেফাইনের কাহিনী এখন থাক …এখন অন্য রাণী… …অন্য জীবন …।

নেপোলিয়ন ব্যস্ত হলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ের ব্যবস্থা কর। ঘরদোর সাজাও। তত্ত্ব তালাস কর। সম্রাটের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে বলে কথা!

নেপোলিয়ন ভেবে চিন্তে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের বিজয়কাহিনী বর্ণিত ও অঙ্কিত মস্ত মস্ত ছবিগুলি রাজপ্রাসাদের দেয়াল থেকে সরিয়ে নিলেন। বাপের বাড়ি হেনস্থা কোন্ মেয়েই বা সহ্য করে। সুতরাং সাবধান নতুন বউ মারি লুইজার চোখে যেন ঐ সব ছবি না পড়ে।

নেপোলিয়ন এবার নিজেকে তৈরী করার দিকে মন দিলেন। বয়স যতই চল্লিশ হোক, আবার তো বর বেশে যেতে হবে! সুতরাং একজন নামকরা দর্জির কাছে নিজের একপ্রস্থ নতুন পোশাক তৈরী করতে দিলেন। ওদিকে বয়সে অনেক ছোট নতুন কনে বউটির মন ভরিয়ে দেবার জন্য, তাকে খুশি করবার জন্য নেপোলিয়ন ওয়াল্‌টজ্ নাচে তালিম নিতে লাগলেন। খুব সাবধান, বাচ্চা কনে যেন একবার না মনে করে বরটি তার প্রায় বুড়ো।

যাই হোক, চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। "হার হাইনেস" যাত্রা করেছেন প্যারিসের দিকে। তাঁর অভ্যর্থনায় যেন এতটুকু ত্রুটি না থাকে। তবে প্রস্তাবিত, বহু আয়োজিত অভ্যর্থনা আর হল কোথায়। প্যারিসে পৌঁছবার আগেই তো নেপোলিয়ন পথের মাঝখানে গাড়ি থেকে মারিলুইজাকে নামিয়ে নিলেন, ধৈর্যের অভাব দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেলেন কমপেন বলে একটি জায়গায়। সেখানকার প্রাসাদেই দুজনের প্রথম পরিচয় হল, আলাপ হল। কে বলে

নেপোলিয়নের বয়স তখন চল্লিশ! তিনি সব দিক থেকেই তাঁর বালিকা বধূর যোগ্য স্বামী হলেন।

নেপোলিয়ন-মারি লুইজার বিয়ে হল ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে। মারির দিকে তাকিয়ে নেপোলিয়নের মন খুশির উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। ছুটি আয়ত চোখ, চোখের রং নীল, গায়ের রং গোলাপি, শরীরের গড়ন মাখন-নরম। ছোট ছোট হাত, ছোট ছুটি পা। পুরোপুরি মেয়েলি। কৈশোরের লাবণ্যে ঢলঢলে চেহারা।

খাওয়ার ব্যাপারে মারি লুইজার বড় পছন্দের ছিল গল্দা চিংড়ি, একটু টক্‌টক্ স্বাদের ক্রীম, আর চকোলেট। মারি বয়সে ছেলেমানুষ, স্বভাবেও তাই। একটু ভীরু। ভূতকে বড় ভয়। শোবার ঘরে বেশ কয়েকটা বাতি জ্বালিয়ে তবে ঘুম। ওদিকে নেপোলিয়ন শুধু শোবার ঘর নয়, তার আশে-পাশে করিডর পর্যন্ত অন্ধকার করে তবে বালিশে মাথা দিয়ে সুখের ঘুম ঘুমোতেন। মারি একেবারে উল্‌টো।

জোসেফাইন আর মারি লুইজা, নেপোলিয়নের জীবনে ছুটি আবির্ভাব। জোসেফাইন ছিলেন বয়সে বড়ো, স্বভাবে ধীর, রুচিশীলা, ব্যক্তিত্বময়ী। নেপোলিয়নের শয্যা-সুখের সঙ্গিনী ছিলেন জোসেফাইন। কিন্তু সেখানে নেপোলিয়নের ইচ্ছাই সব ইচ্ছা ছিল না। জোসেফাইনের ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির প্রশ্নও সেখানে নিশ্চয়ই কাজ করত।

আর মারি লুইজা! তাঁর সবে জেগে-ওঠা যৌবন-কৌতূহল নেপোলিয়নকে যেন তৃপ্তির সীমানা ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। নেপোলিয়ন মারি লুইজাকে নিবিড় সান্নিধ্যে টেনে নিয়ে চরম তৃপ্তির আনন্দে ডুবে গেলেন, পরম আনন্দ দিলেন মারি লুইজাকে। তাই বিয়ের পর প্রথম রাতে মারি লুইজার দেহের প্রতি রোমকূপে স্বামী নেপোলিয়ন যখন অস্থির-আনন্দের শিহরণ জাগিয়েছিলেন, মারি লুইজা স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন "এসো, আবার আমার কাছে এসো, আমাকে আবার আনন্দ দাও…।" নেপোলিয়নের ইচ্ছার কাছে মারি লুইজা নিজেকে নিঃশর্তভাবে সঁপে দিয়েছিলেন আর এই সমর্পিত দেহটিকে

নেপোলিয়ন ভালোবেসেছিলেন তাঁর সব কিছু দিয়ে। পাছে মারি লুইজা এই নতুন দেশে, নতুন পরিবেশে কখনও নিঃসঙ্গ বোধ করেন, তাই নেপোলিয়ন তাঁর মূল্যবান সময়ের অনেকটাই ব্যয় করতেন মারি লুইজার সাহচর্যে। দিনগুলি যেন জলতরঙ্গের মতো বেজে চলল।

মারি লুইজার গর্ভে সন্তান এল। আনন্দ আর উৎকণ্ঠায় নেপোলিয়ন দিন কাটাতে লাগলেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল গোটা ফ্রান্স। এতদিনে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আসছেন। মঙ্গলমতো তিনি আসুন এই সকলের ইচ্ছে। মারি লুইজার পরিচর্যা, সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি রইল না। নেপোলিয়নের বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন মারি লুইজা। তিনি ভালো থাকলে তবেই না গর্ভস্থ সন্তান সুস্থ দেহে পৃথিবীর আলো দেখবে! নেপোলিয়নের মুখে হাসি ফুটবে!

১৮১১ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ। মারি লুইজা মাতৃত্বের যন্ত্রণায় কাতর হলেন। নেপোলিয়ন অস্থির মনে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন খবর আসবে, ক'বার তোপধ্বনি হবে! একুশ বার! না, একশ' একবার! মেয়ে না ছেলে! এক সময় সব উৎকণ্ঠা চিন্তার অবসান হল। তোপধ্বনি হতে লাগল। এক···তুই ··তিন, ক্রমে একুশ। একুশ বারে তোপধ্বনি থামল না, থামল একশ একবারের পর। নেপোলিয়নের চোখ তুটি জলে ভরে উঠল। এই প্রথম পিতৃত্বের স্বাদ। সারা দেশে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। মালমাইসন প্রাসাদে জোসেফাইনের কাছে এই খবর জানালে জোসেফাইন নেপোলিয়নকে অভিবাদন জানালেন। নেপোলিয়ন অভিবাদনের উত্তর দিলেন, "জানো জোসেফাইন, আমার ছেলে হয়েছে কেমন গ্যাট্টাগোট্টা, স্বাস্থ্যবান অবিকল আমার মতো দেখতে। আমার মতো চোখ, মুখ, আমার মতো বুক ··।"

নেপোলিয়ন এখন সুখী, খুব সুখী। তাঁর মনে এখন সুখ আর সোয়াস্তি, তুই-ই। নেপোলিয়ন ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন যে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যখন আত্মীয়তার বন্ধন, তু দেশের রক্তে জন্ম জুনিয়র

নেপোলিয়নের, তখন তো অস্ট্রিয়া-ফ্রান্স একসঙ্গে মিলেমিশে এক মস্ত বড় শক্তি। আর এই শক্তির সাহায্যে কী না করা যায়।

সে তো যায়। কিন্তু অন্যদিকে যে বড় গোলমাল। বড় দুঃসংবাদ। সেই যে উপদ্বীপের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে, সে যুদ্ধে প্রথমটায় নেপোলিয়ন খুব সাহস ও দাপট দেখিয়ে শত্রুপক্ষকে হঠিয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। স্পেন ও পোর্তুগালের পাশে ইংল্যাণ্ড দাঁড়িয়ে, সেনাপতি আর্থার ওয়েলেস্‌লীর নেতৃত্বে ও নির্দেশে ফ্রান্স ও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যতটা মদত দেবার দিতে লাগল। পর পর যুদ্ধ হল। আর্থার ওয়েলেস্‌লী প্রথমে পোর্তুগাল থেকে ফরাসী সৈন্যদের তাড়িয়ে দিলেন, তারপরেই স্পেনে তালাভেরার যুদ্ধে আবার ফরাসীদের হারালেন। নেপোলিয়ন এর প্রতিশোধ নেবার জন্য সেনাপতি মাসেনার নেতৃত্বে স্পেন বিরাট বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু এবারেও বুসাকোর যুদ্ধে আর্থার ওয়েলেস্‌লীই জিতলেন। তারপর একে একে এল টরেস ভেড্রাস, আলবেরা, সালামাঙ্কা এবং ভিতোরিয়ার যুদ্ধ। ১৮০৮ থেকে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, উপদ্বীপের সংগ্রাম চলল। যুদ্ধগুলি হল আর প্রতিটি যুদ্ধ নেপোলিয়নের জীবনে পরাজয়ের গ্লানি বয়ে নিয়ে এল। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন না যে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে আরম্ভ করেছে।

সত্যিই পায়ের নীচে মাটি সরে যাচ্ছিল। কারণ ইতিমধ্যে রাশিয়ায় জার আলেকজাণ্ডারের কানের কাছে ক্রমাগত গুলতুনি হয়ে যাচ্ছিল। গুলতুনির গোটাটাই ছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে। নেপোলিয়নের কাছে কোন প্রতিশ্রুতি নয়, তাঁর সঙ্গে কোন সন্ধি নয়, বন্ধুত্ব তো নয়ই। কিছুতেই না। এই বিষয়ে বেশী উস্কানি দিতে লাগল অভিজাত জমিদার আর দরবারী লোকেরা। আসলে তারা ভয় পেয়েছিল। নেপোলিয়ন ডাচি অব ওয়ারশ-তে যে আইনবিধি, ও শাসন-নীতি চালু করেছিলেন, ইহুদীদের যে রাজনৈতিক অধিকার এবং ভূমিদাস সার্ফদের যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তাই

দেখে রাশিয়ার সার্ফরাও যদি নানারকম অভিযোগ এনে স্বাধীনতার অধিকার চেয়ে বসে, যদি বলে তারাও মানুষ, সুতরাং তাদের মাথার ওপর পা দিয়ে জমিদার বাবুদের আর স্ফূর্তি করা চলবে না, তাদেরও অনেক কিছু চাই—তা হলে কী হবে! সুতরাং বড়োলোকদের টনক নড়ল। রাশিয়ার সার্ফদের মনে যাতে নেপোলিয়নের এতটুকু প্রভাব না পড়ে, তারই চেষ্টা চলতে লাগল। না, নেপোলিয়ন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই হাত মেলানো নয়। কিছুতেই না। উপরন্তু, পোল্যাণ্ডের যে অংশটা নিয়ে নেপোলিয়ন ডাচি অব ওয়ারশ করেছেন, আলেকজাণ্ডারের সর্বতোভাবে চেষ্টা হবে সেইটুকু উদ্ধার করে নিজেকে পোল্যাণ্ডের রাজা বলে ঘোষণা করা।

অথচ আলেকজাণ্ডার তখনও ভেবে দেখছিলেন নেপোলিয়নের বন্ধুত্ব ঠিক এই মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলা ঠিক হবে কি না। আলেকজাণ্ডারের এই ইতস্তত ভাব দেখে সভাসদরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হল। একজন তো বলেই বসল, "আপনি যদি আপনার এই মত না পালটান, তাহলে আপনার কপালেও আপনার বাবার মতো মৃত্যু লেখা আছে। আপনার গলা টিপে আপনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হবে ···।" রীতিমতো হুমকি!

আলেকজাণ্ডার আর দ্বিরুক্তি করলেন না। তিনি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করে ওয়ারস আক্রমণের তোড়জোড় করতে লাগলেন। তিনি নেপোলিয়নের কাছে গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারশ থেকে একটা বিরাট দাবী করে বসলেন অর্থাৎ যুদ্ধ লাগানোর ছুতো তৈরী করলেন।

নেপোলিয়ন তো দাবীর বহর দেখে চটে লাল। এই সেদিন, বলতে গেলে বিনা বাক্য ব্যয়ে, রাশিয়ার হাতে গ্যালিসিয়া তুলে দিয়েছেন। আবার এখনই নতুন আবদার! নেপোলিয়ন আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। ফ্রান্সে অবস্থানকারী রাশিয়ার দূতকে আচ্ছা করে কথা শোনালেন, "এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়বো না। দেখি তোমরা, সব খরগোশের পাল, কি করতে পার। জেনে রেখ আমার হাতে এখন আটলক্ষ সৈন্য···কোন্ বন্ধু তোমাদের রক্ষা করে আমিও দেখে নেব।"

ফরাসী-রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হতে আর কিছু বাকী রইল না। জার আলেকজাণ্ডার ইংল্যাণ্ডের মৈত্রী তো পেয়েই ছিলেন, এবার বন্ধুত্ব পেলেন সুইডেনের, সুইডেনের রাজা ত্রয়োদশ চার্লসের। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মস্কো থেকে নেপোলিয়নের কাছে ঘোষণা পাঠানো হল, নেপোলিয়ন যেন কালবিলম্ব না করে প্রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের অংশ নিয়ে তৈরী গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারশ ত্যাগ করে চলে যান…।

আগুন জ্বলে ওঠার সব ব্যবস্থাই করা ছিল। এখন তাতে জ্বলন্ত কাঠিটি ছুঁইয়ে দেওয়া হল। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জুন নেপোলিয়নের বড় গর্বের গ্র্যাণ্ড আর্মি ভাসমান সেতুর সাহায্যে নীমেন নদী পার হতে শুরু করল। এই সেনাবাহিনীর মধ্যে ফরাসী সৈন্য তো ছিলই, উপরন্তু সৈন্য এসেছিল ইটালী, পোল্যাণ্ড, পোর্তুগাল, ব্যাভেরিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্য থেকে। সবশুদ্ধ কুড়িটি জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এই গ্র্যাণ্ড আর্মি। আটদিন ধরে নীমেন নদী পার হল পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য। সৈন্যরা যে যার জাতীয় পোশাক পরেছিল। নেপোলিয়ন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখলেন নানা রকমের পোশাক পরা, তালে তাল মিলিয়ে চলা ও পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর দিকে। নেপোলিয়ন দেখলেন প্রতিটি রেজিমেণ্টের সঙ্গে রয়েছে তাঁর নিজের রাজকীয় প্রতীক দুদিকে পাখা-মেলে-দেওয়া ব্রোঞ্জ ধাতুর তৈরী ঈগল পাখী। তার নীচে সাদা সাটিনের তৈরী চতুষ্কোণ ফরাসী পতাকা, তার তিন পাশে সোনালি পাড় বসানো, তাতে সোনালি রং-এর অক্ষর দিয়ে লেখা কত নম্বরের রেজিমেণ্ট, কি কি যুদ্ধ করেছে ইত্যাদি। পতাকার বাকী অংশ জুড়ে ইঞ্চিমাপের সোনালি রংএর মৌমাছি।

এই পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য ছাড়া নেপোলিয়নের আরেকটি বাহিনী ছিল ইম্পেরিয়াল গার্ড। এই সেনাবাহিনী গোড়ে তোলা হয়েছিল বাছাইকরা পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে। ঝকমকে

ইউনিফর্ম-পরা এই সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নেপোলিয়নের চোখ ফেরে না, প্রতিটি সৈন্যর ওপর নেপোলিয়নের কত ভরসা, কত না নির্ভরতা!

প্রতি ডিভিসন সেনাদলের পেছনে রইল খাদ্য-রসদ সরবরাহকারী দল। প্রায় ছ' মাইল লম্বা লাইন। হবেই। কারণ এর মধ্যে আছে বহুসংখ্যক গরু-বাছুর, অনেক অনেক গমের গাড়ি, উনুন তৈরী করবার মালমসলা, রুটি তৈরী করবার বেকারী এবং আরও কত কী। আগে খাদ্য। তারপর তো যুদ্ধ! এ ছাড়া রুশ অভিযানে ছিল দু কোটি আশি লক্ষ বোতল মদ আর বিশ লক্ষ বোতল ব্রাণ্ডি। সঙ্গে কামান রইলো এক হাজার ও যুদ্ধ করবার প্রচুর অন্যান্য সরঞ্জাম। তার সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স, স্ট্রেচার, চিকিৎসার সব কিছু! অস্থায়ী ব্রীজ করতে হবে। সুতরাং সেই সব কিছুর যন্ত্রপাতি নিয়ে ছোট-খাটো একটি কামারশালাও সঙ্গে চলল। রুশ অভিযানে যেন কোন কিছুর অভাব না পড়ে, কোন ঘাটতি না থাকে। প্রত্যেক সিনিয়র, পদস্থ সামরিক অফিসারের রইল একটি করে নিজস্ব গাড়ি। উপরন্তু বই, ম্যাপ, বিছানাপত্রাদি নেবার জন্য ছিল মালগাড়ি, আর গরুর গাড়ি। দুইয়ে মিলে হাজার ত্রিশেক। অশ্ব-অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। সব মিলিয়ে রুশ-অভিযানটি ছিল বিশাল, অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক।

নেপোলিয়ন নিজে ছিলেন ছ'ঘোড়ায় টানা সবুজ রংয়ের একটা গাড়িতে। সেই গাড়িতে তাঁর কর্মদপ্তরও ছিল। অভিযান-পথে ঐ গাড়ি থেকেই তিনি নানারকম নির্দেশ দিয়ে নোট পাঠাতেন। ঐ গাড়িতে বসেই তিনি প্রতি মুহূর্তের খবরাখবর নিতেন। ঐ গাড়িতে বসে লণ্ঠনের সাহায্যে অনেক রাত পর্যন্ত কাজকর্ম করতেন, ঐ গাড়িতেই ঘুমোতেন।

কিছু সময়ের ব্যবধানে গাড়ির ঘোড়া বদল করা হত। নইলে অত দ্রুত গতিতে গাড়ি চলবে কেন? গাড়ির চাকা চারখানা অবিরাম চলতে চলতে গরম হয়ে উঠত। ঘোড়া বদলের সময় চাকার

গায়ে বাল্‌তি বাল্‌তি জল ঢেলে চাকা ঠাণ্ডা করা হত। সেই সময় নেপোলিয়ন গাড়ি থেকে নেমে আসতেন। প্রিয় কালো ঘোড়া মারেঙ্গোর পিঠে চেপে সব দেখা শোনা করতেন। সঙ্গে থাকতো চারজন দেহরক্ষী। তারা হাতে বেয়নেট বাগিয়ে নেপোলিয়নের দিকে পেছন ফিরে চারদিকে লক্ষ্য রাখত। সম্রাট নেপোলিয়নের নিরাপদ অস্তিত্ব এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। কোনদিক থেকে এতটুকু আঁচ পর্যন্ত যেন তাঁর গায়ে না লাগে।

সন্ধ্যার সময় নেপোলিয়ন যেতেন সৈন্যদের মাঝে একটা বিশেষ ছাউনিতে। সেখানে মস্ত বড় কাঠের টেবিলের সামনে কাঠের চেয়ারে বসে নেপোলিয়ন টেবিলের ওপর মস্ত বড়ো ম্যাপ বিছিয়ে বসতেন। ম্যাপখানা খুঁটিয়ে দেখতেন। যুদ্ধাভিযানের প্রতিদিনের কর্মপন্থা নিয়ে সঙ্গী সেনাপতিদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, সব কিছু বিশ্লেষণ করতেন, আরও নানা বিষয়ে কথা বলতেন।

এই সময় নেপোলিয়নের ঘুম ভেঙে যেত ভোর ছটার সময়। ঘুম থেকে উঠে সব কিছু করণীয় কাজ সেরে এক কাপ চা অথবা একটু কমলা ফুলের মধু খেয়েই নেপোলিয়ন বেরিয়ে পড়তেন তাঁর বিশাল সৈন্য-শিবির পরিদর্শনে। বিশেষ করে দেখতেন অসুস্থ সৈন্যদের। তাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা ঠিকমতো নেওয়া হয়েছে কি না, তাদের ক্ষতস্থান বাঁধবার জন্য যথেষ্ট ও উপযুক্ত ব্যাণ্ডেজ আছে কি না, থাকলে কতটা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু দেখতেন, জানতে চাইতেন। এই সব ব্যাপারে কোনো কর্মচারীর এতটুকু কর্তব্যচ্যুতি তিনি ক্ষমা করতেন না।

নেপোলিয়নের বিরাট, বিশাল সেনাবাহিনী রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তারপর এগিয়ে চলল। গ্রামের পর গ্রাম। ধুলো-বালিতে ভর্তি, মাটির দেয়াল, মাটির কুঁড়েঘর, মানুষগুলি গাদাগাদি করে সে ঘরে বাস করে। একই চালার নীচে থাকে মানুষ, গোরু, ছাগল, শুয়োর, হাঁস, মুরগী। তার ওপর নানারকম পোকার হুল ফুটনোর জ্বালা।

ছ'শ কামান নিয়ে অদূরে অপেক্ষা করছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার রুশ সৈন্যের একটি দল। তাদের সেনাপতি ছিলেন বার্কলে। নেপোলিয়ন বার্কলে পরিচালিত সেনাবাহিনীটিকে ভিল্না নামে জায়গায় আক্রমণ করবেন বলে প্রস্তুত হলেন। ভিল্নার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছলেন। কিন্তু দেখলেন বার্কলে নেই। তাঁর অত যে বিরাট সৈন্যদল তারও কোন চিহ্ন নেই।

আসলে সেনাপতি বার্কলে জার আলেকজাণ্ডারের নির্দেশে তখন নেপোলিয়নের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের নীতি পরিহার করে চলছিলেন। এঁদের আরও যে কী সর্বনাশা পরিকল্পনা ছিল সেটা নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন যতই তিনি রাশিয়ার ভেতরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। নেপোলিয়ন বার্কলের বাহিনীকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে ভিটাভস্কে পৌঁছলেন, দেখলেন যাদের খোঁজে এতদূর ছুটে আসা, তারা সেখানেও নেই। কারণ সেই মুহূর্তে বার্কলে পৌঁছে গেছেন নীপার নদীর ধারে।

নেপোলিয়ন এবার এগিয়ে চললেন রাশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর স্মোলেনেস্কের দিকে। বিশাল বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছেই নেপোলিয়ন থমকে গেলেন। সামনের পথ জুড়ে আগুন জ্বলছে। বিরাট আগুন জ্বলছে। কার সাধ্য এগোয়। এ আগুন হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার আগুন নয়। সেনাপতি বার্কলে এ আগুন ইচ্ছে করে লাগিয়েছেন। প্রথমটায় এ আগুনে বেশ কিছু রুশ সৈন্য মারা গেল। স্মোলেনেস্ক শহরটাও পুড়ে গেল। তা যাক, শত্রুসৈন্যকে তো থমকে দিয়ে আটকে ফেলা হল, তাদের তো যথেষ্ট হেনস্থা হল! কারণ অগ্নিদগ্ধ শহরে আশ্রয় নেওয়া দূরের কথা, সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়াতেও যেন কেমন লাগে। সেখানে আর এতটুকু অপেক্ষা করলেন না। তিনি আরও ভেতরে ঢুকতে লাগলেন। যতই যেতে লাগলেন, ততই তিনি হতবাক দৃষ্টিতে দেখলেন সব খালি, সব শূন্য। বাড়ি ঘর-দোর খাঁ খাঁ করছে। বেশ কিছুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাদ্য শস্য নষ্ট করে দিয়েছে। চারদিকে শ্মশানের বিভীষিকা। এতটা

পথ বেয়ে এতখানি ভেতরে ঢুকে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী না পেল আশ্রয়, না পেল উপযুক্ত খাদ্য।

আসলে জার আলেকজাণ্ডার মিত্রপক্ষের পরামর্শে শত্রুসৈন্যদের বিরুদ্ধে যে নীতিটা নিয়েছিলেন, সেটি হল শ্মশান-নীতি বা পোড়ামাটি নীতি। শত্রুসৈন্য এগিয়ে আসুক, আমরা বাধা দেবো না, বরঞ্চ, আমরা পালিয়ে পালিয়ে যাব, আর তারা আমাদের পিছু ধাওয়া করবে, শত্রু-দেশের গভীরে, আরও গভীরে ঢুকে যাবে। তারপর বুঝবে কত বড়ো ফাঁদে পা দিয়েছে···

নেপোলিয়ন বিশাল বাহিনী নিয়ে প্রায় সাত সপ্তাহ ধরে রাশিয়ার ভেতরে, আরও ভেতরে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং যে জনপদ, যে শহর ও গ্রামের ভেতর দিয়ে গেলেন, সব জয় করলেন। জয় করলেন বিনা বাধায়। রাশিয়ার এক বিস্তীর্ণ জায়গা চলে এল নেপোলিয়নের হাতের মুঠোয়। কিন্তু এ কি জয়! সে অঞ্চলে লোক নেই, বসতি নেই, চারদিকে শুধু প্রাণহীন নীরবতা, দগ্ধ শস্যক্ষেত্রের নীরব ব্যঙ্গ, শূন্য বাড়ির ভূতুড়ে চেহারা, মাইলের পর মাইল এই রাজ্য নিয়ে নেপোলিয়ন কোন্ গৌরবে নিজেকে ধন্য মনে করবেন! এমন শ্মশান-রাজ্য যার আকাশে কিনা একটা পাখী পর্যন্ত ওড়ে না···!

নেপোলিয়ন চিন্তায় পড়লেন। গভীর চিন্তা। ভেবে দেখলেন এরপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো রাশিয়ায় আর তিনটি জায়গা আছে। একটি সেণ্ট পিটার্সবার্গ, একটি কীভ, আরেকটি হল মস্কো। এই তিনটির মধ্যে কোনটি হবে নেপোলিয়নের লক্ষ্য! আরও কিছুটা এদিক-ওদিক করে নেপোলিয়ন অবশেষে মনস্থির করলেন। মস্কো। মস্কো চলো। রাশিয়ার কেন্দ্রবিন্দু মস্কো। রাশিয়ার পুরনো রাজধানী। মস্কোর গুরুত্ব এখনও অনেক। মস্কোর গায়ে আঘাত দিয়ে রাশিয়ানদের বোঝাতে হবে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের কব্জির জোর কতখানি। তার বন্ধুত্ব উপেক্ষা করবার ফল কত তিক্ত, কত ভয়ানক।

কয়েকদল সেনাবাহিনী গাড়ি ঘোড়া পেছনে রয়ে গেল রসদ পত্রাদির সরবরাহ চালু রাখার জন্য। নেপোলিয়নের অভিযান শুরু

হল মস্কোর দিকে। এগিয়ে যাওয়ার পথে সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। সেই গ্রামের পর গ্রামের দগ্ধ চেহারা, জনহীন বাড়ি, ঘর-দোরের প্রাণহীন নীরবতা। কিছুদূর গিয়ে নেপোলিয়নের ভাগ্যাকাশে সত্যিকারের কালো মেঘ জমে উঠতে লাগল। শস্যক্ষেত্রের ওপর পোড়ামাটি নীতি প্রয়োগ করার ফলে খাবারে টান পড়ল, ঘাস পর্যন্ত রইল না। কয়েকদিনের মধ্যে কয়েক হাজার ঘোড়া মারা পড়ল। এইবার নেপোলিয়নের কপালে দু'একটি চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তবে ভাঁজ মিলিয়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগল না। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর নেপোলিয়ন পূর্ণোদ্যমে নিজের কাজ করতে লাগলেন, এরই মধ্যে প্যারিস থেকে একটা কাঠের বাক্স এল। প্যাকিং বাক্স। বাক্স খোলা হল। ভেতরে একখানা ছবি। ছবিখানা বার করা হল। দেখা গেল হাতে আঁকা সুন্দর একটি শিশুর ছবি। সবুজ ভেলভেটের কুশনের ওপর শুয়ে আছে, হাতে হাতীর দাঁতের একটি ছোট্ট খেলনা —রাজদণ্ড। ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নেপোলিয়ন উচ্ছ্বসিত ভাবে বললেন, "দেখ, আমার ছেলের ছবি দেখ। আমার ছেলে··· কিঙ অব রোম, রোমের রাজা ··এই ছেলের বয়স যদি বছর পনেরও হত, তা আজ এই মুহূর্তে সে আমার পাশে এসে দাঁড়াত··· ।"

জার আলেকজাণ্ডার কিন্তু ইতিমধ্যে রুখে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। নেপোলিয়ন মস্কো অভিমুখে আসছেন। মস্কো রক্ষা করতেই হবে। মন্ত্রিমণ্ডলী ও সভাসদদের কাছ থেকে অনুরোধ এসেছে, আর পোড়ামাটি নীতি নয়। মস্কো রক্ষার জন্য এবার যুদ্ধ করতে হবে। পুরোপুরি যুদ্ধ। রুশ সেনাবাহিনীর সেনাপতি কুটুজভ মস্কো থেকে বাহাত্তর মাইল পশ্চিমে বোরোডিনো গ্রামে পাহাড়ের ওপর তাঁর সৈন্য সাজালেন। কাছেই একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীটি গেছে একেবারে মস্কোর উপর দিয়ে।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। নেপোলিয়ন তাঁর অভিযান নিয়ে পৌঁছে গেলেন বোরোডিনো গ্রামে পাহাড়ের কাছে ঢালু জমিতে। কাছেই শত্রুসৈন্যের অবস্থান সম্পর্কে তিনি সচেতন ও সতর্ক হলেন।

বুঝতে পারলেন এবার আর পালিয়ে গিয়ে গিয়ে পেছনের শত্রুদের হাতছানি দিয়ে ফাঁদে ফেলা নয়। এবার একেবারে পুরোপুরি যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধই নেপোলিয়নের কাম্য। নইলে যুদ্ধের নামে ঐ লুকো-চুরির খেলায় শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা যায় না। অতএব নেপোলিয়ন নতুন উদ্যমে কোমর বাঁধলেন।

একদিন রাত্রিবেলা বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল। নেপোলিয়নের অনেকবার ঘুম ভেঙে গেল। পরদিন ভোরে উঠে একটু মদ খেয়ে নিলেন। শরীরটা বেশ ঝরঝরে হল। নেপোলিয়ন ঘোড়ার পিঠে চেপে সৈন্য পরিদর্শনে বেরোলেন। লক্ষ্য করলেন পাহাড়ের ওপর শত্রুসৈন্যের অবস্থান। তার প্রস্তুতি। আর তখনই বুঝতে পারলেন তাঁর সৈন্যদের উপযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র এটা নয়। কারণ যেখান দিয়ে এগিয়ে যাবেন সে সব জায়গা আর যাই হোক, অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর পক্ষে খুব সুগম নয়। এতে নেপোলিয়নের শত্রুসৈন্যের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করার যে সফল নীতি, তারও খুব সুবিধে হবে না।

সেনাপতি কুটুজভ ছাড়া সেনাপতি বার্কলেও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। প্রস্তুত ছিলেন আরও কয়েকজন সেনাপতি। যে যাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সেনাপতিরা সারি সারি দাঁড়িয়েছিলেন উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় আড়াই মাইল জায়গা জুড়ে। বোরোডিনো থেকে উটিটজা, স্মোলেনেস্ক হয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে মস্কো—সে রাস্তার ওপর এই যুদ্ধক্ষেত্র নির্দিষ্ট হল। রুশ সেনার সংখ্যা ছিল সবশুদ্ধ এক লক্ষ বিশ হাজার, কামানের সংখ্যা ছ'শ চল্লিশ। অন্য দিকে ফরাসীদের ছিল একলক্ষ তেত্রিশ হাজার সৈন্য। কামান পাঁচশ' সাতাশি···।

নেপোলিয়ন বোরোডিনো আক্রমণ করবার ভার দিয়েছিলেন জোসেফাইনের ছেলে ইউজিনের ওপর। তাঁর দক্ষতার ওপর নেপোলিয়নের গভীর বিশ্বাস ছিল। আরও যারা সেনাপতি ছিলেন, তাঁদের শরীরে বহু যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন ছিল। তাঁদের অভিজ্ঞতাকে

নেপোলিয়ন শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান করতেন। ৭ই সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় নেপোলিয়নের নির্দেশে রুশ সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ফরাসী পক্ষ থেকে প্রথম গোলা ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শত্রু-পক্ষ থেকেও উত্তর এল কামানের মুখে। তারপর শুরু হল যুদ্ধ। রুশ সেনাবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় ফরাসী সেনাপতিরা একের পর এক আহত হতে লাগলেন। নেপোলিয়ন বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখলেন রুশ সেনাদের চেহারা কি সাংঘাতিক আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। কী তীব্র ওদের যুদ্ধনীতি। প্রাণ থাকতে বুঝি ওরা হটবে না।

সেনাপতি কুটুজভ যুদ্ধরত অবস্থায় মারা গেলেন। গেলেন আর কয়েকজন। মাটি দিয়ে 'থ্রী এরোজ' নামে তিনটি পর পর বাধা-প্রাচীর তৈরী করেছিল রুশ সৈন্যরা। এখানকার সৈন্যরা ছিল সব চাইতে দুর্ধর্ষ। ফরাসী বাহিনীর সেনাপতি নে নেপোলিয়নকে অভিমত ও অনুরোধ জানালেন, সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করতে 'হবে থ্রী-এরোজ' এবং তার অভ্যন্তরস্থ সেনাবাহিনীকে। প্রথম চোটেই যদি ওদের হটানো না যায়, তা হলে আর ওদের হটানো যাবে না। ওদিকে খবর এল বোরোডিনো আক্রমণকারী ইউজিন দুর্দান্ত যোদ্ধা রুশ-কোজাক অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর দ্বারা সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত। ইউজিন আর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাতে পারছেন না। এই সব খবর পেয়ে নেপোলিয়ন শুধু একটি কথাই ভাবতে লাগলেন—সরবরাহের পথটি না বন্ধ হয়।

সুসংবাদ এল। ইউজিন বোরোডিনো দখল করেছেন। কিন্তু অন্যান্য সেনাপতিরা! তাঁরা তীব্র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে তার মোট ফল হিসেবে এখনও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে সেনাপতি নে ও সেনাপতি মুরাট কয়েক ঘণ্টা অবিরাম, অসামান্য যুদ্ধ চালালেন তিনটি সারি দিয়ে বা 'থ্রী-এরোজ' করে দাঁড়ানো দুর্ধর্ষ-রুশবাহিনী বেশ খানিকটা ঘায়েল হল। নে আরও সাহায্য পাঠালেন তাঁর ক্লান্ত সেনাপতিদের! এই যুদ্ধের সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে পরবর্তী সাফল্য। দুপুরের দিকে ফরাসী

বাহিনী সেনাপতি ফ্রাঁসোয়ার অধিনায়কত্বে আক্রমণ করলেন রুশ সৈন্যদের তৈরী আরকেটি দুর্ভেদ্য বাধা গ্রেট রিডাউটাকে। সেখানে সাজিয়ে-রাখা সাতাশটি কামানের মুখ থেকে অবিরাম আগুন ঝরতে লাগল নেপোলিয়নের বাহিনীর ওপর। দু পক্ষই মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করল। সুতরাং মৃতের সংখ্যা সীমা ছাড়াতে লাগল···। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় জানা যায়, 'পথ, পরিখা, ভেতর-বার, সব কিছু মৃত দেহের স্তূপে পরিণত হল। ছ'টি আটটি করে মৃত দেহ ওপর ওপর জড়ো হল···।'

শেষ পর্যন্ত দু পক্ষই এমন ঘনিষ্ঠ মুখোমুখি হয়ে পড়ল যে, কামানের গোলা ছোঁড়ার কোন সুযোগ রইল না। এবার আরম্ভ হল হাতা-হাতি যুদ্ধ। বেয়নেট, বর্শা, ডাণ্ডা ইত্যাদি যা হাতের কাছে পাওয়া গেল, তাই নিয়েই এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ঘায়েল করতে লাগল। সেনাপতি ফ্রাঁসোয়া সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেন। ডাক্তার সার্জেন ল্যারীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দু'শর মতো আহত সৈন্যদের হাত-পা কেটে বাদ দিতে হয়েছিল, পাছে গ্যাংগ্রীন বা আহত স্থান পচতে শুরু করে। নেপোলিয়ন শুধু দেখে যাচ্ছেন যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা। মস্কো অভিযানকে নাকি সফল করতেই হবে।

সন্ধ্যের সময় একদিকে ইউজিন, অন্যদিকে সেনাপতি নে ও মুরাট এর সঙ্গে রিডাউট আক্রমণ করলেন। এই চাপ রিডাউট সহ্য করতে পারল না, রিডাউটের পতন হল। রুশ বাহিনী পালাতে শুরু করল। পালাতে গিয়েও কামানের গোলায় বড় কম মরল না। নেপোলিয়ন এবার নিশ্চিন্ত হলেন। মস্কো যাওয়ার পথ এবার পরিষ্কার। রুশীয়-দের প্রত্যেকটি বাধা-প্রাচীর ভেঙে পড়েছে।

বোরোডিনো জয়ের হিসেব খতিয়ে দেখা গেল চুয়াল্লিশ হাজার রুশ সেনা মারা গেছে এবং আহত হয়েছে। দু হাজার বন্দী হয়েছে। ফরাসী পক্ষের ক্ষতি তেত্রিশ হাজার সৈন্য। এই জয় আনন্দের জয় নয়। ক্ষতির জয়। নেপোলিয়ন উল্লসিত হতে পারলেন না। উল্লাস করবেন কাদের নিয়ে! সেনাপতিদের মধ্যে তেতাল্লিশ জন এই যুদ্ধে মারা গেলেন, আর গেছেন বহু সামরিক কর্মচারী। এত ক্ষতি কোন

উল্লাস বয়ে আনে না, আনতে পারে না। নেপোলিয়ন নিজে অত্যধিক ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সমস্তটা রাত একবার ঘুমিয়ে, একবার জেগে কাটল। পরদিন ভোরবেলা নেপোলিয়ন ঘোড়ার পিঠে চেপে যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিদর্শন করতে বেরোলেন। কি দেখলেন? দেখলেন শুধু মৃত সৈনিকের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ। ওদের মৃত্যুতে মস্কো যাবার পথ খুলে গেছে। "কী ভীষণ যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ জীবনে করি নি···" নেপোলিয়ন নিজের মনে বলে উঠলেন। কানে এল কাতর গোঙানি। দেখলেন একটি সাংঘাতিক আহত সৈন্যের ওপরে পড়ে আছে একটি মৃত ঘোড়ার দেহ।

"এখনও বেঁচে আছে সৈনিকটি। ওকে স্ট্রেচারে তুলে নাও···।" আহত সৈনিকদের সম্বন্ধে সচেতন নেপোলিয়ন পার্শ্বচরকে আদেশ করলেন। পার্শ্বচরটি মৃদুস্বরে বলল, "আহত সৈনিকটি রুশীয়," নেপোলিয়ন রাগে চিৎকার করে উঠলেন, "তাই তাকে তোমরা তুলে নাওনি! তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করনি···। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের মধ্যে আবার বাছ-বিচার আছে। আর তাছাড়া যুদ্ধ জয়ের পর সবাই তো মিত্র, আর তো কোন শত্রুতা থাকার কথা নয়···!"

আসলে রুশীয় সেনাদের সাহস, দুর্ধর্ষতা তার সঙ্গে তাদের সহনশীলতা ও ধর্মপ্রাণতা নেপোলিয়নকে মুগ্ধ করেছিল।—

আরও কিছুটা পথ চলার পর অবশেষে এল সেই দিনটি যেদিন নেপোলিয়ন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে মস্কোয় প্রবেশ করলেন। সেদিন ছিল সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ। মস্কোয় প্রবেশ করে নেপোলিয়ন তাকিয়ে দেখলেন চারদিক। এতদিন ধরে শুধু দগ্ধ মাটি পার হয়েছেন। দেখেছেন শুধু শূন্যতা আর ধ্বংস। এবার দেখলেন মস্কোর রাজকীয় চেহারা। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। বিশাল সব রাজপ্রাসাদ আর কত চার্চ। এসব কিছুতে শুধু তো স্থপতি বিদ্যার পরিচয় নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অপূর্ব শিল্পসম্ভার। সৌন্দর্য-পিয়াসী নেপোলিয়ন মুগ্ধ হয়ে মস্কো দর্শন করলেন। চার্চের আর বিরাট প্রাসাদ গায়ে সেদিন উজ্জ্বল সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করছিল।

"শেষ পর্যন্ত তাহলে আমি এখানে এলাম,...আমি এলাম ..।" নেপোলিয়ন নিজের মনে বললেন।

নেপোলিয়ন রাজপ্রাসাদে উঠলেন। ইতালীয় শিল্পে রুচির ছাপ প্র্যাসাদের প্রতিটি পাথরের গায়ে। এতদিনের ক্লান্তিকর পথ-শ্রমের পর এই আশ্রয় বড় আরামের। বড় ভালো-লাগা আরাম। সেনাপতিরা, সৈনিকরা সবাই ক্লান্তি দূর করার বিশ্রাম পেয়ে উল্লসিত। অনেকদিন পরে সকলে পেটভরে, তৃপ্তি করে রয়ে সয়ে খেল। খানিকটা হৈ হল্লা হল। অত্যন্ত পরিশ্রমী, মূক প্রাণী সেনাদের বন্ধু, ঘোড়াগুলি কতদিন পরে পেটভরে ঘাসবিচালি খেল।

নেপোলিয়ন ছেলের ছবিখানা খুলে ফায়ার প্লেসের ওপর ম্যান্টেল পিসে সকলের দর্শনীয় করে বসিয়ে রাখলেন। ফ্রান্সের ভাবী সম্রাট, প্রথম নেপোলিয়নের পর দ্বিতীয় নেপোলিয়ন। আজকের শিশু দিনে দিনে বড় হবে, তাকে নিয়ে বাপ নেপোলিয়নের কত আশা, কত স্বপ্ন...

নেপোলিয়ন মস্কোয় প্রবেশ করলেন, ঠিকই। কিন্তু মস্কো জয় করলেন কি? কই, এ দেশীয় একটা লোকও তো এগিয়ে এল না বিজয়ী সম্রাট-সেনাপতিদের কাছে নতশিরে অভিবাদন জানাতে। বিজয়ী দলকে অভ্যর্থনা জানাতে কই রাজপথের দুপাশে তো কোন জনতার ভিড় ছিল না! এ জয়ে শুধু অহঙ্কার আছে, উল্লাস নেই। প্রাপ্তি আছে, সন্তোষ নেই। খাওয়া-দাওয়া, খানিকটা হুল্লোড় সবই হল, নিশ্চিন্ত বিশ্রামের ব্যবস্থাও হল, তবু একটা বুক চাপা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হলেন সেনাপতিরা সবাই। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। থমথমে তো লাগবেই। এতবড় একটা শহরে লোক কোথায়? গোটা মস্কোই যেন ঘুমিয়ে আছে। যা কিছু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে ফরাসী বাহিনীর। না জয়ের আনন্দ একে বলে না।

মস্কোবাসীরা এই সময় সত্যিই মস্কোয় ছিল না। বোরোডিনোর যুদ্ধের পর গভর্নর রস্টোপচিনের আদেশে সকলে মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আড়াই লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র পনেরো হাজার

লোক মস্কোতে থেকে গিয়েছিল। মানে তাদের সেখানে ইচ্ছে করে ফেলে যাওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু ছিল বাইরের লোক। বাদবাকি ছিল জেলখাটা চোর ছ্যাঁচোড়, আর কোথাও না-আশ্রয়-পাওয়া ভিখিরীর দল। জেলখানার ফটক খুলে অপরাধীদের বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছিল। কেন, সে কথা পরে···।

নেপোলিয়ন ক্রেমলিন প্রাসাদে প্রবেশ করে প্রথম দিনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জার আলেকজাণ্ডারের কাছে শান্তির প্রস্তাব দিয়ে পাঠাবেন আর যুদ্ধ নয়, ধ্বংস নয়। নেপোলিয়ন তো প্রথম থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করেছেন। একবার তো বন্ধুত্ব করেও ছিলেন। সে ভাব বজায় থাকলে তো এই কষ্টকর অভিযানের কোন দরকারই হত না। যাই হোক, আলেকজাণ্ডার যখন বোরোডিনোর যুদ্ধে হেরে গেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছেন। অতএব নেপোলিয়ন ভেবেই নিলেন তাঁর শান্তি-প্রস্তাবে জার আলেকজাণ্ডার রাজী হবেনই হবেন।

নেপোলিয়ন পূর্ণ বিশ্বাসে পরম আস্থা নিয়ে এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে সেই রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ একটা সোরগোলে, লোকজনের চিৎকারে নেপোলিয়নের ঘুম ভেঙে গেল। কী ব্যাপার! ব্যাপার ভালো নয়। রাত্রিবেলা কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এ কী হল! এদিক-ওদিক আগুন জ্বলছে! গাছ-পালা, বাড়িঘর দোর পুড়ছে! নেপোলিয়ন থ, থ তাঁর সঙ্গী সেনাপতি ও সৈন্যরা। কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। আগুন নেভাতে হবে, নইলে ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ? লোকজনেরা হোস পাইপ আর জল পাম্পের জন্য এদিক ওদিক খোঁজ করল। কিন্তু অতবড় একটা শহরে ঐ ছুটি জিনিসের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, আশ্চর্য! অগত্যা শেষ পর্যন্ত বালতি করে করে জল ঢালা হল।

পরের দিন রাত্রিবেলা আবার সেই আগুন। আগুন তার লেলিহান জিহ্বা বার করে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল, বাড়িঘর-দোর পুড়তে লাগল। আবার সেই খানিকটা সময় থ হয়ে থাকা,

তারপর ছুটোছুটি, হোস পাইপ ইত্যাদির খোঁজ করা। তারপর না পেয়ে বাল্তি বাল্তি জল ঢালা। তবে আগুন যেভাবে লাফাতে লাফাতে ছড়াতে লাগল, তাতে বাল্তি দিয়ে জল ঢালা মানে নেহাতই নিজেকে চোখ ঠারা। এর মধ্যে আবার বইতে লাগল উত্তুরে হাওয়া। আগুনের পোয়া বারো। আগুন ক্রমেই এগোতে লাগল ক্রেমলিনের দিকে।

কী ব্যাপার! রোজই রাতে আগুন! এ তো কোন প্রাকৃতিক বা ভূতুড়ে ব্যাপার নয়। নেপোলিয়নের কপালে ভাঁজ পড়ল। নিশ্চয়ই এ কাজ মানুষের এবং তারা শত্রুপক্ষের লোক। সত্যিই তাই। মস্কোর গভর্নর রস্টোপচিনের আদেশে মস্কোর অধিবাসীরা শহর ত্যাগ করে গিয়েছিল। চোর, খুনে, অপরাধী যারা ছিল, তাদের নিয়ে রস্টোপচিন একটা দল করে তাদের হাতে বারুদ, পল্তে দিয়ে প্রতি রাতে মস্কোর বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনি মস্কো থেকে সব হোস পাইপ, জল পাম্প করার জিনিসপত্র অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছিলেন। মরুক, ফরাসীরা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক। দেখুক "গেরিলা" যুদ্ধ কাকে বলে।

দ্বিতীয় দিনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ক্রমে ক্রেমলিনের দিকে এগিয়ে এল। সবাই ব্যস্ত হল। কারণ ক্রেমলিনে শুধু যে ফরাসী সৈন্য-লোকজনেরাই ছিল তাতো নয়, সেখানে ছিল যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম—বারুদ, কামান, বন্দুক ইত্যাদি। এতে যদি ঐ সাংঘাতিক আগুনের এতটুকু তাপ লাগে তবে যে গোটা শহরটা কেঁপে উঠে শেষ হয়ে যাবে—মানুষ তো দূরের কথা। নেপোলিয়ন সেখানে থাকাটা আর সমীচীন মনে করলেন না। সদলবলে চলে গেলেন ছ'মাইল উত্তরে পেট্রোভস্কির প্রাসাদে। পরের কয়েকটা দিন ধরেও সমানে আগুন জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল। আগুন ছড়িয়ে পড়ে শহরের অনেকখানি গ্রাস করল। প্রায় আট হাজারের মতো বাড়ি পুড়ে গেল। চেহারাটা হল ঠিক সেই অতীত যুগের পম্পে বা হারকিউলেনিয়মের মতো।

নে-১৩

নেপোলিয়ন শান্তির প্রস্তাব পাঠানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করেননি। জার আলেকজাণ্ডার তখন সেণ্ট পিটার্সবার্গে। নেপোলিয়ন সেখানে লোক পাঠালেন। প্রস্তাব দিলেন, তিনি জার আলেকজাণ্ডারের বন্ধুত্ব কামনা করছেন। যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি চাইছেন।

দু'সপ্তাহ লাগবে ওখান থেকে উত্তর আসতে। নেপোলিয়ন সাগ্রহে উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু অপেক্ষা করাই সার হল। কোন উত্তর এল না। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর নেপোলিয়ন আবার লোক পাঠালেন। আবার ব্যর্থ হলেন। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন জার নেপোলিয়নের প্রস্তাবে সায় দেবেন না।

নেপোলিয়ন এবার ধৈর্য হারালেন, অস্থির হলেন। জারের এই নীরব অপমানের উত্তরে তাঁকে একটা কিছু তো করতে হবে! এখানে বসে আশায় আশায় দিন গুণলে তো চলবে না! নেপোলিয়ন প্রথমে স্থির করলেন সেণ্ট পিটার্সবার্গে যাবেন। তারপর ঠিক হল স্মোলেনস্কের ভেতর দিয়ে লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডে চলে যাবেন। আসন্ন শীতটা সেখানেই কাটাবেন। এই সব তানানানা করতে গিয়ে বেশ কয়েক দিন দেরী হল। ১৫ই অক্টোবর মস্কো নগরীতে তিন ইঞ্চি বরফপাত হল। প্রকৃতির এই ক্রূর ইঙ্গিত সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের গ্রহণ করা উচিত ছিল অর্থাৎ আর দেরী নয়, এবার মস্কো ছাড়ো। নইলে বরফের কামড়ে মরতে হবে। ১৮ই অক্টোবর হঠাৎ একটা রুশ বাহিনী ফরাসী সেনাপতি মুরাট ও তাঁর বাহিনীকে আচম্‌কা আক্রমণ করে বসল। বহু যুদ্ধে বিজয়ী মুরাট এই হঠাৎ আক্রমণে থতমত খেয়ে গেলেন, পরাজিত হলেন। হাজার আড়াই ফরাসী সৈন্য মারা গেল। নেপোলিয়ন এইবার স্থির সিদ্ধান্তে এলেন, "আর এখানে নয়। এবার তাঁবু তুলতে হবে। আমরা কালকেই মস্কো ছেড়ে রওনা দেব। ফিরে যাবার জন্য সব তৈরী হও।"

পরদিন। বেলা দুটোর সময় নেপোলিয়নের গ্র্যাণ্ড আর্মির প্রথম ব্যাচ মস্কো ছাড়ল, আর সেই দলকে অনুসরণ করে চলল বাদ বাকি সবাই। সেনাবাহিনীর বেশীর ভাগ পরেছিল চামড়ার

কোট, লোমশ টুপি, তারই জুতো। তাদের সঙ্গে চলল চিনি, ব্রাণ্ডী, রাশিয়ার কাছ থেকে পাওয়া দামী পাথরবসনো ধর্মীয় মূর্তি, চায়না সিল্ক, সোনা, নানারকম যুদ্ধ-বর্ম ও আরও নানান জিনিস। সেনা-বাহিনীর মধ্যে ছিল নব্বই হাজার পদাতিক, পনেরো হাজার অশ্বা-রোহী, পাঁচশ' উনসত্তরটি কামান, আর দশ হাজার ওয়াগন বা গাড়ি। এদের খাদ্য ছিল কুড়ি দিনের। তবে ঘোড়ার খাদ্যের যোগান ছিল মাত্র সাত দিনের।

নেপোলিয়ন বিশেষ ব্যবস্থা করলেন আহতদের জন্য। তাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে অনেক যত্নে অনেক সতর্কতার সঙ্গে। ইতিহাসে নেপোলিয়নের জীবনীকে কেবল বারুদের গন্ধ দিয়ে বিষাক্ত করা হয়েছে। তাঁর এই মহত্ত্ব, আহত অসহায়দের জন্য এই মানবতা-বোধ সেই বিষের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। নেপোলিয়ন যোদ্ধা না হয়ে যদি শুধু শাসক হয়েই নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমারেখা টেনে রাখতেন, তা হলে বলা যায় না তাঁর ইতিহাস কোন্ গৌরবের কাহিনী হয়ে লেখা থাকত।

যাত্রা শুরু হল। মানুষের দীর্ঘ লাইন। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। বরফ পড়বার ফলে রাস্তায় একটু কাদা হয়ে গেছে। গাড়ির চাকা সেজন্য খুব জোরে ঘুরতে পারছে না। না পারুক, তাড়া কিসের এ তো আর যুদ্ধ অভিযান নয়…!

পাঁচটি দিন চলে গেল। ছ'দিনের দিন। ভোরবেলা। নেপোলিয়ন একটা খোড়ো কুটীর থেকে বেরিয়ে এলেন। সারারাত ঐ ঘরেই বিশ্রাম নিয়েছেন, ঘুমিয়েছেন। নেপোলিয়ন ঘোড়ার পিঠে উঠলেন, পাশাপাশি চললেন আরও কয়েকজন সেনাপতি—কলিনকোর্ট, বার্থিয়ার এবং র‍্যাপ। ইউজিন কাছেই একটা রক্ষাপ্রাচীর গড়ে তুলে-ছিলেন। নেপোলিয়ন সেটাই পরিদর্শন করছিলেন। দূরে ডানদিকে একটা বনান্তরেখা। তার পেছনে বন। হঠাৎ নজরে পড়ল ওখানে ওরা কারা! একদল ঘোড়সোয়ার! এদিকে এত তীব্র গতিতে ছুটে আসছে কেন?

কলিনকোর্ট চিৎকার করে উঠলেন, "কোজাক, কোজাক সৈন্য এগিয়ে আসছে। আমাদের আক্রমণ করবার জন্যই ওরা এত ছুটে আসছে।

"অসম্ভব, এখানে কোজাকরা কিছুতে আসতেই পারে না।" নেপোলিয়ন চেঁচিয়ে উঠলেন।

কলিনকোর্ট কিন্তু ঠিকই দেখেছিলেন, ঠিকই বুঝেছিলেন। ওরা সত্যিই দুর্ধর্ষ কোজাকবাহিনী। আঁটোসাঁটো পোশাক পরা, মাথায় ভেড়ার চামড়ার কালো টুপি, হাতে তীক্ষ্ণ ধারালো বর্শা, পিস্তল। কারও হাতে তীক্ষ্ণ-মুখ তীর ও ধনুক। ছোট অথচ তীব্র গতিসম্পন্ন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওদের আক্রমণ বড় ভয়ানক, প্রাণঘাতী। বনের আড়াল থেকে অন্ততঃ হাজার পাঁচেকের মতো কোজাক সৈন্য বেরিয়ে এল। মুখে তাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার—"হুর্‌রা, হুর্‌রা…"

নেপোলিয়ন এই হঠাৎ আক্রমণে বিচলিত হলেন না। তিনি শান্তভাবে সৈন্যদের এই বিপদের মোকাবিলা করতে নির্দেশ দিলেন। একেবারে মুখোমুখি, হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হল। রক্তপাত হল। ঘোড়া মরল। মানুষ মরল। কোজাকদের দৃষ্টি পড়ল রসদ ও নানা দ্রব্যে-ভর্তি গাড়িগুলির ওপর। লুঠেরা মনোভাবের অধিকারী কোজাকরা গাড়ির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী তখন সহজেই তাদের কাবু করে ফেলল। কোজাকরা পালিয়ে গেল। নেপোলিয়ন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, নিশ্চিন্ত হলেন। রাতটা বেশ ভালো কাটল। তার পরদিন থেকে আবার যাত্রা শুরু হল। কিছুদূর চলার পর নেপোলিয়ন যেন দুঃস্বপ্ন দেখলেন। পথ আটকানো। সামনে চলার পথ একেবারে আটকানো। রুশ সেনাপতিরা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ ঐ রাস্তাটাই নেপোলিয়নের ফিরে যাওয়ার প্রধান পথ।

বাধ্য হয়েই নেপোলিয়নকে পথ বদল করতে হল। যে পথ ধরে মস্কো এসেছিলেন, তাঁকে সে পথ ধরেই ফিরতে বাধ্য করা হল। নেপোলিয়ন আবার পথ চলতে শুরু করলেন বটে; কিন্তু চিন্তায় মন

ভারি হয়ে উঠল। ভারি হবেই, কারণ সে পথে তো শুধু পোড়া মাটির ছাই, সে পথে কেবল অনাহার আর মৃত্যুর বিভীষিকা। সে পথ ধরে মস্কোয় আসার স্মৃতি কি নেপোলিয়ন ভুলতে পেরেছেন, না পারবেন? অথচ সেই পথ তিনি কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারলেন না, এমনই কৌশল রাশিয়ার!

নেপোলিয়ন তাঁর বাহিনী নিয়ে অগত্যা এগিয়ে চললেন। পুরনো পথের সেই পুরনো দৃশ্য। চারদিকে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কোথাও কণামাত্র খাদ্য রুশীয়রা রেখে যায়নি। এই আঘাত কামানের গোলার আঘাতের চাইতে অনেক অনেক বেশী মারাত্মক। এর ওপর আবার শুরু হল রাশিয়ার শীত-সেনাপতির খেলা। নেপোলিয়ন ভুল করেছিলেন। মারাত্মক ভুল করেছিলেন মস্কোয় সময় নষ্ট করে। সেখানে মিথ্যে আশায় বসেছিলেন জার আলেকজাণ্ডার বুঝি তাঁর শান্তির প্রস্তাবে সায় দেবেন। আর ভুল করেছিলেন শীতকালে রাশিয়ার প্রকৃতি কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে সেটা বুঝতে না পেরে।

নেপোলিয়ন জানতেন রাশিয়ায় শীত অত্যন্ত বেশী। তবে এতটা? রাশিয়ায় শীত ঋতুর চেহারা এত ভয়ঙ্কর?

২৯শে অক্টোবর থেকে বরফ পড়া শুরু হল। তার পরদিন শুরু হল তুষার ঝড়। রুশীয়রা নিশ্চিন্ত, জার পরিবার খুশি। তাদের দেশকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে বাঁচাতে শীত ঋতুর তুলনা নেই। নেপোলিয়ন চারদিক তাকিয়ে দেখলেন! যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু সাদা বরফের চাদর ঢাকা। চারপাশে সাদা বরফের নিরেট দেয়াল। বরফের গাছ, বরফের বাড়ি—সব কিছু বরফে ঢাকা। সব চাইতে দুঃসহ হল ঘোড়াগুলির অবস্থা। ওদের জন্য মাত্র এক সপ্তাহের খাদ্য নেওয়া হয়েছিল। ভাবা গিয়েছিল ফেরার পথে আরও খাদ্য পাওয়া যাবে। নিরাপদ আশ্রয় মিলবে। সে পথে যে সেনাপতি কুটুজভ আটকে দেবেন, তাতো ভাবা যায়নি। পেটের জ্বালায় বোবা, নিরীহ ঘোড়াগুলি পাইন গাছের বাকল চিবিয়ে খেতে লাগল। মরে গেল অনেক।

ওদিকে বরফপড়া পিচ্ছিল পথে সেনাবাহিনীর বন্দুক কামান নিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত অপারগ হয়ে সৈনিকরা বন্দুক-কামান পথে ফেলে যেতে লাগল, শুধু মানুষ এগিয়ে গেল। নিকটতম গন্তব্য স্থান স্মোলেনস্ক দু'শ মাইল দূরে। সেখানে গিয়ে তবে আশ্রয়, তবে খাদ্য। এখন শুধু এগিয়ে চল। টেনে হোক, হিঁচ্‌ড়ে হোক, শরীরটাকে চালু রাখ। এখনও দু'শ মাইল···।

নভেম্বর মাস পড়ল। ছ তারিখের রাতটা বড় ভয়ঙ্কর হল। সেদিন অবিরত তুষারপাত হতে লাগল। তাপমাত্রা নেম গেল হিমাঙ্কের অনেক নীচে। চারদিকের চেহারা ভুতুড়ে হয়ে উঠল। মানুষগুলি কাঁপতে লাগল। শরীরের যতখানি ঢাকা ছিল, সেগুলি রক্ষা পেল। কিন্তু ঠোঁট, নাক ফেটে ক্ষতের সৃষ্টি হল। দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হল, কতজন দৃষ্টি চিরকালের মতো হারাল। আর এরই মধ্যে বার বার তারা আক্রান্ত হল কোজাকদের দ্বারা। ইতিমধ্যে রুশীয় কৃষকদের ওপর একটা নির্দেশ এল। এই নির্দেশ ছিল বড় ভয়াল, বড় সাংঘাতিক। তারা ফরাসী সৈন্যদের ভেতর থেকে যখন যাকে পারল সুযোগ মতো হঠাৎ হঠাৎ ধরে নিয়ে যেতে লাগল। নিজেদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে তাদের আকণ্ঠ ব্রাণ্ডি খাওয়াত, সেই নেশায় বুঁদ যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ত তখন তাদের গলা কেটে শুধু ধড়গুলিকে কবর দিতে লাগল। ধরে নিয়ে গিয়ে নিধন করবার আরও রকমফের ছিল। রুশীয়দের প্রতিরোধ ও নিধনব্যবস্থায় নেপোলিয়ন আতঙ্কে শিউরে উঠলেন।

সৈনিকদের অবস্থা ক্রমেই সঙিন থেকে সঙিনতর হয়ে উঠল। শুধু একটু খাদ্য আর আশ্রয়ের প্রয়োজন, আর সব কিছু তারা ভুলে গেছে। যেই রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতো, তার সঙ্গে নেমে আসতো মৃত্যুর শীতলতা। তখন মানুষগুলি একটু আশ্রয়ের জন্য কী না করত? মৃত ঘোড়ার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার করে সেখানে নিজেকে ঢুকিয়ে শরীর গরম রাখবার চেষ্টা করত। কখনও ঘোড়ার গা থেকে গড়িয়ে-পড়া জমে-যাওয়া রক্ত খেত। সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে যখনই কেউ মারা

যেত, সঙ্গে সঙ্গে তার জুতো খুলে নিয়ে নিজের ব্যাগে পুরে ফেলত। পাগলের মতো হাতড়ে হাতড়ে দেখত তার হ্যাভার স্যাকে কোন খাবার আছে কিনা, নেবার মতো আর কী আছে। তারই সঙ্গে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে দেখা হত আর কেউ মর-মর বা মরছে কি না। সঙ্গী-সাথীর মৃত্যু যে এত মধুর আগে জানা যায়নি তো!

মানুষ তখন মানুষ নেই। তার মধ্যে তখন আর কোন অনুভূতি নেই। নেই কোন মানবিক চেতনা।

অবশেষে নেপোলিয়ন বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্মোলেনস্কে পৌঁছলেন। ভেবেছিলেন ফরাসী বাহিনীর অবশিষ্ট সৈনিকরা একটু খেয়ে বাঁচবে, আশ্রয় পেয়ে একটু আরামের নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু বৃথা আশা। সেখানে রুশীয় সেনারা উত্তর ও দক্ষিণ দু'দিক থেকে তাদের ওপর আক্রমণ চালাল। উদ্দেশ্য নেপোলিয়নকে কবর দেওয়া। নেপোলিয়ন যেন কিছুতেই সামনে এগিয়ে চলার পথে বারেসিনো নদী পার হতে না পারেন।

স্মোলেনস্কে নেপোলিয়ন পাঁচদিনের বেশী থাকতে পারলেন না। বিরাট বাধা বারেসিনো নদী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার হতেই হবে। নইলে ধ্বংস অনিবার্য। ১৪ই নভেম্বর থেকে আবার চলা শুরু হল। এ চলায় এবার প্রকৃতির চাইতে মানুষের রোষ বেশী। নেপোলিয়ন অতি সতর্কতার সঙ্গে তাঁর সেনাপতিদের এক এক জনের ওপর এক একদিকের ভার দিলেন। চারদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। চার দিকেই আছে রুশীয় সেনাপতি আর সেনাবাহিনী। বারেসিনো নদী পার হবার যে ব্রীজ, সেখানে যে রুশীয় সেনাবাহিনী আগেই চলে গিয়ে কড়া পাহারা দিচ্ছে, সে খবর নেপোলিয়ন পেয়েছেন। ২২ শে নভেম্বর নেপোলিয়ন একটা দুঃসংবাদে স্তম্ভিত হলেন। শত্রুসৈন্য নাকি বারেসিনো ব্রীজ পুড়িয়ে দিয়েছে অর্থাৎ নেপোলিয়ন এবং তার গ্র্যাণ্ড আর্মিকে একেবারে আটকে ফেলা হল। সকলের মনে শুধু একটাই আশঙ্কা খেলে গেল। সেটি হল নেপোলিয়ন এবার নিশ্চয়ই রুশীয়দের হাতে বন্দী হবেন। কারণ ইতিমধ্যে চারদিকে বেশ ফলাও

করে প্রচার করা হচ্ছে, নেপোলিয়ন কে, দেখতে কেমন···বেঁটে, ফ্যাকাসে, ভারি মোটা ঘাড়, মাথার চুল কালো···।

নেপোলিয়নের মনেও ঐ একই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এমন কি ওরকম হতে পারে ভেবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেললেন। তবে যতই শঙ্কিত হোন, নেপোলিয়ন কিন্তু কিছুতেই আশা ছাড়লেন না। এমন কি তিনি আবার উদ্যোগ আয়োজন করে, সব জেনে শুনে বারেসিনো নদীর দিকেই এগিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন সত্যিই শত্রুপক্ষ খুব ভালো করেই তাদের কর্তব্য পালন করেছে। অমন যে তিনশ' গজ চওড়া বারে-সিনো ব্রীজ, তাকে কিনা তিন তিনটি জায়গায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এই ভাঙা ব্রীজ তো সংস্কার করাও যাবে না। শত্রুপক্ষ ঘন ঘন কামান ফাটাচ্ছে। নেপোলিয়নের হাতে তখন ঊনপঞ্চাশ হাজার সৈন্য আর আড়াইশো কামান এবং এই সেনাবাহিনী যুদ্ধ করবে যাদের সঙ্গে তাদের সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার! ফরাসী সৈন্যসংখ্যার তিন গুণ বেশী! এদিককার একজন সৈন্য কি ওদিককার তিন জনের সঙ্গে একা লড়াই করে জিততে পারে! রুশীয় সেনাপতিরা তখন সামনে-পিছনে, নদীর এপার-ওপার থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে। কোন দিকে নড়বার বা কিছু করবার কোন সুযোগ নেই।

নেপোলিয়ন যখন ভেবেচিন্তে কোন কুল কিনারা পাচ্ছেন না, ঠিক সেই সময় কর্বিনো নামে একজন সামরিক কর্মচারী খবর দিলেন, ন' মাইল দূরে স্টুডিয়েঙ্কা নামে একটা গ্রামের কাছে বারেসিনো নদী পার হওয়ার দারুণ সুযোগ রয়েছে। সেখানে নাকি এমন একটা জায়গা আছে যেখানে বারেসিনো নদীটি মাত্র একশ' গজ চওড়া এবং কোথাও ছ' ফুটের বেশী গভীর নয়।

এমন জায়গায় সন্ধান পেয়ে নেপোলিয়ন লাফিয়ে উঠলেন। আর দেরী নয়। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। ওখানে গিয়ে নতুন ব্রীজ তৈরী করতে হবে। ওপারে যেতেই হবে। নইলে এখানে তো আটকে পড়ে ইঁদুরের মতো মরতে হবে।

পরদিন নেপোলিয়ন সদলবলে যাত্রা করলেন। স্টুডিয়েঙ্কা গ্রামে পৌঁছে একটা ময়দা কলে আশ্রয় নিলেন। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী এখানে এসেই ব্রীজ তৈরী করার কাজে লেগে গেল। পাশাপাশি তুটো ব্রীজ হবে। একটা সৈন্যদের পায়ে হেঁটে যাবার জন্য। আরেকটি থাকবে কামান, গাড়ি ইত্যাদি ভারি মাল-পত্তর নেবার জন্য। অবিরাম খাটতে লাগল এতদিনের না-খাওয়া, না-বিশ্রাম করা লোকগুলি। সমবেদনায়, কৃতজ্ঞতায় নেপোলিয়নের বুক ভারি হয়ে উঠল। নেপোলিয়ন নিজে ওদের হাতে মদের পাত্র তুলে দিলেন। অসীম শ্রান্তির একটুখানি অন্ততঃ দূর হোক।

বেলা চারটের মধ্যে ব্রীজ তুটো তৈরী হয়ে গেল। নেপোলিয়ন সবাইকে নির্দেশ দিলেন ধীরে, সাবধানে ব্রীজ পার হয়ে ওপারে যেতে। প্রথমে এগারো হাজার সৈন্য চলে গেল। তারপর গেল অনেক অশ্বারোহী, ভারি কামান ও গাড়ি।

হঠাৎ এদিকে চোখ পড়ল একজন রুশ সেনাপতির। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে নেপোলিয়ন কী চতুরতার সঙ্গেই না নদী পার হবার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সেনাবাহিনী রুশীয় সৈন্যদের হাতে আক্রান্ত হল। ফরাসী সেনাপতি নে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এই আক্রমণ ঠেকাতে লাগলেন আর ঐদিকে নেপোলিয়ন ব্রীজ দিয়ে তাঁর সেনাবাহিনীকে ওপারে পাঠাতে লাগলেন। তারপর নিজে গেলেন। রুশ আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হল। শেষ পর্যন্ত আট হাজারের মতো লোক আর ব্রীজ পার হতে পারলো না, এপারে রয়ে গেল। কারণ ব্রীজের ওপর তখন তীব্র আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। বারেসিনো নদী পার হওয়ার ঘটনা ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়।

ঠিক এই সময় প্যারিসে মালাট বলে একজন লোক ক্রমাগত রটিয়ে বেড়াচ্ছিল নেপোলিয়ন নাকি মস্কোতে মারা গেছেন। রাজনীতিতে এই ধরনের রটনা বড় ক্ষতিকর, বড় খারাপ। এতে অনেক অঘটন ঘটে। যাই হোক নেপোলিপয়ন এরপর কলিনকোর্ট প্রভৃতি কয়েকজন

সেনাপতিকে নিয়ে স্লেজে করে এগিয়ে গেলেন। গন্তব্য স্থল নীমেন নদী পার হয়ে গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারশ। ওরা যখন ভিল্না থেকে কোভনো বলে একটা জায়গায় যাচ্ছিলেন, তখন অবিরাম বরফ পড়ছিল। নেপোলিয়নের গায়ে ছিল ভাল্লুকের চামড়ার পোশাক, তবু তিনি শীতের চোটে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলেন। অস্থির হচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গী সেনাপতিরাও। শীতের দাপট যে কতখানি ছিল সেটা জানা যায় পরবর্তী কালে কলিনকোর্টের বর্ণনা থেকে, "নাকের নীচে, ঠোঁটের ওপর নিশ্বাস জমে বরফের আস্তরণ সৃষ্টি করেছিল। বরফ জমে ছিল চোখের পাতায় আর ভ্রূর ওপর। চারপাশ ও মাথার আচ্ছাদনী কঠিন সাদা বরফে ঢেকে গিয়েছিল···।"

ঐ যাত্রাপথে তীব্র শীতে জমাটবাঁধা শরীর-মন নিয়েও নেপোলিয়ন সারাক্ষণ শুধু তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যসূচী, পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছেন, ভেবেছেন। একটি কথা বার বার বলেন, "জানো, রাশিয়ার শহর গুলিতে বার বার আগুন ধরিয়ে আমাদের ভয় দেখাবার কিছুই ছিল না। ওদের শীতই যথেষ্ট। আমরা হেরেছি শীতের কাছে। আমাদের তাড়িয়েছে আবহাওয়া···।" মন্তব্য যথার্থ।

যেদিন নেপোলিয়ন ডাচি অব ওয়ারশতে পৌঁছলেন, সেদিনের সকালটা ছিল বড় সুন্দর, বড় ঝক্মকে। নেপোলিয়নের মন খুশিতে ভরে উঠল। কয়েকদিন স্লেজ গাড়িতে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবার পর এবার তিনি দু'পা টান টান করে হাঁটতে লাগলেন। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালেন। শহরবাসীরা লক্ষ্য করল না ফারের পাড় বসানো, সোনালী কাজ করা সবুজ ভেলভেটের আচ্ছাদনীতে নিজেকে প্রায় ঢেকে, ফারের টুপি মাথায় দিয়ে কোন্ লোকটি ঘুরে বেড়াচ্ছে···।

আসলে নেপোলিয়ন ওয়ারশতে নিজেকে লুকিয়েই রাখতে চেয়েছিলেন। রুশ অভিযানের খবর তো ভালো নয়। অতি সাধারণ হোটেলে নীচু ছাদের একটা ঠাণ্ডা কনকনে ঘরে নেপোলিয়ন আশ্রয় নিয়েছিলেন। নেপোলিয়নের আসবার খবর কেবল মাত্র ওয়ারশ-এর

ফরাসী রাজদূতকে জানানো হয়েছিল। পরে জানতে পেরেছিলেন তুজন পোলিশ মন্ত্রী। মন্ত্রী তুজন নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, "কত বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আপনি এসেছেন, আপনাকে দেখে আমরা আনন্দিত, আমরা খুশি।"

"বিপদ! বিপদ কোথায়!" নেপোলিয়ন লাফিয়ে উঠলেন, "আমি কোন বিপদকে বিপদ বলে মানি না। দেখছেন না আমি মোটা হয়ে গেছি ··! তবে ··" নেপোলিয়ন একটু মৃতু স্বরে বললেন, "উঁচু থেকে নীচে পড়ে যেতে একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট।"

নেপোলিয়ন নানা কথাবার্তা বললেন। বললেন, "হাজার দশেক পোলিশ অশ্বারোহী সৈন্য যোগাড় করা চাই। আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। আমিই সবাইকে রক্ষা করব···।" তবে নেপোলিয়ন আরও কয়েকবার নিজের মনে বললেন, "উঁচু থেকে নীচে পড়ে যেতে একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট···।"

সেদিনই রাত্রিবেলা নেপোলিয়ন ওয়ারশ ত্যাগ করলেন। ১১ই ডিসেম্বর পোজেন বলে একটা শহরে পৌছলেন। সেখান থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে যোগাযোগ হল। নেপোলিয়ন তুখানা চিঠি পেলেন। একখানা মারী লুইজার লেখা। আরেকখানা বাচ্চা নেপোলিয়ন সম্বন্ধে লেখা রিপোর্ট। কতদিন—কতদিন পরে স্ত্রীর চিঠি, আর ছেলের খবর পেলেন। ছেলের নাকি দাঁত উঠছে! নেপোলিয়নের মন নির্মল আনন্দে ভরে উঠল।

প্রাশিয়ায় পৌছে অবশ্য অন্য একটা কারণে নেপোলিয়নের মন খারাপ হয়ে গেল। রীতিমতো চিন্তায় পড়লেন। প্রাশিয়ায় ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের নামে রুশ অভিযানের ব্যর্থতা জড়িয়ে নানারকম রসালো খবর বেরুচ্ছে, কার্টুন আঁকা হচ্ছে। একটা কার্টুনে দেখা গেল বরফের পথ বেয়ে সারি দিয়ে ফরাসী সেনাবাহিনী ফিরে আসছে। তাদের চেহারা ভূতুড়ে, হাতে কোন অস্ত্র নেই, ক্লান্ত, শ্রান্ত। তাদের মাথার ওপর নেপোলিয়নের রাজকীয় প্রতীক তু পাশে পাখা মেলে আছে, ঈগল পাখী নয়—তার বদলে অশুভ-দর্শন শকুনি···।

শুধু কি ধারালো ছোরা দিয়েই একটা মানুষকে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটা যায়? নেপোলিয়নের বুক চিরে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের দিকে এগিয়ে চললেন। এগিয়ে চললেন শীতের বরফ ভেঙে গাড়ি পাল্‌টে পাল্‌টে। অবশেষে নৌকোতে করে রাইন নদী পার হয়ে নেপোলিয়ন ফরাসী দেশের মাটিতে পা রাখলেন। দেশের মাটির স্পর্শ পেয়ে নেপোলিরন আনন্দে ছেলে-মানুষের মতো চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কথায়, ব্যবহারে উচ্ছল হলেন। হাসিখুশি দিয়ে সঙ্গী-সাথীদের বিস্মিত করলেন।

নেপোলিয়ন রুশ-অভিযান সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে একটা বুলেটিন বার করলেন। বিবরণে অভিযানের ব্যর্থতা গোপন করলেন না, তবে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে রাশিয়ার শীতকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করলেন। এই ব্যর্থতার সংবাদে কিন্তু ফরাসীদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। নেপোলিয়নও তাহলে পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন! অর্থাৎ নেপোলিয়নের যুদ্ধ-নৈপুণ্যের ওপর সাধারণ লোকের এতদিনকার গভীর আস্থায় এবার একটা বিরাট চিড় খেয়ে গেল। অন্যতম ফরাসী নায়ক ট্যালিরাও মন্তব্য করলেন, "এই তাহলে শুরু—শেষ অধ্যায়ের শুরু···।" ঠিক এই সময় অন্যান্য রাজ্যে, ড্রইংরুমে, চার্চে পথে ঘাটে নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা রকম জল্পনা কল্পনা হচ্ছিল, তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুকের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল।

নেপোলিয়ন প্যারিসে যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন। প্রিয় পরিজনদের দেখবেন, ছেলেকে জড়িয়ে ধরবেন। সর্বোপরি দেশের শাসনদণ্ড হাতে তুলে নেবেন। নেপোলিয়ন মুহূর্ত গুণতে লাগলেন কবে প্যারিসে পা দেবেন।

পথের আরও কিছু ছোটখাটো বাধা কাটিয়ে অবশেষে নেপোলিয়ন কলিনকোর্টকে নিয়ে প্যারিসের বিজয় তোরণের কাছে এলেন, তারপর সোজা চলে গেলেন ট্যুইলারীর প্রাসাদে। প্রাসাদের সিংহ দরজাটি যখন স্পর্শ করলেন, তখনকার চেহারায় চিনে নেবার কিছু ছিল না। সুতরাং প্রহরীরা ওঁদের চিনতে পারলো না। ভাবলো এই দুজন সংবাদাদি

আদান-প্রদানকারী কর্মচারী, সুতরাং এদের ঢুকতে দিতে বাধা নেই। বিনা বাধায় নেপোলিয়ন ও কলিনকোর্ট গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকলেন। একতলায় রাণী মহলের দরজায় কলিনকোর্ট টুক্‌টুক্‌ করে আঘাত করলেন। এত রাতে খোদ রাণী মহলের দরজায় করাঘাত শুনে ভেতর-কার দ্বাররক্ষী প্রথমে জানলা দিয়ে উঁকি মারল। দেখল দুটি লোক। বিশ্রী সব লোমের পোসাক পরা, মাথায় লোমের টুপি। একজন দীর্ঘ, দোহারা, এক মুখ দাড়ি। অন্য জন মোটা, বেঁটে, ফোলা ফোলা চোখ, দেখে মনে হয় লোকটা গায়ে বেশ শক্তি ধরে।

দ্বাররক্ষীর ডাকে তার স্ত্রী একটা আলো জ্বালিয়ে এসে দাঁড়াল। আলো উঁচু করে কলিনকোর্টের মুখ দেখে তাঁকে চিনতে পারল। দুজনকে ভেতরে ঢুকতে দিল। নেপোলিয়ন প্রায় ছুটে গেলেন মারি লুইজার ঘরের দিকে। তাঁর ড্রইরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। মারি লুইজার সুবেশা, সুরূপা সহচরীরা হঠাৎ ওরকম দুজন অচেনা লোককে ভেতরে ঢুকতে দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। কয়েকজন কর্মচারী এসে ঐ দুজনকে ঘিরে দাঁড়াল। খর্বকায় লোকটির মুখের দিকে বারকতক তাকিয়েই একজন বলে উঠল, "সম্রাট নেপো-লিয়ন ফিরে এসেছেন..." মুহূর্তের মধ্যে আনন্দের উচ্ছ্বাসে রাণীমহল গমগমিয়ে উঠল।

কয়েকদিন পরে হরটেন্স নেপোলিয়নকে জিজ্ঞেস করল, "রুশ অভিযান থেকে ফিরে আসার পথে আপনাদের যে অবর্ণনীয় কষ্টের বর্ণনা সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল, সে কি সত্যি!"

"সত্যি বৈকি, সব সত্যি..." নেপোলিয়ন উত্তর দিলেন।

হরটেন্স একটু সময় চুপ করে থেকে আবার বলল, "কষ্টটা তো শুধু এক পক্ষেই হয়নি, ও পক্ষেও নিশ্চয়ই অনেক ক্ষতি হয়েছে!"

"ক্ষতি হয়েছে নিশ্চয়ই, তবে সেই কথা ভেবে কোন সান্ত্বনা পাচ্ছি না...।"

সান্ত্বনা না পেলেও নেপোলিয়ন কাজ করে চললেন অবিরত।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পনেরো ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম! কে বলবে লোকটি সবে দুর্জয় প্রকৃতির ঝাপ্টা খেতে খেতে বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এসেছে। কে বলবে দৈহিক স্থূলতা মানুষকে কর্ম বিমুখ করে দেয়! কোথায় ভেনিসে নৌবহর বাড়াতে হবে, কোথায় টাওয়ার তৈরী করে স্পেন-ফ্রান্সের সীমান্ত রক্ষার দিকে আরও নজর রাখতে হবে, কোথায় বিশ হাজার লোক পাঠাতে হবে, আর কোথায়ই-বা পামানোভাতে প্রচুর ময়দার রেশন দিতে হবে, সব···সবকিছুর দিকে নেপোলিয়ন যেন শত চক্ষু হয়ে নজর দিলেন। যে ফরাসীরা ব্যর্থ রুশ-অভিযানের সংবাদ পড়ে মুষড়ে পড়েছিল, সম্রাটের ওপর আস্থা হারাচ্ছিল, তারা নেপোলিয়নের এই কর্মতৎপরতায় নতুন জীবন পেল, শক্তি পেল।

নেপোলিয়ন আবার তৈরী হতে লাগলেন। নতুন করে এক লক্ষ সৈন্য যোগাড় করলেন। তাদের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো, তার সঙ্গে কামান, বন্দুক, গোলাগুলি সব আনালেন।

ওদিকে রাশিয়ায় তখন এক বিরাট নাটকের মহড়া চলছিল। রাশিয়ায় এসে নেপোলিয়ন বিধ্বস্ত হয়েছেন, ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন। অতএব জার আলেকজাণ্ডার ভেবেই নিলেন তিনিই ভগবানের আশীর্বাদ-পুষ্ট একমাত্র পুরুষ যিনি ইউরোপকে নেপোলিয়নীয় ত্রাস থেকে উদ্ধার করবেন। তিনিই হবেন ইউরোপের মুক্তিদাতা।

আলেকজাণ্ডার এই কথা সবিস্তারে চারদিকে প্রচার করলেন। তারপর নীমেন নদী পার হয়ে গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারশ-তে এলেন। প্রচারে অদ্ভুত কাজ হল। দেখা গেল নেপোলিয়নের অত সাধের গ্র্যাণ্ড আর্মির রুশীয় সেনাবাহিনীর বিরাট একটা দল বেরিয়ে এসে রাশিয়ার দলে যোগ দিয়েছে, ফরাসীদের সঙ্গে খিটিমিটি শুরু করেছে। সাংঘাতিক হল তারা যখন প্রাশিয়ার রাজা জারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। সেদিনের তারিখ ছিল সতেরোই মার্চ, ১৮১৩।

"যাক, শত্রুতা যত স্পষ্ট হয়, ততই ভালো" নেপোলিয়ন নিজের মনে মন্তব্য করলেন। নেপোলিয়ন মন্তব্যটা করেছিলেন খুব নির্ভয়ে।

কারণ ইতিমধ্যে তাঁর নতুন সৈন্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল হু'লক্ষ ছাব্বিশ হাজার। সব চাইতে বড়ো ভরসা, অস্ট্রিয়া তো সঙ্গে আছে! মারি লুইজাকে বিয়ে করবার পর থেকে তো ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মৈত্রীতে কোন কিছু সন্দেহ নেই···! বাইশ বছরের বউ সুন্দরী মারি লুইজার দিকে তাকিয়ে নেপোলিয়নের মন নিশ্চিন্ত হয়, নির্ভয় হয়। এই মেয়ের বাপ অস্ট্রিয়ার রাজা, তিনি কি কখনও জামাই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন, না কি আর কারও সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে চুক্তি করতে পারেন!

নেপোলিয়নের ছেলে এখন দেড় বছরের দামাল হয়ে উঠেছে। দেখায় যেন তিন-চার বছরের। নেপোলিয়ন ছেলেকে আদরে আদরে অস্থির করে তোলেন। ছেলে কোন কিছুতে ভয় পেলে বলেন, "ছিঃ, যে রাজা সে কি কখনও ভয় পায়···!" নেপোলিয়ন ছেলের ঘরের দেয়ালে রূপোর জলের কাজ করিয়ে ঝকঝকে করে দিলেন। ছেলে যখন হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে হাঁটতে শুরু করল, তখন নেপোলিয়ন ছেলের ঘর ক'খানার মেঝে পুরু গদি দিয়ে ঢেকে দিলেন—পাছে মেঝেয় পড়ে গিয়ে ছেলের মাথায় লাগে।

ছেলে বড় হয়ে পড়বে, দেশ বিদেশের ছবি দেখবে, কত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় শিখবে, ছেলে কত বড় বিদ্বান হবে, নেপোলিয়ন ছেলের সম্বন্ধে এত সব ভেবে চার হাজার বই-এর একটা লাইব্রেরী করে ফেললেন। এইবার স্থির করলেন একটা বাড়ি করতে হবে। ছেলের জন্য একটা প্রাসাদ-বাড়ি না করলে কি চলে, না মানায়!

দেড় বছরের জুনিয়ার নেপোলিয়ন তখন থপ্ থপ্ করে টলমল পা ফেলছে নরম মেঝের ওপর।

নেপোলিয়ন আরও কিছু করলেন। তিনি পোপ পায়াসের সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন, তিনি যেন অতি-অবশ্য জুনিয়র নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অধীশ্বর হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এ ছাড়া পোপের সঙ্গে একটা মৈত্রী চুক্তি করে অস্ট্রিয়ার রাজাকেও তা গ্রহণ করতে বললেন। তবে মাত্র হু'মাস পরেই পোপ এই চুক্তি বাতিল করে

দিলেন। নেপোলিয়ন এর পর মারি লুইজাকে ফ্রান্সে রাজপ্রতিনিধি বলে ঘোষণা করলেন। এই উপলক্ষে মারি লুইজা আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ গ্রহণ করলেন। স্টেট কাউন্সিল ও সেনেটে মারি লুইজা এবার থেকে সভানেত্রীর কাজ চালাবেন বলে স্থির হল।

অস্ট্রিয়া-অধিপতি ফ্রান্সিসের কাছে নেপোলিয়ন চিঠি লিখলেন, "আপনার মেয়ে, ফরাসী সম্রাজ্ঞী, এখন আমার প্রধান মন্ত্রী··· !"

ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন, "স্ত্রীর ওপর এই ধরনের আস্থা একেবারে নতুন জিনিস। এই মহত্ত্ব আমার জামাতার পক্ষেই সম্ভব···।"

মারি লুইজা বাবাকে চিঠি লিখলেন। একবার নয়, বার বার। ঘন ঘন। "বাবা তোমার নাতি হাঁটতে শিখেছে। একটু একটু চলছে। বড় দুষ্টু। বাবা, তুমি দেখলে কি খুশিই না হতে···।" আরও চিঠি গেল—"বাবা, তোমার ওপর ফরাসী সম্রাটের কী শ্রদ্ধা, কী ভালোবাসা! এমন একটা দিন যায় না যে দিন তিনি তোমাকে শ্রদ্ধা জানান না। বিশেষ করে সেই যে কিছুদিন আগে ড্রেসডেনে তোমার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল···তারপর থেকে উনি যেন তোমাকে আর ভুলতে পারছেন না···।"

নববর্ষে নেপোলিয়ন শ্বশুর মশাইকে দারুণ দামী এক ডিনার সেট পাঠালেন। মারি লুইজা তাঁর সৎ-মা অস্ট্রিয়ার রাণী মারিয়া লুডোভিকা অব মডেনা-কে প্রায়ই পাঠাতে লাগলেন আধুনিকতম ফ্যাসানের পোশাক। এমন সব দেওয়ার মাঝেই নেপোলিয়ন তাঁর খাজাঞ্চী-প্রধানকে বললেন, "অস্ট্রিয়ার দিক থেকে কোন ভয়ের কারণ নেই। অস্ট্রিয়ার আত্মীয়-মৈত্রীতে আমি নিশ্চিন্ত···।"

নেপোলিয়ন কিছুদিন আগে থেকেই তৈরী হচ্ছিলেন। এবার এগিয়ে গেলেন রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর দিকে। লুটজেন ও বাউটজেন, পর পর এই দুটো যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে হারিয়ে দিলেন। আবার চমকে উঠল গোটা ইউরোপ। ঘোড়ার পিঠে চড়ে, হাতে খোলা তরবারি নিয়ে নেপোলিয়ন নিজে প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুকারের সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করলেন। আর

কিছু অশ্বারোহী সৈন্য থাকলে নেপোলিয়ন সেদিন হেরে-যাওয়া, পিছু-হঠা শত্রুসৈন্যকে একেবারে খতম করে দিতে পারতেন।

এরই মধ্যে বড় দুঃখের সঙ্গে নেপোলিয়ন লক্ষ্য করলেন অস্ট্রিয়া তাঁকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে বা অন্য কোন দিক থেকে কিছুমাত্র সাহায্য করল না। কোন সাড়া শব্দ পর্যন্ত করল না। নেপোলিয়ন যখন শ্বশুরের এই ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলেন, শ্বশুর মশাই ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন, মস্কো থেকে ফিরে আসবার পথে তো অস্ট্রীয় সৈন্য সব ফৌত হয়ে গেছে। আবার নতুন করে সৈন্য যোগাড়ে তো ধৈর্য ধরতে হবে··· !

এ যেন কেমন কেমন কথা! নেপোলিয়নের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। এর পর তিনি জোর ধাক্কা খেলেন যখন ফ্রান্সিস জানালেন যে তিনি নেপোলিয়ন ও তাঁর শত্রুরাজ্যের মধ্যে একটা মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করছেন।

অর্থাৎ ফ্রান্সিসের হাবভাব মোটেই ভালো ঠেকল না। সব কিছু খোলামেলা ভাবে আলোচনা করবার জন্য নেপোলিয়ন ফ্রান্সিসের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা করতে চাইলেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের দিক থেকে এই ব্যাপারে ন্যূনতম আগ্রহও দেখা গেল না। কদিন পরে ফ্রান্সিস তাঁর বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী ব্যাভেরিয়ার রাজকুমার কাউণ্ট ক্লিমেন্স মেটারনিককে নেপোলিয়নের সঙ্গে কথাবার্তা চলাবার নির্দেশ দিলেন।

রাজকুমার টেমারনিক নেপোলিয়নের চাইতে বছর চারেকের ছোট ছিলেন। দৈর্ঘ্যে মাঝারি, সুন্দর কোঁকড়ানো চুল, তীক্ষ্ণ বাঁকানো নাক। গায়ের চামড়া অদ্ভুত চক্‌চকে এবং তেলা। লোকে বলত পোর্সিলেনের শরীর। মেয়েদের কাছে মেটারনিক ছিলেন নয়ন-ভুলানো মনোমোহন। একদা নেপোলিয়নের বোন ক্যারোলিনই তো মেটারনিকের প্রেমে গদ্‌গদ ছিল। মেটারনিকের সবচাইতে প্রিয় খেলা ছিল রাজনীতি। বেশ ঘোরালো, প্যাঁচালো রাজনীতি। মেটারনিকের এই খেলা ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চাতুর্যপূর্ণ। সুতরাং

ফ্রান্সিসের নির্দেশে মেটারনিক অত্যন্ত উল্লসিত হলেন। কারণ ছিল। মেটারনিক দাঁতে দাঁত ঘষে নিজের মনে বললেন, "এইবার নেপোলিয়ন, তোমাকে কব্জা করেছি। তুমিই না একদিন রাইন নদীর ধারে আমার অমন সুন্দর জমিদারিটি কেড়ে নিয়েছিল! আমার জোহান্স-বার্গের অমন টস্‌টসে আঙুর-ফলানো ক্ষেতটি নিজের হাতের মুঠোয় পুরে ছ' হাজার ক্ষেত-চাষীকে মুক্তি দিয়ে দারুণ মহত্ত্ব দেখিয়েছিলে! এবার পথে এসো, এবার আমার সুযোগ···।" মেটারনিক বাঁ হাতের তালুতে মুঠি পাকানো ডান হাত দিয়ে সজোরে ঘুষি মারলেন···।

নেপোলিয়ন খবর পেলেন, ফ্রান্সিস নেপোলিয়নের মুখোমুখি হবেন না। মেটারনিককে এগিয়ে দিয়ে তিনি নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইছেন। নেপোলিয়ন সব বুঝলেন মারি লুইজাকে দিয়ে ফ্রান্সিসকে ঘন ঘন চিঠি লেখানো, তাঁকে এত দামী দামী উপহার পাঠানো, তাঁর সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার, সব জলে গেছে। কূট রাজনীতিতে মৈত্রী, আত্মীয়তা, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি ভালো ভালো জিনিষের কোন স্থান নেই, কোন মূল্য নেই···।

যাই হোক, পরিস্থিতি অনুযায়ী চলা ভালো। মেটারনিক প্রস্তাব দিলেন, প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধি হোক। নেপোলিয়ন বললেন, 'তথাস্তু'। উপরন্তু নেপোলিয়ন নিজে উদ্যোগী হয়ে শুধু প্রাশিয়া নয়, রাশিয়ার সঙ্গেও শান্তি স্থাপনে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু ওদিকে আগে থাকতেই মেটারনিক দু রাজ্যের রাজাকে টিপে দিয়েছিলেন, নেপো-লিয়নকে যেন এই বিষয়ে একেবারে কথা বলতে না দেওয়া হয়। যা কিছু বলবার বা ব্যবস্থা করবার, সব হবে মেটারনিকের মারফত। মেটারনিক শান্তিরক্ষার ভাণ করছেন, ওদিকে দেখা গেল অস্ট্রিয়া দুলাখের মতো সৈন্য যোগাড় রাখছে। যে অস্ট্রিয়া কিনা এই সেদিনেও নেপোলিয়নের দরকারের সময় বলেছিল মস্কো থেকে ফিরে আসবার পথে সব সৈন্য ফৌত হয়ে গেছে। আবার নতুন করে সেনাবাহিনী গড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি! নেপোলিয়ন সবই বুঝতে পারলেন, তবু একবার চেষ্টা করলেন যাতে অস্ট্রিয়া অন্ততঃ

নিরপেক্ষ থাকে। মেটারনিকের কাছে নেপোলিয়ন প্রস্তাব রাখলেন যে ইলেরিয়া নামে জায়গাটা তিনি অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দিচ্ছেন, কিন্তু তার বদলে অস্ট্রিয়াকে কথা দিতে হবে যে সে কোন পক্ষে যাবে না।

মেটারনিকের কাছ থেকে এই বিষয়ে কোন উত্তর এলো না। এরপর নেপোলিয়ন মেটারনিকের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবার জন্য বারবার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু মেটারনিক ডেট আর দিতে পারলেন না, এমন নাকি ব্যস্ত তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত মেটারনিকের সময় হল। সুন্দর শহর ড্রেসডেন। সেখানে ২৬শে জুন নেপোলিয়ন-মেটারনিকের সাক্ষাৎ হল।

"এমনিতেই অনেকটা দেরী হয়ে গেছে, মেটারনিক। আর সময় নষ্ট না করে আমাদের মধ্যে এখনই শান্তি ও নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করা উচিত নয় কি?" নেপোলিয়ন অনেক আগ্রহ করে কথা কটা বললেন।

"সে তো বটেই, কিন্তু সকলের আগে ঠিক করতে হবে, শক্তির সমতা রক্ষা করা যাবে কি করে। শান্তির প্রস্তাব তো শুধু আমার আপনার মধ্যে নয়। আরও অনেক রাজ্যের রাজাদের কাছে ঐ প্রস্তাব রাখতে হবে আর তাতে মধ্যস্থতা করব আমি। আমি সেজন্যেই এসেছি···" কেমন যেন একটু থেমে, থেমে, বাঁকা বাঁকা ভাবে মেটারনিক কথাগুলি বলছেন···।

"আরেকটু পরিষ্কার করে, খোলা মনে বলুন আপনি সত্যিই কী চান···।" নেপোলিয়ন মেটারনিকের ভণ্ডামি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি আরও বললেন, "আমি মনে প্রাণে সৈনিক। আমি ভাঙবো কিন্তু মচ্‌কাবো না। আমি আবার সোজা ভাষায় বলছি, আমি ইলেরিয়ার বদলে আপনাদের নিরপেক্ষতা কামনা করছি। আপনি রাজী আছেন কিনা বলুন। নইলে আমার যা সেনাবাহিনী আছে, তা দিয়ে আমি রুশীয় ও প্রুশীয়দের মোকাবিলা করতে পারব। তবে আমার কাম্য যুদ্ধ নয়, শান্তি। আর আপনাদের নিরপেক্ষতা···।"

এইবার মেটারনিক ঝেড়ে কাশলেন অর্থাৎ সত্যিকারের মুখ খুললেন। তিনি একে একে দাবীর ঝুড়ি নামালেন। অস্ট্রিয়ার শুধু ইলোরিয়া নয়, উত্তর ইটালীও চাই। রাশিয়াকে দিতে হবে পোল্যাণ্ড আর প্রাশিয়ার দাবী এল্‌ব নদীর তীরবর্তী অঞ্চল আর রাইন অঞ্চল…।

"আর আমি বিনা বাক্যব্যয়ে ইউরোপ ছেড়ে চলে যাবো…তাই না?" রাগে দুঃখে নেপোলিয়ন অস্থির হয়ে উঠলেন। নেপোলিয়ন যেন জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছেন ··।

"এতদিন তা হলে যে শান্তির বাণী আওড়াচ্ছিলেন তা নেহাতই আপনার ভাণ…! আমার রাজ্য কেড়ে নিয়ে আপনি মধ্যস্থতা করতে এসেছেন! আর ভাবছেন কোন রা না কেড়ে আমি সব দাবী মেনে নেব…!" নেপোলিয়ন উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন "আমার শ্বশুর মশাই দারুণ ভুল করবেন যদি উনি ভেবে থাকেন যে তাঁর মেয়ে আর নাতি ফরাসী রাজ্যে একটা নড়বড়ে সিংহাসনের ভরসায় বসে আছে…।"

বোঝা গেল মেটারনিকের কূটনৈতিক চাল কত বড় অস্ত্র এবং সে অস্ত্রে কী নিদারুণ ভাবে আহত হলেন নেপোলিয়ন। মেটারনিক তো আসলে মধ্যস্থতা করতে আসেননি। তিনি এসেছিলেন নেপোলিয়নকে একবার বাজিয়ে দেখতে, আর তাকে এই কথাই জানাতে যে তিনি যে ভাগ-বাঁটোয়ারা দাবী করেছেন, তাতে যদি নেপোলিয়ন সায় না দেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়া নিশ্চয়ই হাত মেলাবে। অর্থাৎ তিনটি বৃহৎ শক্তি একসঙ্গে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। আসলে উপদ্বীপের সংগ্রামে নেপোলিয়নের পর পর পরাজয় শত্রুপক্ষকে অত সাহসী করে তুলেছিল। কারণ ঠিক এই সময়েই খবর এসেছিল উপদ্বীপ সমরের শেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ভিতোরিয়ায় ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলেসলীর হাতে ফরাসী সেনাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় হয়েছে।

নেপোলিয়ন এই সময় কায়মনোবাক্যে শান্তি কামনা করছিলেন, কিন্তু সেই শান্তি পেলেন না। ইউরোপের রাজনীতিবাজরা তখন রুশ-অভিযানে বিধ্বস্ত নেপোলিয়ন, উপদ্বীপের সংগ্রামে পরাজিত

নেপোলিয়ন, কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম প্রয়োগে ব্যর্থ নেপোলিয়নকে যে করেই হোক যুদ্ধে নামাতে চেয়েছিলেন, আর নেপোলিয়নও তাঁর নিজের সাম্রাজ্য ও সিংহাসনের মর্যাদার দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন। গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো নিয়তি যেন নেপোলিয়নকে টেনে নিয়ে গেল যুদ্ধ ক্ষেত্রে। এ যুদ্ধ নেপোলিয়নের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

১২ই অগাস্ট অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। করবেই তো। মেটারনিকের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নেপোলিয়নকে তখন ইউরোপের সর্বসাধারণ ও রাজা-রাজড়াদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে অতি উচ্চাকাজ্ক্ষীদানবরূপে। প্রচার করা হল—তাকে যদি ঐ মুহূর্তেই শেষ না করে দেওয়া যায়, তা হলে গোটা ইউরোপ নাকি নেপোলিয়নের নিষ্পেষণে শেষ হয়ে যাবে। রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইত্যাদি ইউরোপের রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে বুঝি মেটারনিকের চোখে ঘুম ছিল না। তাঁর তেলা, চকচকে চামড়ার নীচে তখন হিংস্র, জ্বলন্ত লাভা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল—নেপোলিয়ন নামক লোকটিকে শেষ করতেই হবে।

"আমাকে বলে কিনা উচ্চাকাজ্ক্ষী!" নেপোলিয়ন একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন? "আচ্ছা বলতো, উচ্চাকাজ্ক্ষী হলে কি এমন ভুঁড়ি হয়···!" নিজের সুপুষ্ট, নিটোল উদরপ্রদেশে মৃদু চাপড় মারতে মারতে নেপোলিয়ন রসিকতা করেছিলেন।

নেপোলিয়ন নিজের পৌরুষের জোরে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন। এবং উঠতে গিয়ে দেশের-দশের মঙ্গলও তো কম করেননি। তাঁর মনোবাসনা শুধু আগ্রাসীই ছিল না, তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন, স্থিতি চেয়েছেন, বার বার চেয়েছেন, তবু পরিস্থিতি তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। কারণ অসম্মান, অপমানের সঙ্গে তিনি কখনই আপোস করতে পারেননি, চাননি।

নেপোলিয়ন খবর পেলেন তাঁর বিরুদ্ধে শুধু অস্ট্রিয়া নয়, প্রাশিয়া, রাশিয়া, সুইডেনও সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে আর এই জোটের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ড তো থাকবেই। নেপোলিয়নের ওপর

এই দেশটির রাগই তো সবচাইতে বেশী। প্রথম থেকেই রাগ ছিল। তার ওপর কন্টিনেন্টাল সিস্টেম নেপোলিয়নের দিক থেকে যতই ব্যর্থ হোক, ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থে তো জোরেই আঘাত করেছিল!

আর রাশিয়া! সে তো এখন রাগে, প্রতিশোধ স্পৃহায় টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। নেপোলিয়নের রুশ অভিযান, মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তন ফরাসী শক্তিকে বিধ্বস্ত করেছিল ঠিক কথা, কিন্তু রাশিয়ার নিজের ক্ষতি কতটা! নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে, নিজের হাতে শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে সে নিজে কী কম বিধ্বস্ত! এর শোধ নিতে হবে না! অতএব সব সৈন্য এক সঙ্গে হও। শেষ করে দাও ফরাসী সিংহাসনে ঐ উড়ে-এসে জুড়ে-বসা নেপোলিয়ন নামে লোকটাকে।

যুদ্ধ শুরু হল। শত্রুপক্ষ চার লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বোহেমিয়া, সাইলেশিয়া এবং বার্লিন—এই তিন দিক থেকে এগিয়ে এল। নেপোলিয়নের হাতে তখন তিন লক্ষ সৈন্য। ১৫ই অগাস্ট নেপোলিয়ন ড্রেসডেন ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন। এই দিনটিতেই তিনি জন্মেছিলেন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অগাস্ট নেপোলিয়ন চুয়াল্লিশ বছরে পা দিলেন। শুভ জন্মদিনে শুভ কাজেই যাচ্ছেন বটে। নেপোলিয়ন নিজের মনে একটু হাসলেন।

প্রুশীয় সেনাপতি ব্লুকার বীরদর্পে এগিয়ে এলেন সাইলেশিয়ার দিক থেকে। নেপোলিয়ন নিজে যুদ্ধ করে ব্লুকারকে হটিয়ে দিলেন অনেকখানি পেছনে। এর পরেই নেপোলিয়ন চলে গেলেন ড্রেসডেনে। সেখানে আটকাতে হবে বোহেমিয়া থেকে যে বিরাট সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে তাকে। তৈরী হলেন বটে, তবে অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হল। এই বৃষ্টির মধ্যেই, ২৬শে ও ২৮শে অগাস্ট, নেপোলিয়ন যুদ্ধের অতুলনীয় খেল দেখিয়ে শত্রুসৈন্যকে ঘায়েল করলেন। ড্রেসডেনের যুদ্ধে নেপোলিয়ন এক লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্যের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ড্রেসডেনের যুদ্ধে জয়লাভ নেপোলিয়নের সামরিক খ্যাতির রেকর্ডে একটা বিরাট সংযোজন।

অত জলে ভিজে নেপোলিয়ন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু এক-দিনের বেশী বিশ্রাম পেলেন না। তবে কিছু সংবাদ পেলেন। চারদিক থেকে কেবল দুঃসংবাদ এল। তাঁর দলের কেবলই পরাজয় হচ্ছে, আর সাফল্য আসছে না। অথচ এর পরেই নেপোলিয়ন নিজে যখন সেনাবাহিনী নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেন, দেখলেন আঘাত পাবার জন্য কেউ নেই, শত্রুসৈন্য আগে-ভাগেই সে জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, পালিয়ে গেছে। বার বার একই ব্যাপার ঘটতে লাগল। বার বার নেপোলিয়নের উদ্যত, উত্তেজিত শক্তি আঘাত হানতে না পারার আঘাতে কুঁকড়ে গেল, মুষড়ে পড়ল। শত্রুপক্ষের এই নতুন কৌশলে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী ক্লান্ত হল, বিরক্ত হল।

এই অভাবনীয় বিপদে নেপোলিয়ন অস্থির হলেন। অস্থির হয়ে শুধু পরিকল্পনার পর পরিকল্পনার খসড়া করতে লাগলেন, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। অবশেষে নেপোলিয়ন একটা ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিতে চাইলেন। তিনি সেনাপতিদের ডেকে বললেন "আমরা আপাতত বার্লিন জয় করবো, তারপর সেখান থেকে পোল্যাণ্ডে গিয়ে রাশিয়াকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো···আপনারা রাজী···?"

নেপোলিয়ন ঔৎসুক্য-ভরা দৃষ্টি নিয়ে সেনাপতি নে, মুরাট, বার্থিয়ার এবং ম্যাকডোনাল্ডের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন সেই মুখগুলি পাথরের মতো শক্ত নিশ্চল, নির্বাক। না এই সর্বনাশা পরিকল্পনায় তাঁদের কারও সায় নেই। কারণ এই অভিযানে এতটুকু অসাফল্য ঘটলে, এবং তাই ঘটবার সম্ভাবনা বেশী, তাঁরা সদলবলে ধ্বংস হবেন!

নেপোলিয়ন নীচের ঠোঁটটি একবার কামড়ে ধরলেন। অস্থির হয়ে শুধু একবার চেয়ারে বসে কাগজের পর কাগজে হিজিবিজি লিখে দুটো দিন কাটালেন। তারপর ঘোষণা করলেন, "ঠিক আছে, আমরা বার্লিন যাবো না। আমরা ষাট মাইল পিছিয়ে লিপজিগে যাব। সেখান থেকে যুদ্ধ করব··· ।"

১৪ই অক্টোবর নেপোলিয়ন লিপজিগে এলেন। আবেগভরা কণ্ঠে নেপোলিয়ন সৈন্যদের সম্বোধন করে বললেন, "সামনে শত্রু। আমার বীর সৈনিক বন্ধুরা, বল, আমরা কী আমাদের স্বদেশভূমির অপমান সহ্য করব? পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুকেই কী আমরা শ্রেয় মনে করব না! বল, এই আদর্শে কী তোমরা শপথ নেবে না···!" সৈন্যদের সোল্লাস প্রতিশ্রুতি ভেসে এল···"আমরা শপথ নিচ্ছি, প্রাণ দিয়ে স্বদেশভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করব··· ।"

গ্যালোজ-হিল বলে একটা জায়গায় নেপোলিয়ন তাঁর প্রধান শিবির স্থাপন করলেন। নেপোলিয়নের নিজের শিবিরে ছিল বসবার জন্য একটা কাঠের চেয়ার, সামনে মাঝারী সাইজের একটা কাঠের টেবিল, তার ওপর বিছানো একটা ম্যাপ। তাতে।বভিন্ন রং-এর পিন আটকে বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান দেখানো··· ।

নেপোলিয়ন তাঁর সারা জীবনের সামরিক অভিযানে বার বার প্রকৃতির বাধা পেয়েছেন। এখানেও তাই হল। শান্ত হাওয়া হঠাৎ মাতাল হয়ে ঝোড়ো আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। নেপোলিয়নের হাতে তখন এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার সৈন্য। খবর পেয়েছেন শত্রুপক্ষের মৈত্রী-আবদ্ধ সৈন্যের সংখ্যা দু লক্ষ সাতান্ন হাজার।

১৬ অক্টোবর। সকাল থেকে দু পক্ষে কামান গর্জে উঠল। সমভূমির ওপর একেবারে মুখোমুখি যুদ্ধ। এইসব যুদ্ধে যে দলের সৈন্যসংখ্যা বেশী, সাধারণতঃ সেই দলেরই জয়, অন্য দলের পরাজয়। সৈন্য সংখ্যায় নেপোলিয়ন অনেক পিছিয়ে ছিলেন। উপরন্তু নেপোলিয়ন লক্ষ্য করলেন তাঁর নিজের সামরিক কায়দাতেই শত্রুপক্ষ সৈন্য সাজিয়েছে। অর্থাৎ স্বপক্ষের পদাতিক অশ্বারোহী সেনাবাহিনীকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবার জন্য শত্রুর নিকটতম আওতায় কামানের সারি সাজানো। নেপোলিয়ন দূরবীন দিয়ে একেবারে তাঁর নিজস্ব নীতিতে শত্রুপক্ষের এই সাজানো কৌশল দেখে মৃদু হেসে মন্তব্য করেছিলেন, "যাক, এতদিনে ওরা তা হলে কিছু শিখেছে···।"

অসম যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধে বীরত্ব ও কৌশলের জোর যতটুকু, তার চাইতে ও অনেক বেশী জোর সংখ্যার, সৈন্য সংখ্যার। সুতরাং নেপোলিয়ন পারলেন না, পারলেন না তাঁর প্রাণ দিয়ে লড়াই করা বিশ্বস্ত সেনাপতি-সৈনিকের দল। ১৭ই অক্টোবর বিকেলবেলা নেপোলিয়ন দূর দিগন্তে তাকিয়ে দেখলে ওপক্ষে পিঁপড়ের সারির মতো আরও, আরও সৈন্য আসছে। ওদের অতিরিক্ত সৈন্যসংখ্যা হল এক লক্ষ দশ হাজার।

১৮ই অক্টোবর নেপোলিয়ন আরও উত্তর দিকে সরে গেলেন। নিজের হাতে যুদ্ধ করলেন। পারলেন না। তাঁর সৈন্যরা বড় ক্লান্ত। আর ওপক্ষের সৈন্য তাজা উৎফুল্ল। নেপোলিয়ন এবার লিপজিগ থেকে চলে যাওয়াই সাব্যস্ত করলেন। এলস্টার নদী পার হতে হবে।

সমস্ত রাত ধরে ক্লান্ত, শ্রান্ত সৈন্যরা ব্রীজের ওপর দিয়ে নদী পার হতে লাগল। নেপোলিয়ন একজন সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন শত্রুসৈন্য যদি পিছু ধাওয়া করে এদিকে আসে তাহলে যেন বারুদ জ্বেলে ব্রীজটাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। নেপোলিয়নের এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল হল। নিজেদের দলের সৈন্যদের শত্রুসৈন্য ভেবে কোন চিন্তা না করেই বারুদে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। ব্রীজ উড়ে গেল। তখনও নদী পার হতে বাকী ছিল বিশ হাজার ফরাসী সৈন্যের। কিছু সাঁতারে পার হতে গিয়ে ডুবে গেল। হাজার কয়েকের মতো শত্রুর হাতে বন্দী হল। লিপ্‌জিগে চারদিনের যুদ্ধে নেপোলিয়নের সৈন্য ক্ষতি হল তিয়াত্তর হাজার।

এরপর নেপোলিয়ন পিছোতে লাগলেন। সমানে পিছোতে লাগলেন। উপায় নেই। একটা নদী পার হয়েছেন। এবার পার হতে হবে আরেকটা নদী, রাইন নদী। নেপোলিয়ন খুব ভালো করেই বুঝতে পারলেন তিনি এবার ঢালু জমিতে পা দিয়েছেন। আর ওঠা নয়। এবার শুধু গড়িয়ে নেমে যাবার পালা…।

লিপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় শুধু যুদ্ধে পরাজয় নয়। তাঁর পৌরুষের পরাজয়। তাঁর ভাগ্যেরও পরাজয়। যে দেশগুলি

এতদিন নেপোলিয়নের একান্ত অনুগত ছিল, তারা একে একে নেপোলিয়নকে ছেড়ে যেতে লাগল। কেন? কারণ তাদের মধ্যে নাকি এবার, এতদিনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, জাতীয় ভাবে এখন তারা অনুপ্রাণিত। হবেই তো। ফরাসী বিপ্লবের বরপুত্র নেপোলিয়ন তাঁর নতুন গণতান্ত্রিক শাসনবিধির মাধ্যমে যে শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিলেন মানুষের মনে, তাদের চোখের সামনে যে মানবতাবোধ ও স্বাধীন সত্তার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা অনুশীলন করে সবাইকে জ্ঞানবৃক্ষের যে ফল খাইয়েছিলেন, তার ফল তো নেপোলিয়নকে পেতেই হবে। এবার নাকি সারা ইউরোপ জেগে উঠেছে। সুতরাং নেপোলিয়নের এবার বিদায়। ইউরোপে রাজ্যগুলি এখন যে যার ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকবে। নেপোলিয়নকে এবার যেতে হবে। লিপজিগের যুদ্ধে তাই নেপোলিয়ন "ব্যাট্‌ল্ অব নেশন্‌স্" বা "সমগ্র জাতির যুদ্ধ" প্রত্যক্ষ করলেন। এই যুদ্ধ নেপোলিয়নের থাবা থেকে মুক্ত হবার যুদ্ধ, এই যুদ্ধ "ওয়ার অব লিবারেশন"। এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন আর পারলেন না।

রাইন নদী পার হয়ে নেপোলিয়ন যখন প্যারিসে এলেন তখনই উপলব্ধি করলেন ফরাসী দেশটুকুই শুধু নিজের বলতে আছে, আর সব কিছু "আমার দেশ" বলে তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁর রাজ্যমালা থেকে একে একে সব রাজ্য খসে গিয়েছে···।

"তা হলে স্বীকার করছ, আমিই ইউরোপের মুক্তিদাতা, মেসায়া···!" মেটারনিক বুক ফুলিয়ে বাঁকানো নাকের তলায় বাঁকা হাসি হেসে সকলের সামনে বললেন, "আমিই তাহলে পাপীর নিধন করে ইউরোপকে উদ্ধার করলাম···।" আত্মগর্বে স্ফীত মেটারনিকের একবারও মনে পড়লো না ঐ "পাপী" নেপোলিয়ন সাক্ষাৎকালে কতবার তাঁকে আন্তরিক অনুরোধ করেছিলেন এবার শান্তি হোক, পরস্পর সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হোক। এখন আর যুদ্ধ নয়, আর অশান্তি নয় ··। সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে বধ করার মধ্যে অভিসন্ধির

সার্থক তৎপরতা আছে ঠিকই, কিন্তু তাতে বড়ো গলা করে মহত্ত্ব জাহির করবার কিছু নেই।

নেপোলিয়নের এককালীন মন্ত্রী ট্যালিরাাঁ বরাবরই ছিলেন মানুষের চামড়ার নীচে মনুষ্যেতর প্রাণী। নেপোলিয়নের নিদারুণ পরাজয়ে ট্যালিরাাঁ উল্লসিত হলেন। একজন মহিলার কাছে মন্তব্য করলেন, "দেখে এসো, নেপোলিয়ন এখন কেমন কুঁকড়ে মুকড়ে বিছানায় লুকিয়ে আছে···।"

না, নেপোলিয়ন মোটেই বিছানায় কুঁকড়ে মুকড়ে লুকিয়ে ছিলেন না। লিপজিগের দুর্ঘটনার পর নতুন করে উদ্যম নিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই প্যারিসে কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তিন লক্ষ সৈন্যের জন্য। লিপজিগের পর শত্রুসৈন্য এবার ধেয়ে আসছে প্যারিসের দিকে। শুধু কি শত্রু পক্ষই নেপোলিয়নের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে! প্রাণের ভাইরা, যাঁদের তিনি রাজা বানিয়েছিলেন, সেই জোসেফ, লুই, জেরোম, তাঁদের হাবভাবই কি ভ্রাতৃসুলভ ছিল? নেপোলিয়নের অশান্তি কি তাঁরাই কম বাড়িয়েছিলেন! যে ভাইদের জন্য নেপোলিয়ন নিজের নাম খারাপ করে, ন্যায় নীতির দিকে না তাকিয়ে, তাঁদের শুধু শুধু ভালোবেসে, তাঁদের কত-কত উঁচু আসনে বসিয়েছিলেন, সেই ভাইরা কিনা এখন নেপোলিয়নের দুর্দিনে তাঁর দিকে না তাকিয়ে যে যাঁর ঘর সামলাচ্ছেন, যে যাঁর পকেট গুছিয়ে নিচ্ছেন! জোর করে, ধমক দিয়ে ভাইদের কাছ থেকে আর কতখানি আনুগত্য আশা করা যায়।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, শুভ নববর্ষে নেপোলিয়নের কাছে দুঃসংবাদ এল সেনাপতি ব্লুকার রাইন নদী পার হয়েছেন। অর্থাৎ প্যারিসের পতন আসন্ন। নেপোলিয়ন অস্থির হয়ে উঠলেন সেনাবাহিনীর জন্য। সৈন্য চাই। আসন্ন লড়াইয়ের প্রস্তুতি চাই। নেপোলিয়ন দেশের তরুণদের আহ্বান জানালেন। আর সত্যি কচি তরুণরাই এলো বটে। গালের রং তখনও আপেল রাঙা, মুখে দুধের

গন্ধ, রোগাটে কিশোর সুলভ চেহারা। যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা, যুদ্ধ কতখানি বিভীষিকা তাই ওরা জানে না। নেপোলিয়ন একদিকে যত সোনা ছিল, সব গলাতে লাগলেন। কারণ তার বদলে কামান চাই, বন্দুক চাই, গোলাগুলি চাই। অন্য দিকে ঐ কিশোর রংরুটদের শেখাতে লাগলেন, "এই দেখ, এমনি করে বারুদ পুরে দিয়ে, এমনি ভাবে কামান ফাটাতে হয়। দেখে শেখো, এমনি করে শত্রুদের চার্জ করতে হয়, এই ভাবে ঘোড়ার পিঠে চেপে যুদ্ধ করতে হয়...।" হায়রে, নেপোলিয়ন কাদের নিয়ে ইউরোপের মুক্তিদাতা সেনাপতিদের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন...!

২৩শে জানুয়ারী নেপোলিয়ন ন্যাশনাল গার্ড অফিসারদের প্যারেড দেখলেন। সঙ্গে ছিলেন মারি লুইজা আর 'রোমের রাজা' বাচ্চা নেপোলিয়ন! নেপোলিয়ন ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গোলাপি গালে আদরের স্পর্শ দিয়ে বললেন, "রোমের রাজাকে দেখে নিশ্চয়ই আমরা নতুন করে শক্তি পাবো, উৎসাহ পাবো...।"

সেদিন সন্ধ্যের সময় মারি লুইজার সঙ্গে নেপোলিয়ন অনেকক্ষণ গল্প করলেন, অনেকটা সময় কাটালেন। আর মাত্র দুদিনের মধ্যে চলে যাবেন আবার সেই যুদ্ধক্ষেত্রে। মারি লুইজা অসুস্থ। দুর্দান্ত কাশি। কাশির সঙ্গে রক্ত। স্ত্রীর চোখে জল দেখে নেপোলিয়ন বললেন, "কেঁদো না, দেখবে আমি কত তাড়াতাড়ি ফিরে আসি।" স্ত্রীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, "দেখো না এবার তোমার বাবাকে কেমন হারিয়ে দিই...।"

নেপোলিয়ন স্যালোন্স বলে একটা জায়গায় শিবির স্থাপন করলেন। নেপোলিয়নের দলে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। বিরোধী দলের সৈন্য সংখ্যা দু লক্ষ বিশ হাজার। অর্থাৎ চারগুণ বেশী। এদিককার একজন সৈনিকের বিরুদ্ধে ওদিকের চারজন!

সেনাবাহিনীর এই অবস্থা আর ওদিকে ফরাসী প্রজাদের মনোভাব কী! যতদিন নেপোলিয়ন যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়লাভ করে যাচ্ছিলেন,

ততদিন তারা ঠিক ছিল, কিন্তু যেই নেপোলিয়ন পরাজিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রজারা তাঁর সম্বন্ধে সকল আস্থা তো হারালোই, উপরন্তু তারা নেপোলিয়ন-বিরোধী হয়ে উঠল। অবশ্য এই বিরোধিতার পেছনে কারণও ছিল। লিপজিগের যুদ্ধে, তার আগে রুশ অভিযানে বিধ্বস্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল ফরাসী রাজ্যের প্রায় সবকটি পরিবারের ছেলে, ভাই, বাবা, নিকট পরিজন। ঘরের ছেলে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে, তুষার চাপা পড়েছে, জলে ডুবে গেছে কিংবা গোলার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সুতরাং যাদের হারিয়েছে, তাদের তো ধৈর্য আর থাকবেই না, তারা তো নেপোলিয়ন-বিরোধী হবেই। তখন তাদের কে বোঝাবে যে নেপোলিয়নও এমন যুদ্ধ চাননি। নেপোলিয়ন-বিরোধী পক্ষের নায়কদের জনে জনে সবার কাছে বার বার আবেদন জানিয়েছেন "আর যুদ্ধ নয়। শান্তি, আমি শান্তি চাই, তোমাদের প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্ব চাই!"

এইবারকার প্রথম যুদ্ধ হল ব্রিয়েনে। ব্লুকার-পরিচালিত বড় ভয়াবহ যুদ্ধ। তবে সেনাপতি নেপোলিয়নের মুখ রক্ষা করলেন। প্রধানতঃ তাঁরই জন্য ব্লুকার পিছু হঠতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তাতে ফরাসী পক্ষের কোনই লাভ হল না। কারণ ইতিমধ্যে পিছিয়ে যাওয়া ব্লুকারের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী যোগ দিয়ে তাঁকে আবার এগিয়ে নিয়ে এল। ১লা ফেব্রুয়ারী দারুণ তুষার ঝড়ের মধ্যে আট ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ হল। নেপোলিয়নের ওপর প্রকৃতির কোপ তো চিরকালই আছে। তবু তিনি যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধ করলেন সব রকম কৌশল, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু এ যুদ্ধ কতক্ষণ চলে। একজন চারজনের বিরুদ্ধে কতটা লড়াই করতে পারে। নেপোলিয়ন যতই ওপক্ষের সৈন্য নিধন করুন না কেন, সংখ্যাধিক্যের জন্য তাদের সে ক্ষতি পূরণ হয়ে যাচ্ছে! অথচ এপক্ষে নেপোলিয়নের সৈন্য-ক্ষয় ক্ষতিই, নিদারুণ ক্ষতি। সংখ্যাল্পতার জন্য সে ক্ষতি পূরণ হবার কোন সুযোগই ছিল না। সুতরাং ইতিহাস যেদিকে যাবার সেদিকেই

গড়াতে লাগল। সে রাতেই নেপোলিয়ন পিছু হঠলেন। প্রথমে ট্রয়েজ, তারপর নোজেণ্ট—সবশুদ্ধ ষাট মাইল পথ পিছু হঠতে হঠতে ক্লান্ত, শ্রান্ত, সৈনিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, "কখন আমরা থামব···!"

নেপোলিয়নের চোখের সামনে আশার আলো দূরে থাক, একটা কালো পর্দা নেমে এল। কারণ ইতিমধ্যে সৈন্যদের খাবারে টান পড়েছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে যার মতো সর্বনাশা ইঙ্গিত আর নেই। আর এরই মধ্যে আরেকটি সর্বনাশ হল যখন খবর এল, সেনাপতি মুরাট, যিনি নেপোলিয়নের সামরিক জীবনে বিশ বছরের বিশ্বস্ত ও দক্ষ সঙ্গী, অনেক যুদ্ধের নায়ক, যাঁকে নেপল্‌সের সিংহাসনে বসানো হয়েছিল, সেই সেনাপতি মুরাট নাকি নেপোলিয়নকে ত্যাগ করে চলে গেছেন শত্রুপক্ষে!

নেপোলিয়ন রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে বলেছিলেন, "এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ, আমি, আমার ফ্রান্স নেবেই···।" রাগ দেখানো ছাড়া নেপোলিয়নের তখন আর কী-ই-বা করবার ছিল! মীরজাফর সব দেশেই আছে।

শত্রুপক্ষ যত এগিয়ে আসতে লাগল, ততই প্যারিসে নানারকম গুজব আর তার সঙ্গে আতঙ্ক, ছড়াতে লাগল—ঐ আসছে কোজাক সৈন্যরা, দুর্দান্ত দানবিক কোজাক। ওরা নাকি মেয়ে দেখলেই পাশবিক অত্যাচার চালায়, সব লুটপাট করে। ওরা এলে কাউকে আর প্রাণে বেঁচে থাকতে হবে না। অতএব পালাও, শিগ্‌গীর পালাও! ভয়ে বিভীষিকায় সমস্ত প্যারিস কাঁপতে লাগল। বড়োলোকের বৌ-ঝি-রা যে যার গয়না কাপড়ে বেঁধে, কোঁচড়ের মধ্যে লুকিয়ে, এমন কি অন্তর্বাসের মধ্যে লুকিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে লাগল। এই সময় প্যারিসের টাকার মানমূল্যও অত্যন্ত নীচে নেমে গিয়েছিল।

নেপোলিয়ন এই কটা দিন যেন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জীবনে যা কিছু প্রত্যাশা, যা কিছু আকাঙ্ক্ষা এবার সব কিছুর অবসান। জোসেফকে ডেকে বললেন, "মারি লুইজা ক্ষয়রোগে মারা

যাচ্ছে। তবু তাকে বোলো, সে যেন ভেঙে না পড়ে। সে যেন আমার ছেলেকে নিয়ে অতি অবশ্য প্যারিস ত্যাগ করে চলে যায়। আমি চাই না আমার ছেলে অস্ট্রীয়দের হাতে বন্দী হয়…।”

নেপোলিয়ন ঠিক করলেন আর যুদ্ধ নয় এবার শান্তি। যুদ্ধ আর চলবে না, যুদ্ধে আর পারবেন না। নেপোলিয়ন শান্তির প্রস্তাব দিয়ে একটা খসড়া করে ফেললেন। খসড়াটির মধ্যে একটি ইচ্ছা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল, সেটি হল, ও পক্ষ তাঁকে যেন সম্মানজনক সর্ত দেয়, শান্তি ও সন্ধির নামে যেন তাঁকে অপমান, অসম্মান না করা হয়, এটি তাঁর আন্তরিক অনুরোধ।

এদিনের রাতটা নেপোলিয়নের বড় যন্ত্রণায় কেটেছিল। বড় নৈরাশ্যের রাত, বড় অন্ধকার রাত। একান্ত ভৃত্যকে বার বার ডেকেছিলেন। একবার বললেন আলো জ্বালিয়ে দিতে। তারপরেই বললেন আলো নেভাতে। নেপোলিয়নের মনোরাজ্যেও তখন আলো নিভছে আর জ্বলছে। যতক্ষণ পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা, ততক্ষণই তো আশা! আর আশাই তো বড় দুঃখে একটু আলো! নেপোলিয়ন যে বড় গর্ব করে বলতেন “অসম্ভব” কথাটা কাপুরুষের জন্য, আমার জন্য নয়। কাজেই আলো একেবারে নিভিয়ে রাখতে তিনি রাজী নন।

পরদিন ভোরবলা খবর এল ব্লুকার ও সারজেদবার্গ প্রায় বিনা বাধায় প্যারিসের কাছে এসে যাচ্ছেন। তাঁরা দুভাগে এগোচ্ছেন। নেপোলিয়ন আবার লাফিয়ে উঠলেন—শান্তি নয়, আমি যুদ্ধ করব, আমার রাজ্যে শত্রু প্রবেশ করবে বিনা বাধায় তা আমি ঘটতে দেব না, আমার ম্যাপ কোথায়? ম্যাপখানা আমার সামনে বিছিয়ে দাও…।

নেপোলিয়ন আবার পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। ব্লুকারকে আঘাত হানলেন। বড় মারাত্মক আঘাত। বারোটি রুশ রেজিমেণ্ট বিধ্বস্ত করে দিলেন। ন’ দিনে ছ’টি যুদ্ধ করলেন, চারটিতে জিতলেন। শোনা গেল এবার নাকি ও পক্ষ থেকেই সন্ধির প্রস্তাব আসছে। সন্ধির প্রস্তাব সত্যিই এল। নেপোলিয়ন শ্বশুর-মশাইকে বলে পাঠালেন সন্ধি হতে পারে একটি সর্তে, সেটি হল ফ্রান্সের সঙ্গে আল্‌স্‌

অঞ্চল, ইরান অঞ্চল ও বেলজিয়ম যুক্ত হবে, নইলে নয়। শ্বশুরমশাই কিন্তু ইংল্যাণ্ডের প্ররোচনায় বেলজিয়ম দিতে রাজী হলেন না। সন্ধি হবে, কিন্তু বেলজিয়ামের আশা ছাড়তে হবে। নেপোলিয়ন রাজী হলেন না, সম্মান হারানোর ভয়ে রাজী হলেন না। কিন্তু মারাত্মক ভুল করলেন। যেখানে নিজের একটি সৈন্যের বিরুদ্ধে ও পক্ষের চারটে সৈন্য, যেখানে একা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ও পক্ষের জোটবদ্ধ শক্তি, সেখানে নেপোলিয়ন হঠাৎ কেন ঐ সিদ্ধান্ত নিলেন কে জানে। একেই বোধহয় বলে ভাগ্য, আর এই হয় তো নেপোলিয়নের অতিরিক্ত আশাবাদী চরিত্রের ত্রুটি।

নেপোলিয়নে ভাবগতিক দেখে শত্রুপক্ষে আবার তোড়জোড় চলল। তাদের সৈন্য এগিয়ে এল। আবার সংঘর্ষ হল। যুদ্ধের মাঝখানে শত্রুপক্ষের গুলি এসে আঘাত করল নেপোলিয়নের ঘোড়াকে। ঘোড়া পড়ে গেল। নেপোলিয়ন ছিট্‌কে পড়লেন মাটিতে। ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে জায়গাটা ঢেকে গেল। সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, নেপোলিয়ন নিশ্চয়ই আহত, কিংবা হয়তো···আরেকটু বেশী কিছু···! ধোঁয়া কেটে গেল। নেপোলিয়ন সব ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়ালেন। লাফিয়ে আরেকটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন। মুখে মৃদু হাসি। নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন তাঁকে মারবার মতো গুলি এখনও তৈরী হয়নি। এই উক্তি সত্যি প্রমাণিত হল যখন দেখা গেল তাঁর ইউনিফর্ম গুলিতে ফুটো ফুটো হয়ে গেছে বটে কিন্তু শরীরের কোথাও এতটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।

প্যারিসে এদিকে নেপোলিয়নকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ঢল নেমেছে। বিদ্রূপকারীদের অধিকাংশই হল সেই সব প্রাগ্‌বিপ্লব যুগের ধনী অভিজাতরা, যারা বিপ্লবের সময় দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, ক্ষমতা হাতে পেয়ে নেপোলিয়ন যাদের আদর করে দেশে ফিরিয়ে এনে সসম্মানে পুনর্বহাল করেছিলেন।

তলায় তলায় আবার আরেকটি মীরজাফর ট্যালিরাণ্ড অনেক কিছু করে যাচ্ছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় অন্ধকারে ট্যালিরাণ্ড ট্যুইলারীর

প্রাসাদে এসে মারি লুইজার কাছ থেকে নানান কথার ফাঁকে নেপোলিয়ন সম্বন্ধে খবর জানবার চেষ্টা করতেন আর তেমন তেমন কিছু জানতে পারলেই গোপনে পাচার করে দিতেন শত্রুপক্ষের শিবিরে।

জোসেফ বলে পাঠালেন, যা পরিস্থিতি নেপোলিয়ন যেন অতি অবশ্য যে-কোন সর্তে সন্ধি করতে রাজী হয়, নেপোলিয়ন অবাক হলেন। সকলেই কেমন তাঁর মনের বিরূপতা করে যাচ্ছে!

২৮শে মার্চ। রাজপ্রতিনিধি মারি লুইজা কাউন্সিল অব স্টেটের একটা জরুরী মিটিং ডাকলেন। শত্রুপক্ষ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। প্যারিস রক্ষা করবার জন্য চল্লিশ হাজার সৈন্য আর জাতীয় বাহিনী আছে। সুতরাং এই অবস্থায় মারি লুইজাকে অতি অবশ্যই ছেলেকে নিয়ে প্যারিস ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে হবে। কাউন্সিলের সকল সদস্য এই মতে মত দিলেন।

মায়ের সঙ্গে গাড়িতে ওঠার সময় "রোমের রাজা" নাকি পর্দা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুতেই সে যাবে না, "বাবা আমাকে এখানে থাকতে বলেছে, আমি যাব না।" গাড়িতে টেনে হিঁচড়ে ছেলেকে তুলতে হয়েছিল, "আমি এখনেই থাকব, আমি যাবো না"··· সেদিন নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

প্যারিসের পতন আসন্ন হল। প্যারিসের অধিবাসীরা মনোবল একেবারে হারিয়ে ফেলল। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন তিনি প্রজাদের আস্থা হারিয়েছেন। তিনি তখন প্যারিস থেকে একশ ত্রিশ মাইল দূরে, শত্রুবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য তাদের যোগাযোগের পথগুলি আটকাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই নীতি সফল হলে নেপোলিয়নের খুবই ভালো হত, কিন্তু তিনি একা আর কতটুকু করবেন!

৩০শে মার্চ। নেপোলিয়ন প্যারিস থেকে চোদ্দ মাইল দূরে একটা জায়গায় এগিয়ে এলেন। সেখানে তাঁর দলের একজন সেনাপতি ও একদল অশ্বারোহীর সঙ্গে দেখা হল। তাদের কাছ থেকে নেপোলিয়ন এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পেলেন। শুনলেন যথেষ্ট বীরত্ব দেখানো

সত্ত্বেও শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্যের জন্য ফরাসী সৈন্যরা আর পেরে উঠছে না। উপরন্তু যুদ্ধের উপকরণেও টান পড়ে যাওয়ায় তারা একেবারেই আশা ছেড়ে দিয়েছে। সেদিনই বিকেল চারটের সময় জোসেফের নির্দেশে জার আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সেনাপতি মারমাউন্টের কথাবার্তা হয়ে সন্ধির প্রস্তাব হয়েছে। ফরাসী সৈন্যরা শত্রুর হাতে বন্দী হবার শাস্তি এড়ানোর জন্য প্যারিস ত্যাগ করে চলে যেতে শুরু করেছে।

জোসেফ এ কী করলেন! সন্ধির প্রস্তাবকে এমনভাবে মেনে নিলেন। নেপোলিয়নের এত উদ্যম, এত আশার ওপর এমন ভাবে ধস্ নেমে এল! নেপোলিয়ন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তাঁর এত সাধের, অমনভাবে গড়ে-তোলা প্যারিস আর তাঁর নিজের প্যারিস নয়! ব্যাপারটা আরেকবার যাচাই করবার জন্য নেপোলিয়ন কলিনকোর্টকে পাঠালেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, যে খবর পাওয়া গেছে, তা সম্পূর্ণ ঠিক খবর, প্যারিসের চাবি এখন জার আলেক-জাণ্ডারের হাতে। প্যারিস শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

একটা ভারি নিশ্বাস নেপোলিয়নের বুক চেপে ধরল। সাম্রাজ্য গেছে, এখন রাজধানীও গেল। নেপোলিয়ন নীরবে ফাউন্টেন ব্লোর দিকে এগিয়ে গেলেন। পরদিন ভোর ছটার সময় নেপোলিয়ন নিজের প্রাসাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের প্রাসাদ! নেপোলিয়নের মুখে বড় দুঃখের হাসি ফুটে উঠল। নেপোলিয়ন দোতলায় তাঁর অতি প্রিয় পড়বার ঘরটিতে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরের সমস্ত দেয়াল সবুজ সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢাকা। মেহগনি কাঠের সারি সারি বুককেসে থরে থরে বই সাজানো। তাঁর কতদিনের সঙ্গী এই ঘর। এই ঘরের প্রতি বইখানাতে কত মনের খোরাক, কত শান্তি। সেই ঘরে নেপোলিয়ন আজ শূন্য চোখে তাকিয়ে আছেন।

পরদিন বিকেলবেলা। জার আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে শত্রুপক্ষের নেতৃস্থানীয় লোকেরা প্যারিসে ঢুকলেন। নেপোলিয়নের সামনে তাঁরা যে ক'টি প্রস্তাব রাখলেন, তার মধ্যে নেপোলিয়নের রাজকীয়

অস্তিত্ব রক্ষা সম্বন্ধে একটা কথাও ছিল না। বরঞ্চ ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ বংশকে পুনঃস্থাপিত করা সম্পর্কেই বেশী জোরালো প্রস্তাব ছিল। আর, নেপোলিয়ন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, এই ব্যাপারে সবচাইতে সোচ্চার ট্যালিরাণ্ড! তিনি কিনা উচ্চকণ্ঠে দাবী জানালেন ফরাসী দেশের প্রকৃত রাজা অষ্টাদশ লুই এবং এখন তাঁরই সিংহাসনে বসা উচিত। এই ব্যাপারে নেপোলিয়ন বা তাঁর পরিবারের কোন লোকের কথা উঠতেই পারে না। তাদের সঙ্গে একটা কথাও নয়।

ট্যালিরাণ্ড আগের থেকে তৈরী করা একটা খসড়া জার আলেকজাণ্ডারের হাতে দিলেন। খসড়াটি পড়ে আলেকজাণ্ডার তার নীচে সই করে দিলেন। অর্থাৎ ট্যালিরাণ্ড যা বলেছেন তাই হোক, নেপোলিয়নের সঙ্গে আর একটাও কথা নয়। এই সময় ট্যালিরাণ্ডের কর্মতৎপরতা সত্যিই লক্ষণীয়, কতদিনের নীরব সাধনায় আজ তিনি সিদ্ধিলাভ করতে যাচ্ছেন, অতএব আর মুখোস রাখবার দরকার নেই, দরকার নেই চোখে-মুখে চামড়ার।

জার আলেকজাণ্ডারের সই করা খসড়াটি নিয়ে ১লা এপ্রিল ট্যালিরাণ্ড সেনেটের সভা ডাকলেন। একশ চল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে চৌষট্টি জন সদস্য উপস্থিত ছিল, তাদের দিয়ে সেনেটে ট্যালিরাণ্ডের বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্রস্তাবটি পাস হল···নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সিংহাসনচ্যুত এবং লুই স্ট্যানিসলাস জেভিয়ার দ্য বুরবোঁ সিংহাসনে বসবার জন্য আমন্ত্রিত।

অবিচলিত মুখে, স্থির চিত্তে নেপোলিয়ন সেনেটের এই নির্দেশের খবর শুনলেন। মুখে একটি রেখাও ফুটে উঠল না। কপালে একটি রেখাও দাগ টেনে দিল না। নেপোলিয়ন শুধু বললেন, "আমি সৈনিক, রাজার জীবন ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন গ্রহণে আমার কোন দুঃখ নেই। তবে ফ্রান্সের বড় দুর্দিন। আমি ফ্রান্সের শুভ চাই, ফ্রান্সের মঙ্গল চাই···।"

এরপরেই নেপোলিয়ন একবার উত্তেজিত হয়ে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, চল, প্যারিস চল, আমরা প্যারিস জয় করব।

তবে এই ব্যাপারে সেনাপতিরা পুরোপুরি আপত্তি জানালেন। বিশেষ করে সেনাপতি নে।

নেপোলিয়ন সেনাপতিদের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার সম্পর্কে আপনারা কি ভাবছেন।"

"আপনি দয়া করে সিংহাসন ত্যাগ করুন।" সেনাপতিদের উত্তরে নেপোলিয়ন এতটুকু বিচলিত হলেন না। শুধু বললেন, "ঠিক আছে, তাই হোক।"

ঈগল-মার্কা দোয়াতে কলম ডুবিয়ে নেপোলিয়ন লিখলেন, "যে-হেতু মিত্রশক্তিবর্গ আমাকে সারা ইউরোপের শান্তির অন্তরায় বলে মনে করছেন, সেই হেতু আমি সিংহাসন ত্যাগ করছি। এমন কি এই কারণে আমি নিজের প্রাণটুকু পর্যন্ত ত্যাগ করতে দ্বিধা করব না। তবে আমার ছেলের উত্তরাধিকারীর দাবী এবং মারি লুইজার রাজ-প্রতিনিধিত্বের অধিকার যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।"

এই সর্তে জার আলেকজাণ্ডার প্রথমটায় রাজী হয়েও পরে নানা পরিস্থিতির চাপে পড়ে তিনি নেপোলিয়নকে জানালেন তাঁকে সর্তহীন ভাবে সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে! আর এরপর নেপোলিয়নকে যেতে হবে এল্‌বা দ্বীপে। এল্‌বা দ্বীপের আবহাওয়া ভালো। সেখানকার ভাষা ইতালীয়, নেপোলিয়নের নিশ্চয়ই কোন অসুবিধে হবে না।

"আর আমার স্ত্রী! আমার ছেলে! তারা তো আমার সঙ্গে যাবে! আমার সঙ্গেই থাকবে!" নেপোলিয়ন উত্তরের অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন। এল্‌বা দ্বীপে নাই-বা রইল আগের বিপুল সম্মান আর রাজকীয় মহিমা। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে একটু শান্তির বিশ্রামকুঞ্জ তো গড়ে তোলা যাবে! বহু ঘটনার শেষে এই অবসরটুকুই বা মন্দ কী!

কয়েকদিনের মধ্যেই খবর এল, এল্‌বা দ্বীপে নেপোলিয়নকে একা যেতে হবে। তাঁর সঙ্গে মারি লুইজা ও ছেলে যাবে না। তাদের যেতে দেওয়া হবে না। নেপোলিয়নের বড় আশায় ঘা মারা হল,

রাজনীতি মানুষকে এত নিষ্ঠুর করে ফেলে! একদা সম্রাট নেপোলিয়ন এখন অতি সাধারণ মানুষ হয়ে ঐ দ্বীপটুকুতে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একটু সুখের বাসা বাঁধবেন, তাতেও আপত্তি! না কি ঐ ধুরন্ধররা ভাবছেন ঐ দুজন কাছে থাকলে নেপোলিয়ন আবার শক্তি সঞ্চয় করবেন, ইউরোপের ইতিহাসে আবার ভীতির কারণ হয়ে উঠবেন!

নেপোলিয়ন খবর পেলেন মারি লুইজাকে ছেলে নিয়ে থাকতে হবে পারমা বলে একটা জায়গায়, যেখানে থাকলে এল্‌বা থেকে নেপোলিয়ন স্ত্রীর সঙ্গে কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারবেন না। নেপোলিয়ন বৃথাই ভেবেছিলেন অস্ট্রিয়া-রাজ ফ্রান্সিস অন্ততঃ তাঁর মেয়ের জন্য সম্মানজনক একটা কিছু করবেন। দেখলেন একমাত্র রাজনীতিই সত্য, আর সব কিছু ভুয়ো।

মারি লুইজা তখন ছেলেকে নিয়ে অর্লিন্‌স্‌-এ ছিলেন। নেপোলিয়ন খবর পাঠালেন একটিবার যেন মা আর ছেলে ফাউন্টেন ব্লোতে আসে। এগারো সপ্তাহ হল তাদের সঙ্গে দেখা নেই। নেপোলিয়ন একবার তাদের দেখবেন, কথা বলবেন, একটুখানি সময়ের জন্য পারিবারিক জীবনের স্বাদ পাবেন। সব কিছু তো ফুরিয়েই যাচ্ছে।

যাকে দিয়ে খবর পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরে এল। মারি লুইজা অর্লিন্‌স্‌-এ নেই। তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নেপোলিয়নের বুক চিরে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। একটি সাধারণ মানুষের সুখ থেকেও তিনি আজ বঞ্চিত।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল। শেষ রাত। ঘড়িতে তখন ঠিক তিনটে। নেপোলিয়নের শোবার ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। ঘরের দেওয়ালের চারদিকে প্যানেল করা তাক, তাতে সাজানো ঐতিহাসিক মহৎ ব্যক্তিদের মূর্তি। সবুজ ভেলভেটের চাদর বিছানো শয্যা, তাতে সোনালী পাড়, সারা গায়ে গোলাপ ফুল আঁকা। বিছানার মাথার ওপর অস্ট্রিচ পাখীর পালক বসানো, সোনালী ঈগল চিহ্নিত রাজমুকুট।

নেপোলিয়ন মারি লুইজাকে একখানা চিঠি লিখলেন, "মারি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, এই পৃথিবীতে আমি তোমাকেই সব চাইতে

বেশী ভালোবাসি···ইতি তোমার নেপোলিয়ন।" শুধু এই কটি কথা লিখে নেপোলিয়ন চিঠিখানা ভাঁজ করে বালিশের নীচে রাখলেন। এরপর একটা ছোট থলে থেকে নেপোলিয়ন একটা কাগজের পুরিয়া বার করলেন, সেটি খুললেন। পাউডারের মতো খানিকটা সাদা গুঁড়ো। নেপোলিয়ন সেই গুঁড়ো সামান্য জলে মেশালেন। তারপর সেইটুকু খেয়ে ফেললেন। এরপর কলিনকোর্টকে ডাকতে পাঠিয়ে শুয়ে পড়লেন।

গুঁড়োটা তৈরী করা হয়েছিল সেই রুশ অভিযানের সময়। যদিই কোন দুর্দৈব দেখা দেয়, সেইজন্য। তখন দরকার হয়নি। এখন সেই দুঃসময় উপস্থিত। অতএব নেপোলিয়ন তার পূর্ণ ব্যবহার করলেন। নেপোলিয়নের মনে পড়ল প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে রোমীয় ও গ্রীকবীরেরা এই নীতিতেই আত্মসম্মান বাঁচাতেন। আত্মসম্মানের কাছে প্রাণের মায়া কতটুকু!

অতএব নেপোলিয়নও আফিম, ধুতরো-বীজ আর একরকম লতানে কাঁটা গোলাপের মারাত্মক শেকড় মিশ্রিত সাংঘাতিক বিষ পান করতে ইতস্ততঃ করলেন না। নেপোলিয়ন আত্মহত্যা করে সব অপমান, না পাওয়ার লাঞ্ছনা এবং স্ত্রী-পুত্রের অদর্শনের যন্ত্রণা ভুলতে চেয়েছিলেন চিরকালের জন্য!

কলিনকোর্ট ঘরে ঢুকলেন। নেপোলিয়ন শুয়ে আছেন। হাতের ইসারায় কলিনকোর্টকে শয্যার এক পাশে বসতে বললেন। একটা লাল রং-এর চামড়ার ব্যাগ কলিনকোর্টের হাতে তুলে দিলেন। ব্যাগটার মধ্যে মারি লুইজার লেখা সব কখানা চিঠি গোছা করে বাঁধা রয়েছে। নেপোলিয়নের বড় প্রাণের জিনিস। এরপর নেপোলিয়ন ক্ষীণতর কণ্ঠে বললেন···"তোমার হাতখানা দাও বন্ধু, আমাকে আলিঙ্গন কর। তুমি সুখী হও।"

কলিনকোর্ট বুঝতে পারলেন নেপোলিয়ন কী করেছেন। তাঁর চোখে জল এল, জল ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়তে লাগল ঘন-সন্নিবিষ্ট নেপোলিয়নের হাতের ওপর।

এরপরেই নেপোলিয়নের পাকস্থলিতে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল আর তার সঙ্গে হিক্কা। অবিরত হিক্কা তুলতে তুলতে নেপোলিয়নের মনে হল পেটের সব কিছু যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। এ যন্ত্রণা দেখা যায় না। কলিনকোর্ট ডাক্তারের জন্য ব্যস্ত হলেন, নেপোলিয়ন বারণ করলেন। নেপোলিয়নের শরীর প্রথমে ঠাণ্ডা হয়ে এল, তারপরেই মনে হল গোটা শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে, শরীর পুড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নেপোলিয়নের সারা শরীর কঠিন শক্ত হয়ে গেল। নেপোলিয়ন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন, দাঁতে দাঁত দিয়ে রইলেন, যাতে এতটুকু বমি না হয়, পেটের বিষ বেরিয়ে গিয়ে তাঁকে না বাঁচিয়ে দেয়।

একটা সুযোগ পাওয়া মাত্র কলিনকোর্ট ঘর থেকে ছুটে বাইরে গেলেন, ডাক্তার নিয়ে এলেন। এসে দেখলেন নেপোলিয়ন সাংঘাতিক বমি করছেন, আর এই বমিই নেপোলিয়নকে সে যাত্রা বাঁচিয়ে তুলল। অর্থাৎ প্রকৃতিই নেপোলিয়নের স্টম্যাক ওয়াশ করিয়ে দিয়েছিল, নেপোলিয়নকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। নইলে নেপোলিয়নের পরবর্তী দুর্ভাগ্যের ইতিহাস তৈরী হবে কী করে… !

পরদিন। নেপোলিয়ন একটু সুস্থ বোধ করছিলেন। বিকেল-বেলা মারি লুইজার একটা চিঠি পেলেন, "আমার ওপর রাগ কোরো না। আমি চলে যাচ্ছি রামবোল্টে। তুমি কিন্তু ভেবে নিও না, আমি আর বাবা তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে এমনটি করেছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমি যদি তোমার দুর্ভাগ্যের অংশ নিতে পারতাম, আমি যদি তোমাকে এতটুকু দেখাশুনো করতে পারতাম তা হলে আমি কত না সুখী হতাম। এখানে একমাত্র সুখী তোমার ছেলে। অথচ ও কত হতভাগ্য, বেচারা জানেও না ও কতটা দুর্ভাগ্যের মধ্যে ডুবে আছে…।"

মারি লুইজার চিঠিখানা পেয়ে নেপোলিয়ন সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদ অনুভব করলেন। মৃত্যু নয়, আমি বেঁচে থাকব। যার এমন স্ত্রী, এমন ছেলে, তার আর দুঃখ কিসের। নেপোলিয়ন আশায়, আশায়

ভাবতে লাগলেন এমন কোন কিছু কি ঘটতে পারে না যাতে স্ত্রী-ছেলে সব কাছে এসে যায়… !

নেপোলিয়নের নামে আরেকখানা চিঠি এলো। এই চিঠিখানা এল শ্বশুর ফ্রান্সিসের কাছ থেকে, "আমি মেয়েকে ভিয়েনা নিয়ে আসব। সে কয়েকমাস তার পরিজনবর্গের কাছে থাকবে, একটু বিশ্রাম করবে…।" চিঠির নীচে ফ্রান্সিসের সই থাকলেও চিঠির মুসাবিদা, ভাষা, লেখা—সবই ছিল মেটারনিকের।

নেপোলিয়ন সব বুঝলেন, সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলেন তিনি শুধু সাম্রাজ্য হারাননি, প্যারিস হারাননি, তিনি চিরকালের মতো হারিয়েছেন মারি লুইজা আর প্রাণের প্রিয় ছোট্ট "রোমের রাজা"-কে।

ফাউন্টেন ব্লোতে আরও এক সপ্তাহ কাটল। নেপোলিয়নের এই এক সপ্তাহের জীবন বড় নিঃসঙ্গ, বড় বেদনাহত। এখানে এখন শুধু দিন যাপনের গ্লানি আর দিন গণনার ক্লান্তি…কবে যেতে হবে এল্‌বা দ্বীপে! সম্রাট নেপোলিয়নের নতুন রাজ্যে।

২০শে এপ্রিল। নেপোলিয়ন তাঁর সেনাবাহিনী, সেনাপতি, সমর-সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। দু-সারিতে দাঁড়িতে-থাকা সৈনিক বন্ধুদের নেপোলিয়ন শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। বড় আন্তরিক সে সম্ভাষণ, বড় করুণ…"আমার ওল্‌ড্‌ গার্ডের প্রিয় সৈনিকরা, গত বিশ বছর ধরে আমার সুখে, আমার গৌরবে, আমার সুদিনে তোমাদের আনুগত্য, তোমাদের উদ্যম ও বিশ্বস্ততা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। আজ এই স্বদেশভূমির মঙ্গলের জন্য আমি চলে যাচ্ছি। আমি বিদায় নিচ্ছি। আমার জন্য তোমরা দুঃখ কোরো না…।"

এরপর নেপোলিয়নের কাছে নিয়ে আসা হল সেই রাজকীয় প্রতীক, দুপক্ষ বিস্তৃত সোনালী ঈগল আর সোনালী এমব্রয়ডারি করা চারকোণা সাদা সিল্কের জাতীয় পতাকা…কত যুদ্ধের, কত গৌরবের সাক্ষী। নেপোলিয়ন পতাকা স্পর্শ করে কিছুক্ষণ অভিভূত

হয়ে বসে রইলেন। তারপর হাত তুললেন। বললেন, "বিদায় বন্ধুরা, তোমরা আমাকে মনে রেখো।"

নেপোলিয়ন সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে বসলেন। ঘোড়া চলতে লাগল জোর কদমে। সেনাবাহিনীর অশ্রুসিক্ত চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে এল গালের ওপর, ঝরে পড়ল ফ্রান্সের মাটিতে।

জাহাজের নাম "আনডন্টেড্"—"অদমনীয়"। ডেকের ওপর যে মানুষটি সবুজ কোর্ট আর সাদা প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনিও মাত্র কিছুদিন আগেকার ইউরোপের একজন 'আন্‌ডন্টেড্' ব্যক্তি, নাম নেপোলিয়ন। ইউরোপ থেকে জাহাজখানা আটলান্টিকের পথ দিয়ে পাঁচদিনের দিন এসে নোঙর করল এল্‌বা দ্বীপের বন্দর পোর্টোফারাগুতে। এল্‌বা দ্বীপের অধিবাসীরা অসীম কৌতূহল নিয়ে জাহাজের দিকে তাকিয়ে ছিল। জাহাজে আছেন তাদের রাজা, "এল্‌বা দ্বীপের সম্রাট" নেপোলিয়ন। তারা সোল্লাস অভ্যর্থনা জানালে।

এই দ্বীপে এই প্রথম রাজা।

জাহাজ থেকে একটা নৌকা করে নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপের মাটিতে পা দিলেন। প্রথম অভ্যর্থনা জানালেন মেয়র ত্রাদিদি। নগরের চাবি তুলে দিলেন নেপোলিয়নের হাতে…।

দূর থেকে এল্‌বা দ্বীপটিকে ছবির মতো লাগছিল, কিন্তু তার মাটিতে পা দিয়েই নেপোলিয়নের মন দমে গেল। কেমন যেন হল্‌দেটে বিবর্ণ, নোংরা শহর। গলি ঘুপ্‌চি রাস্তা। সব সময় মাছি ভ্যানভ্যান করছে। সেদিন ছিল ৪ঠা মে, ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দ।

পরদিন সকালবেলা ঘোড়ায় করে নেপোলিয়ন তাঁর নতুন "রাজ্যপাট' দেখতে বেরোলেন। কত বড় রাজ্য! আঠারো মাইল লম্বা আর বারো মাইল চওড়া, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাহাড়ে-ঘেরা অত্যন্ত দরিদ্র রাজ্য। প্রজা-অধিবাসীর সংখ্যা বড় জোর বারো হাজার। তাদের জীবিকা প্রধানতঃ মাছ ধরা, এবং আঙুর ক্ষেতে আর লোহার খনিতে কাজ করা।

নেপোলিয়ন তাঁর নতুন রাজ্যের শাসনভার তুলে নিলেন। ভাগ্যের দুয়ারে তিনি কখনই মাথা ঠুকতে চাননি। যদিও ভাগ্যদেবতা বার বার তাঁর কাছে শক্তি ফলিয়েছেন। তাই একদা যে নেপোলিয়ন অন্ততঃ কুড়িটি কর্মদপ্তর নিয়ে সাম্রাজ্য শাসন করেছেন, এল্‌বা দ্বীপে রাজত্ব করতে এসে দেখলেন মাত্র একটি কর্মদপ্তরই যথেষ্ট।

জাহাজে আসবার সময় নেপোলিয়ন নিজের মনকে একেবারে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন, জয়-পরাজয়ের খেলা ছেড়ে এবার তিনি নিজেকে গুটিয়েই নেবেন। বাকি জীবনটা তিনি পড়াশুনো করবেন। তাঁর নিজের জীবনে যে বিরাট জয়ের ইতিহাস রয়েছে, তাই নিয়ে এক বিরাট বই লিখবেন। জীবনটা কেটে যাবে। কেটে যাবে? নেপোলিয়নের তখন কত বয়স? বড় জোর পঁয়তাল্লিশ! জীবনের দিন ফুরনো কি অতই সহজ!

এল্‌বা দ্বীপের হৃতশ্রী মানুষগুলোকে দেখে নেপোলিয়নের মন সমবেদনায় ভরে উঠল। কী দারিদ্র্য! কী অবহেলা! নেপোলিয়নের কর্মীমন চঞ্চল হল। এদের জন্য তো কত কী করা যায়! সুযোগ আছে, লোকগুলির সামর্থ্য আছে, নেই শুধু ওদের পথ দেখাবার লোক, হদিস দেবার লোক…।

সবকিছু হতাশা, দুঃখ ঝেড়ে ফেলে নেপোলিয়ন নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। ইউরোপে তখন রাজা-রাজনীতিবিদরা নেপোলিনীয় সাম্রাজ্যের ভাগ বাঁটোয়ারা কেমন হবে, তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা জানতেও পারলেন না, এল্‌বা দ্বীপের "সম্রাট" 'অদমনীয়' সম্রাট হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আবার তাঁর কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন।

ঐ ছোট্ট দ্বীপের দরিদ্র নিরন্ন মানুষগুলি কয়েকদিনের মধ্যে যেন জাদুকরের স্পর্শে নতুন জীবন পেল। তারা এল্‌বার মাটিতে সোনা ফলাতে বসল। আলু, ফুলকপি, লেটুস, পেঁয়াজ, গাজরে ভরে গেল এল্‌বার যত সব পতিত জমি। আঙুরের চাষের সঙ্গে নেপোলিয়ন জুড়ে দিলেন জলপাইয়ের চাষ। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের ঢালু গায়ে বসিয়ে

দিলেন সারি সারি বাদাম গাছ। ভবিষ্যতে বড়ো হয়ে শুধু বাদাম ফলই দেবে না, সমুদ্রের গ্রাস থেকে জমির ক্ষয়-ক্ষতিকেও দূর করবে।

নেপোলিয়ন শুধু এইটুকুতেই থেমে গেলেন না, তিনি আরেকটু এগিয়ে গেলেন। বড়ো চমকপ্রদ এগিয়ে যাওয়া। এল্‌বার পনেরো মাইল দক্ষিণে আছে পিনোজা নামে এক অখ্যাত দ্বীপ। নেপোলিয়ন কোন্ একটা বইয়ে পড়েছিলেন এই দ্বীপে নাকি এককালে গমের চাষ হত। এককালে যখন হত, একালে হতে বাধা কোথায়! অতএব নেপোলিয়ন একদিন জাহাজে করে ঐ দ্বীপটিতে গেলেন। সেখানে গম-চাষের ব্যবস্থা করলেন। তাঁরই নির্দেশে পাহাড়ের গায়ে মেষ চারণ শুরু হল। সেখানে নতুন করে জন-বসতির ব্যবস্থা করলেন। আবার জলদস্যুদের হাত থেকে দ্বীপটিকে রক্ষা করবার জন্য সেখানে দুর্গ ও সেনানিবাস তৈরী করবার পরিকল্পনাও নিলেন।

নেপোলিয়ন ব্যক্তিগত শ্রম দিয়ে থ' বানিয়ে দিলেন তাঁর নতুন প্রজাদের। তিনি নিজের হাতে যখন জমিতে লাঙল দিতেন আর নৌকোয় উঠে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মিলে মিশে মাছ ধরতেন, তখন প্রজাদের মন বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যেত। মাছির অস্বাস্থ্যকর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য এবং আর সবাইকে বাঁচানোর জন্য নেপো-লিয়ন সমস্ত বাড়ি বাড়ি ময়লা ফেলার ঝুড়ি হাতে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। বাড়ির গৃহিণীদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন বাড়ির ময়লা কিছুতেই রাস্তার যেখানে-সেখানে না ফেলে। ময়লা সংগ্রহের লোক গেলে তার ঝুড়িতে ময়লা ফেলে দেবে। এই চলন্ত ডাস্টবিন চালু হবার ফলে মাছি দূর হল, রোগ ছড়াবার মূলটিকে নষ্ট-করা হল।

নেপোলিয়ন আদেশ দিলেন সবাইকে খেটে খেতে হবে এবং খাটতে হবেই। আর বাজে সময় নষ্ট নয়। এবার শুধু কাজ আর কাজ। ফলে মাত্র কিছু দিনের মধ্যে রাস্তা পরিষ্কার হল। রাস্তা বাঁধানো হল। রাস্তায় আলো জ্বলল। ঘাস বসিয়ে মাঝে মাঝে লন হল, সেই লনে বসবার জন্য আবার বেঞ্চি পাতা হল। কী করে এত সব হল… !

নেপোলিয়ন আদেশ জারী করলেন সকালবেলা কেউ পাঁচটার পরে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারবে না। নেপোলিয়ন নিজে উঠতেন ঐ সময়। কাজে বেরোতেন। কাজ থেকে ফিরে আসতেন বেলা তিনটেয় ঘামে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে। সামান্য বিশ্রাম নিয়েই আবার বেরিয়ে পড়তেন। এবার ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক। বলতেন ক্লান্তি দূর করতে এর তুলনা নেই। এই ভাবে মৃতপ্রায়, নিস্তেজ এল্‌বা দ্বীপে সকলের বাধ্যতামূলক নিদারুণ শ্রমের আহুতিতে যজ্ঞের আগুন জ্বলে উঠল।

নেপোলিয়নের নিজের বাড়িটি ছিল একেবারে সমুদ্রের ধারে। বাড়িটার নাম 'দ্য মিল্‌স্'। বাড়িটিকে সংস্কার করে, জমিতে বাগান করে তাকে ছবির মতো করে তুলেছিলেন। আরেকখানা বাড়ি ছিল পাহাড়ের ওপর। তার বসবার ঘরের দেয়ালে ঠিক মিশরীয় কায়দায় ছবি আঁকা ছিল। তবে তাঁর আসবাবপত্র সবই ছিল।ববর্ণ, পুরনো। ট্যুইলারী প্রাসাদের সম্ভ্রান্ত স্মৃতি নেপোলিয়নকে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে বিমনা করে দিত।

নেপোলিয়ন সত্যিই বিমনা হয়ে যেতেন। ট্যুইলারীর কথা ভেবে নয়, স্ত্রী-পুত্রের কথা ভেবে। সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবতেন স্বামী-স্ত্রীতে কি আর দেখা হবে না! বাপ ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে আর আদর করবে না! বড়ো মন কেমন করে মারি লুইজা আর বাচ্চা নেপোলিয়নের জন্য। এরই মধ্যে আজকাল বড়ো বেশী মনে পড়ছে জোসেফাইনকে। তাঁর স্মৃতি তো কই এতটুকু ম্লান হয়নি। নেপোলিয়ন ভুলতে পারেননি জোসেফাইনের রুচি, তাঁর সৌন্দর্যবোধ, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সৌজন্য।

জোসেফাইনও এই সময় বড় বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ভীষণ কাশি আর গলায় ব্যথা। তার সঙ্গে জ্বর। ডাক্তার এসে রায় দিলেন ডিপথেরিয়া। জোসেফাইনের কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এল। জোসেফাইন বুঝতে পারলেন এই পৃথিবীতে আর বেশী দিন নয়। সময় ফুরিয়ে আসছে। এই নির্বাক অসুস্থ অবস্থায় নেপোলিয়নকে

যেন বড় বেশী মনে পড়ছিল। কতসময় নেপোলিয়নের অকারণ চঞ্চলতা, তাঁর ভালোবাসার তুর্দান্ত প্রকাশ, স্ত্রীকে ঘন সন্নিবদ্ধ করবার জন্য সৌজন্যহীন শক্তির প্রয়োগ জোসেফাইনকে বিরক্ত করত, তাঁর রুচিবোধকে আঘাত করত। সেই নেপোলিয়নকে আজকাল বড়ো বেশী মনে পড়ছে। জোসেফাইন এখন শুধু স্মৃতি মন্থন করে সময় কাটান। সযত্নে রক্ষা করে চলেন মালমাইসন প্রাসাদে স্বামীর প্রতিটি স্মৃতিকে। এমন কি স্বামী যে ইতিহাসের বইটি পড়তে পড়তে যে পাতা পর্যন্ত পড়ে জোসেফাইনকে শেষ বিদায় জানিয়েছিলেন, সেই পাতা-খোলা-অবস্থায় বইখানা জোসেফাইন এমনভাবে রেখে দিয়েছিলেন যে দেখে মনে হত, নেপোলিয়ন বুঝি একটু বাইরে গেছেন, এখনই ফিরে এসে আবার বই নিয়ে বসবেন। বড় দেখতে ইচ্ছে করছে নেপোলিয়নকে। ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ, অসুস্থ, একেবারে বাকশক্তিহীন, জোসেফাইন নিজের মনেই একবার মাথা নাড়লেন। আর দেখা হবে না। এ জীবনে নয়।

সত্যিই জোসেফাইনের সঙ্গে নেপোলিয়নের আর দেখা হল না। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে মে জোসেফাইন মারা গেলেন। মৃত্যুকালে কাছে ছিল ইউজিন ও হরটেন্স। ছেলে ও মেয়ে।

জোসেফাইনের মৃত্যু সংবাদে নেপোলিয়ন তুহাতে মুখ ঢেকে বসেছিলেন অনেকক্ষণ। গলার কাছে টনটনিয়ে উঠেছিল। এখনও পর্যন্ত জোসেফাইন মনের এতখানি জায়গা জুড়ে বসেছিলেন! নেপোলিয়ন তুদিন ঘর থেকে বেরোলেন না, কোন কাজ করলেন না। জোসেফাইন যতদিন নেপোলিয়নের জীবনে ছিলেন, ততদিন নেপোলিয়ন শুধুই উঠেছেন, শুধুই জয়ধ্বনি শুনেছেন। সৌভাগ্যের শীর্ষে উঠে নেপোলিয়ন রাজনীতির নির্দেশে জোসেফাইনকে নিজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। লোকে বলে সেইদিন থেকেই নাকি নেপোলিয়নের ভাগ্যসূর্য পশ্চিম আকাশের গায়ে হেলে পড়েছিল। হবেও বা। জীবনে কাকতালীয়বৎ কত ঘটনাই তো ঘটে!

"দ্য মিল্‌স্‌"-এর জানালা দিয়ে দেখা যায় সমুদ্র আর আকাশের

মিলনরেখা। এই দিকে তাকিয়ে মনের যত কিছু ভাবনার রাশ খুলে দিতে বড় ভালো লাগে। নেপোলিয়নের মনে পড়ে আরেকটি মেয়ের কথা। একটি আশ্চর্য মেয়ে। নেপোলিয়ন সযত্নে রক্ষা করে চলতেন একটা সোনার লকেট। লকেটটি খুললে দেখা যেত একগুচ্ছ সোনালী চুল, আর খোদাই করা একটি ছোট্ট লেখা···"তুমি যখন আমাকে আর ভালোবাসবে না, মনে রেখো, আমি তখনও তোমাকে ভালোবাসবো···!"

আশ্চর্য মেয়েই বটে। তারও নাম মারি। বিয়ের পর মারি ওয়ালস্কা। পোল্যাণ্ডের মেয়ে। পাঁচ ভাই বোনেদের মধ্যে একজন। বাবা ছিলেন একজন অভিজাত পোলিশ। যুদ্ধে বাপের মৃত্যুর পর মারি ও তার বাড়ির আর সকলে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন, আর এই দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মারিকে বিয়ে করতে হল তাঁর চাইতে উনপঞ্চাশ বছরের বড়ো ক্লাউন্ট ওয়ালস্কাকে। মারির সঙ্গে নেপোলিয়নের প্রথম দেখা হয় ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে। পরিচয় হয়। পরিচয়ের পথ ধরে দুজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হন। নেপোলিয়নকে মারি শ্রদ্ধা করতেন, ভক্তি করতেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের আগের থেকেই মারি ঘরে নেপোলিয়নের ছবি টাঙিয়েছিলেন। এত ভক্তির কারণ মারির দেশপ্রেম। তাঁর দেশ পোল্যাণ্ডকে নেপোলিয়ন প্রাশিয়া ও রাশিয়ার গ্রাস থেকে মুক্ত করেছিলেন। মারি তাই নেপোলিয়নের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন আর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ হাতে এক গোছা ফুল নিয়ে পথের ধারে আরও অনেকের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে থেকে নেপোলিয়নকে গাড়ি করে যেতে দেখেছিলেন। আর তখনই নেপোলিয়নের হাতে ফুল দিয়ে বলেছিলেন, "স্বাগতম, আপনি আমাদের দেশে আরও অনেক, অনেকবার আসবেন।" সে যুগে মেয়েরা সাধারণতঃ কেশ ও বেশ পরিচর্যা আর বাজে হাল্‌কা কাজে দিন কাটাতো। সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি মেয়ের মধ্যে এই উষ্ণ দেশপ্রেমের পরিচয়ে নেপোলিয়নের জাতীয়তাবাদী মন খুশি হল। তিনি মুগ্ধ হলেন মারি ওয়ালস্কার বুদ্ধিদীপ্ত জ্বলজ্বলে দুটি চোখ দেখে। মন্তব্য করলেন, "বেশ মেয়েটি,

চমৎকার···।" আর সেই হল শুরু। নেপোলিয়নের বয়স তখন সাঁইত্রিশ, মারি ওয়ালস্কার কুড়ি। নেপোলিয়ন মারি ওয়ালস্কার উষ্ণ হৃদয়ের কাছে নতি স্বীকার করলেন। পোল্যাণ্ডের স্বদেশভক্ত অধিবাসীরা তাদের জাতীয় জীবনে নেপোলিয়ন-মারি ওয়ালস্কার ঘনিষ্ঠতাকে অভিনন্দন জানাল। কারণ রাশিয়া ও প্রাশিয়ার উদ্যত থাবা থেকে পোল্যাণ্ডকে বাঁচাতে হলে নেপোলিয়নের বন্ধুত্ব, তার সাহায্য একান্ত দরকার। সুতরাং রাজনীতির দিক থেকে নেপোলিয়ন-মারি ওয়ালস্কার রোম্যান্টিক জুটি অভিনন্দিত হল।

১৮১০ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ন-মারি ওয়ালস্কার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। নেপোলিয়ন বলতে গেলে এই প্রথম সন্তানস্নেহের স্বাদ পেলেন। সমাজের চোখে এই সন্তান অবৈধ হলেও নেপোলিয়ন কিন্তু কোনদিন এই পুত্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি। নেপোলিয়ন যখনই পোল্যাণ্ডে গেছেন, মারি ওয়ালস্কার সঙ্গে দেখা করেছেন। দেখেছেন ছেলে আলেকজাণ্ডারকে। ছেলের ভরণ-পোষণে যাতে কোন কষ্ট না হয়, ছেলে যাতে মানুষ হতে পারে, নেপোলিয়ন তার সবরকম ব্যবস্থা করেছিলেন।

আশ্চর্য, এল্‌বা দ্বীপে নেপোলিয়নের প্রায় নিঃসঙ্গ জীবনে এলেন কিনা মারি ওয়ালস্কা, সঙ্গে চার বছরের ছেলে আলেকজাণ্ডার। কী খুশিই না হয়েছিলেন নেপোলিয়ন! মারি ওয়ালস্কা এল্‌বা দ্বীপে আসবার পর দিনই নেপোলিয়ন মা আর ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। এক হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন মারির একখানা হাত। আরেক হাত দিয়ে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছিলেন ছেলে আলেক-জাণ্ডারকে। দেখতে যেন অনেকটাই "রোমের রাজা"র মতো। কী ভালোই না লেগেছিল ছোট্ট আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সারাদিন মাঠে-ঘাটে ছুটোছুটি করে বেড়িয়ে। সন্ধ্যাবেলাটা কাটল নেচে, গেয়ে, গল্প করে।

"আমি এখানে থাকব। এই বাড়িতে না হোক, কাছাকাছি কোন বাড়িতে। তবুও তো তোমাকে দেখতে পাব, প্রয়োজনের সময়

তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারব···!" মারি ওয়ালস্কা কাতর আবেদন জানালেন।

"সে হয় না মারি···।" সঙ্গ-সুখ লোভী নেপোলিয়ন মনের আবেগ চেপে সংযত ভাবে বললেন।

"কেন হয় না?" মারি একটু ধৈর্য হারালেন।

"আমার জন্য তাহলে এই এল্‌বা দ্বীপের প্রজাদের নাম খারাপ হবে। লোকে তাদের নিন্দে করবে।"

মারি এই বিষয়ে আর কোন কথা বললেন না। এর পরদিন সন্ধ্যেবেলা মারি ওয়ালস্কা আলেকজাণ্ডারকে নিয়ে আবার ফিরে গেলেন। নেপোলিয়ন আবার নিঃসঙ্গ, একাকী।

এল্‌বা দ্বীপে নেপোলিয়নকে দেখতে আরও দুটি মহিলা এসেছিলেন। একজন নেপোলিয়নের মা ল্যাটিজিয়া, আরেকজন বোন পলিন। জাহাজ থেকে নামতেই মা ছেলেতে দেখা হল। মা ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, ছেলে ধরলেন মাকে। ছেলের চোখে জল। সব চাইতে প্রিয় বোন পলিনকে দেখেও মন বড় খুশি। নেপোলিয়নের নিঃসঙ্গ, বিমর্ষ জীবন মা-বোনের সাহচর্যে আলোর ঝর্ণার মতো ঝিক্‌মিকিয়ে উঠল।

নেপোলিয়ন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যান। মারি লুইজাকে চিঠি দিয়ে কত অনুরোধ করে অনুনয় করেছেন, ছেলেকে নিয়ে তিনি যেন অতি অবশ্যই একবার এল্‌বা দ্বীপে আসেন, বড়ো মন কেমন করে মা আর ছেলের জন্য। কিন্তু মারি লুইজার কোন চিঠি নেই কেন? কী করছিলেন তখন মারি লুইজা!

"The Dynasts"-এর নাট্যকার টমাস হার্ডি মারি লুইজার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

A puppet I, by force inflexible,
was bid to wed Napoleon at a nod—
The man acclaimed to me from cradle—days

As the incarnate of all evil things,
The Antichrist himself—I kissed the cup,
Gulped down the inevitable, and married him ;
But none the less I saw myself therein
The lamb whose innocent flesh was dressed to Grace
The alter of dynastic ritual !—
Hence Elba flung on duty-call to me,
Neither does Paris now.

"পুতুলের মতো আমি বাধ্য হয়েছি শক্তির কাছে মাথা নীচু করে নেপোলিয়নকে বিয়ে করতে···জন্মাবধি শুনে আসছি তিনি শয়তানের মূর্ত বিগ্রহ, খ্রীস্টবিরোধী। আমি দেখলাম, আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই, কেবল রাজবংশের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই আমার এ দেহ উৎসর্গীকৃত···। তাই 'এল্‌বা' বা 'প্যারিস', কোনখানেই আমি যেতে চাই না। কোন স্থানই আমার কাছে কোন কর্তব্যের আহ্বান নিয়ে আসেনি··· ।"

ঐ একই নাটকে নাট্যকার মারি লুইজার কথার উত্তরে তাঁর দিদিমা মারি ক্যারোলিনকে দিয়ে বলিয়েছেন ··

I do perceive
They have worked on you too much effect already
Go, join your count ; he waits you, dear.—Well, well ;
The way the wind blows needs no cock to tell !

"···আমি তোমার দুঃখ বুঝি। তুমি খুবই বিব্রত। তবু, লক্ষ্মীটি, তুমি যাও, তোমার জন্য কাউন্ট অপেক্ষা করছেন। তুমি যাও···আর দেখো বাছা, বাতাস কোন্ দিকে বয়, বলে দেবার দরকার হয় না··· ।"

নাটক হলেও সত্যি। মারি লুইজা তখন সত্যিই কাউন্ট নীপার্গ, সেনাপতি কাউন্ট নীপার্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিলেন, তাঁর প্রেমে মেতে উঠেছিলেন। নীপারের নীলশিরায় ছিল অস্ট্রীয়-ফরাসী মিশ্রিত রক্ত। যুদ্ধে একটি চোখ হারিয়েছিলেন। তাকে একটা কালো সিল্কের

ফিতে দিয়ে ঢেকে মাথার পেছনে টানা দিয়ে বেঁধে রাখতেন— ইস্রায়েলের সেনাপতি ডায়ানের কায়দায়। এমনিতে নীপার বেশ সুশ্রী। তাঁর ব্যবহার সুন্দর। সুন্দর তাঁর গানের গলা। মেয়ে ভুলাবার অদ্ভুত ক্ষমতা রাখতেন ভদ্রলোক। মারি লুইজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার মাত্র কিছুদিন আগে নীপার একজনের বউকে ফুসলে ঘর থেকে বার করে নিয়ে আসার কেরামতি দেখিয়েছিলেন। মেটারনিকের কারসাজিতেই নীপার মারি লুইজার কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রথমে নীপার মারির দেহরক্ষীর পদে নিযুক্ত হলেন তারপরে মারির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হলেন। এর পেছনেও ছিল মেটারনিকের ইঙ্গিত। নীপারকে তিনি আগেই চোখ টিপে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মারি যেন তাঁর সাহচর্যে এসে নেপোলিয়নকে ভুলে যায়, নেপোলিয়নের নামও যেন মারির মুখে উচ্চারিত না হয়, সে যেন কখনও স্বামী বলে, কেঁদে এল্‌বা দ্বীপে যাবার আবদার না ধরে। খুব সাবধান। মারি লুইজার দিক থেকে অবশ্য কোন আশঙ্কাই রইল না। কারণ দেখা গেল কাউন্ট নীপার মারিকে অতীতের সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছেন। মারি লুইজা আর ফরাসী সম্রাজ্ঞী নন, "কিং অব রোমের" মা নন, নেপোলিয়ন-বিঘোষিত রাজপ্রতিনিধি নন, তিনি তখন শুধুই নীপারের সহচারিণী, তাঁর রক্ষিতা।

আর ওদিকে এল্‌বা দ্বীপে নেপোলিয়ন ভেবে পাচ্ছেন না কী হল মারি লুইজার, কী হল তাঁদের ছেলের!

তবে শুধু ছেলে বউ-এর চিন্তা নয়, নেপোলিয়ন ইতিমধ্যে নিজের সম্বন্ধেও বড় ভাবনায় পড়েছিলেন। এল্‌বা দ্বীপের নির্বাসনের ঠিক আগে যে চুক্তি বা সন্ধি হয়েছিল, তাতে তাঁকে দেয় যে বৃত্তিটা ঠিক হয়েছিল, সেটা বর্তমানে নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে না, এমনকি শোনা যাচ্ছে বৃত্তিটা নাকি একবারেই বন্ধ করে দেওয়া হবে! নেপোলিয়নের তো মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। বৃত্তি বন্ধ করে দিলে তাঁর খরচ চলবে কী করে? এল্‌বা দ্বীপের সামান্য ব্যবসা থেকে যা আয়, তা তো এল্‌বা রাজ্যের ব্যাপারেই খরচ হয়ে যায়। তিনি এখানে বৃত্তি না

পেলে টিকে থাকবেন কী করে। যাই হোক, নেপোলিয়ন অনেক কিছু খরচ কমিয়ে দিলেন, অনেক ঘোড়া বিক্রি করে দিলেন। কর্মচারীদের যে আবাসিক ব্যবস্থা ছিল, তা তুলে দিলেন। ল্যাটিজিয়া এই দুঃসময়ে নিজের খানকতক দামী পাথর বিক্রি করে সেই টাকাটা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর অনটন কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এতে তো সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয় না।

একেই আর্থিক দুশ্চিন্তা। এর ওপর নেপোলিয়নের কানে আরেকটি সাংঘাতিক গুজব ভেসে এল। তাঁকে নাকি আর ইউরোপের এত কাছের দ্বীপ এল্‌বাতে রাখা হবে না। তাঁকে আরও দূরে, হয় আজোর, নয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নয় সেণ্ট হেলেনার মতো কোন জায়গায় পাঠান হবে।

গুজবটা কিন্তু সত্যি। সত্যিই এই বিষয়ে তখন ট্যালিরাণ্ড প্রভৃতি ধুরন্ধর ব্যক্তিরা জোর আলোচনা চালাচ্ছিলেন। বিশেষ করে ট্যালিরাণ্ড তো স্পষ্টই বলতেন নেপোলিয়নের মতো লোকের ইউরোপের এত কাছে থাকা মানে ইউরোপের বিপদ ডেকে আনা…।

ফরাসী দেশের ইতিহাসে তখন দৃশ্যান্তর ঘটেছে। ফরাসী সিংহাসনে তখন বসেছেন অষ্টাদশ লুই। শরীরে তাঁর খাঁটি বুরবোঁ রাজরক্ত। বড় বেশী "স্বাস্থ্যবান।"। চলতে গেলে থপ্‌ থপ্‌ শব্দ হয়। তবে বেশী চলাফেরা করেন না। একটু ওঠা-বসা করতে গেলেই ককিয়ে ওঠেন। কারণ শরীরটা বাতের দাপটে বড়ো কাবু। মাথার চুল পেছন দিকে পিগ-টেইল বা শুয়োরের ল্যাজের অনুকরণে একটা ছোট্ট বিনুনী করা। লুই, সম্রাট অষ্টাদশ লুই হিসেবে প্রথম দিন দেখা দিয়েছিলেন প্রাশিয়ার স্টাইলে বোতাম আটকানো আঁট ট্রাউজার পরে আর গায়ে ইংলিশ স্টাইলে নৌ-কর্মচারীর কোট চাপিয়ে। হয়তো অষ্টাদশ লুই সেদিনকার পোশাকে প্রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ব্লুকার ও আর্থার ওয়েলস্‌লি, ডিউক অব ওয়লিংটনের কাছে কোন বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ ঐ দুজন

সেনাপতি না থাকলে তাঁর হাতে প্যারিসের চাবি কে তুলে দিত! তাঁকে কে বলত "সম্রাট অষ্টাদশ লুই"। বাতের ব্যথাটা যখন বড় বেশী চেগে ওঠে, তখন অষ্টাদশ লুইকে একটা চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে এদিক ওদিক চলাফেরা করতে হয়। সম্রাট লুই এদিক-ওদিক তাকান। সুন্দরী, সুবেশা অভিজাত মহিলারা দরবার গৃহ আলোকিত করে থাকেন। সম্রাট লুই দেখেন আর জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটেন। নিষ্ঠুর ঈশ্বর তাঁর সব ক্ষমতাই কি ছাই কেড়ে নিয়েছেন···! ঐ অক্ষমতার জন্যই তো তিনি সর্বক্ষণ অত খিটমিট করেন, হাঁড়ি-মুখ করে বসে থাকেন। একটা নাম সই করতেই বিরক্ত হন।

কিন্তু এদিকে তো ব্যস্ততার সীমা-পরিসীমা নেই। নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপে রওনা হবার পরদিন থেকেই ইউরোপের রাজনীতিবিদদের মধ্যে নানান রকম আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। একটা ধুরন্ধর-সম্মেলন হল অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। ইতিহাসে এই সম্মেলনের নাম ভিয়েনা কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে ছিলেন রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার, অস্ট্রিয়ার মেটারনিক, ইংল্যাণ্ডের ক্যাসালরিগ আর ফ্রান্সের ট্যালিরাণ্ড। ফরাসী সাম্রাজ্যকে ছেঁটে দিয়ে কে কতটা ভাগ নেবে, কে কতটা ঝোল নিজের কোলে টানবে—এই নিয়ে যখন সবাই খুব ব্যস্ত ছিলেন, আর তারই মধ্যে একদিন একটা নাচ-গানের পার্টিতে সকলে যখন হৈ-হল্লায় উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেই সময় বিদ্যুতের চাবুকের মতো একটা খবর এল। খবর এল এল্‌বায় নির্বাসিত সেই অদমনীয় লোকটা, যার নাম নেপোলিয়ন, আবার নাকি ফিরে এসে ইউরোপের মাটিতে পা দিয়েছে। ধেয়ে আসছে প্যারিসের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে ঐ পার্টির উল্লাসে নেমে এল ত্রাসমিশ্রিত শীতল নীরবতা। কেবল ট্যালিরাণ্ড চিৎকার করে উঠলেন, "আমি আগেই বলেছিলাম ও শয়তানটা সহজে ছাড়বে না···।"

নেপোলিয়ন সত্যিই ফিরে এসেছিলেন। তিনি ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিছুদিন ধরে সেই অপেক্ষাতেই ছিলেন।

নেপোলিয়নের কাছে খবর গিয়েছিল ফ্রান্সের প্রজারা বর্তমানে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। বেকারের সংখ্যা বেড়েছে, সাম্য, মৈত্রীর আদর্শ কোন্ চুলোয় মিলিয়ে গেছে, শাসনের নামে এখন দেশময় বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। নেপোলিয়ন শাসনের যে স্বাদ একবার প্রজাদের দিয়েছিলেন, তার অভাব এখন তারা সহ্য করবে কি করে! ফ্লুরি নামে একটি লোক নাবিকের বেশে এল্‌বায় এল, নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করল। দুজনের মধ্যে অনেক কিছু আলোচনা হল। আলোচনার সারাংশ হল, মেপোলিয়ন ফিরে চলুন ফ্রান্সে। দেশময় অসন্তোষ সেই সোনার সুযোগ এনে দিয়েছে। নেপোলিয়ন চলে আসুন। ফ্লুরি এই বার্তাটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন নেপোলিয়নের একদা-বৈদেশিক মন্ত্রী মারেটের কাছ থেকে।

নেপোলিয়ন সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরী করলেন না। তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। তখন এল্‌বা দ্বীপে যে চতুরতম লোকটি নেপোলিয়নের সব কিছুর ওপর নজর রাখত, এমন কি তাঁর মনের গতিবিধি পর্যন্ত আঁচ করে তাঁকে একটু-আধটু সন্দেহ করতে শুরু করেছিল, সে লোকটির নাম ছিল নীল ক্যাম্পবেল। নেপোলিয়ন যতদূর সম্ভব লোকটিকে এড়িয়ে চলতেন। হঠাৎ এই লোকটি দিন দশেকের জন্য ফ্লোরেন্স গেল আর এই মহা সুযোগে নেপোলিয়ন সব কিছু গুছোতে বসলেন। তাঁকে এই ব্যাপারে সাহায্য করলেন সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল ড্রুয়ো।

নেপোলিয়ন খবর পেয়েছিলেন "ইন্‌কন্‌স্টেন্ট" নামে একটা জাহাজ ন' দিনের মধ্যে এল্‌বা ছাড়ছে। নেপোলিয়ন ড্রুয়োকে অনুরোধ করে নির্দেশ দিলেন জাহাজখানাকে একেবারে ইংরেজদের জাহাজের মতো রং করে দিতে। জাহাজে থাকবে ছাব্বিশটি কামান আর তিন মাসের মতো একশ' কুড়ি জন লোকের খাদ্য বিস্কুট, সব্জী, চাল, পনীর, ব্রাণ্ডি আর পানীয় জল।

সব কিছু নির্দেশ পালন করা হল। যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা। নেপো৷লয়ন বাড়িতে বসে মা-বোনের সঙ্গে অনেকক্ষণ

গল্প করলেন, তাস খেললেন, তারপর আচমকা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। বাগানে গেলেন। ল্যাটিজিয়া বুঝতে পারলেন ছেলের মনে কোন একটা চিন্তা তোলপাড় করছে। তিনিও ছেলেকে অনুসরণ করে বাগানে গেলেন। দেখলেন ছেলে একটা বিরাট ডুমুর গাছের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা ছেলেকে স্পর্শ করে জানতে চাইলেন কি হয়েছে। নেপোলিয়ন সব কিছু খুলে বললেন। সব কিছু শুনে মা ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন, "ঠিক কাজই করতে যাচ্ছ। এমন অসম্মানজনক অবসরের চাইতে তরবারি হাতে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি…।"

ইন্‌কনস্ট্যাণ্টকে নিয়ে সবশুদ্ধ সাতখানা জাহাজের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সাতখানা জাহাজ সাতভাগে বিভক্ত হল। নেপোলিয়ন আর তাঁর সঙ্গী সৈন্য, সেনাপতি ইত্যাদি মিলে সংখ্যায় ছিল হাজার, আর তাদের পরিবার-পরিজনবর্গকে নিয়ে হল সাড়ে এগার'শ। সমুদ্রের বুকে জাহাজগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলল। জাহাজের মাস্তুলের মাথায় টাঙিয়ে দেওয়া হল ফ্রান্সের তদানীন্তন তেরঙ্গা পতাকা। নেপোলিয়ন নিজের মাথায় পরলেন তেরঙ্গা ফিতে আটকানো টুপি।

নেপোলিয়ন ইউরোপের মাটিতে পা রাখলেন ১লা মার্চ, ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে। নেপোলিয়ন আর তাঁর হাজারখানেক সঙ্গী সাথী সেদিন গোটা ইউরোপকে চ্যালেঞ্জ জানালেন।

নেপোলিয়ন প্রথম যে জায়গাটিতে পা রেখেছিলেন, তার নাম ছিল ক্যানিস। জলপাই গাছের ঘেরা সবুজ শ্যামল ছোট্ট সুন্দর একটা জায়গা। তবে নেপোলিয়ন বেশীক্ষণ বিশ্রাম করলেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। আগে আল্‌স্‌ পর্বত পার হওয়া, তারপর প্যারিস। ঘোড়ার গতিতে প্যারিস পৌঁছতে হবে, কেউ টের পাবার আগেই সেখানে যেতে হবে।

ক্যানিস থেকে গ্র্যাসি। গ্র্যাসি থেকে শুরু হল পাহাড়ে রাস্তা,

নেপোলিয়ন যত উঁচুতে উঠতে লাগলেন, ততই বরফের আস্তরণে এগিয়ে যাওয়ার পথ ঢেকে যেতে লাগল। নেপোলিয়ন এগিয়ে যেতে লাগলেন আর এই চলার পথে যুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ যোগাড় করতে লাগলেন ঘোড়া, মালবাহী খচ্চর, আর তার সঙ্গে অন্যান্য উপকরণ। যুদ্ধাভিযানের পথে যুদ্ধোপকরণ যোগাড় করে এগিয়ে যাওয়ার উদাহরণ ইতিহাসে বড়ো একটা মেলে না। 'নেপোলিয়ন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরও ষাট মাইল এগিয়ে গেলেন। প্যারিসে যত দ্রুত যাওয়া যাবে ততই অবস্থা অনুকূলে আসবে। পথে পড়ল দিগ্‌নে, গেনোব্‌ল্‌, অবশেষে সিস্‌টারোন। ১লা মার্চ ইতালীয় উপকূল ক্যানিসে নেমে মাত্র চারদিন পরেই সিস্‌টারোনে পৌঁছে নেপোলিয়ন আবার প্রমাণ করতে চাইলেন "অসম্ভব" বলে কিছু নেই।

পার্বত্য গ্রাম সিস্‌টারোনে একটা সরাইখানায় বসে নেপোলিয়ন যখন একটু খেয়ে নিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় ট্যুইলারী প্রাসাদে বেতো রাজা অষ্টাদশ লুই-এর কাছে একটা তার-বার্তা পৌঁছল। তখনকার দিনে সঙ্কেত পাঠিয়ে পাঠিয়ে টেলিগ্রাফিক মেসেজ পাঠানোর রেওয়াজ ছিল। টেলিগ্রামটি পেয়েই অষ্টাদশ লুই কেমন যেন আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন। তার ওপর বাতের ধাক্কায় আঙ্‌লগুলো আবার নড়ে না, চড়ে না। চিঠির সীল খুলতেই কত সময় লেগে গেল। আর চিঠি খুলে তার বিষয়বস্তু পড়েই অষ্টাদশ লুই একেবারে ঠাণ্ডা নিথর হয়ে গেলেন। এ কী সাংঘাতিক অসম্ভব খবর! খানিকক্ষণ থ মেরে বসে থেকে লুই সমর-মন্ত্রী সাউল্টকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী এলে লুই কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "একী খবর! নেপোলিয়ন এল্‌বা থেকে চলে এসেছে···! কী হবে এখন!"

সাউল্ট আগেই এই খবর শুনেছিলেন। ফ্রান্সের সম্রাটের অবস্থা দেখে হাসি চেপে সান্ত্বনা দিলেন, "ভয়ের কিছু নেই। লিয়োঁ শহরে নেপোলিয়নকে বাধা দেওয়ার জন্য এখনই কামান সাজাতে বলা হচ্ছে·

সিস্‌টারোন থেকে আরও এগিয়ে মাত্র দুদিনের মধ্যে নেপোলিয়ন

পৌঁছলেন ক্যাপ্‌স বলে একটা জায়গায়। সেখানে খবর পেলেন মাত্র কয়েক মাইল আগে এক বিরাট সেনাবাহিনী অপেক্ষা করছে নেপোলিয়নকে বাধা দেবার জন্য। নেপোলিয়নকে মেরে ফেললেও কিছু দোষের হবে না। কারণ নেপোলিয়ন ইতিমধ্যে ফরাসী দেশে আউট ল' বা আইন বহির্ভূত লোক বলে ঘোষিত হয়েছেন। অতএব তাঁর প্রতি দয়া, মায়া, বিবেচনা—কিচ্ছু না।

নেপোলিয়ন একটা ছোট, হাল্‌কা গাড়ি করে সেনাবাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। নেপোলিয়নের নির্দেশে তাঁর একজন সামরিক কর্মচারী ওদের সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি আমাদের ওপর গোলাবর্ষণ করবেন···?"

ওদিকের সেনাপতি ডেলসার্ট গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, "আমি আমার কর্তব্য পালন করব··· ।"

নেপোলিয়ন তাঁর গাড়ি থেকে নেমে এলেন। এই মুহূর্তে তিনি কোন সংঘর্ষ চান না। বৃথা রক্তপাতে তাঁর কোন মোহ নেই। তিনি তাঁর বাহিনীকে "মার্সাই" বা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে বললেন। তিন রং-এর জাতীয় পতাকা মেলে ধরে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সামনে অপেক্ষমান শত্রুবাহিনীর দিকে। সকলে নিশ্বাস রোধ করে দাঁড়িয়ে রইল। কী করছেন নেপোলিয়ন! ওরা যে এখনিই গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেবে লোকটিকে। শত্রুসৈন্যের একজন চেঁচিয়ে উঠল, "গুলি, গুলি কর। ঐ তো নেপোলিয়ন··· ।"

নেপোলিয়ন আরও, আরও এগিয়ে গেলেন। প্রতিপক্ষ পরিষ্কার দেখতে পেল সেই অতি পরিচিত মানুষটি। সেই ধূসর বর্ণের সামরিক পোশাক পরা ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। নেপোলিয়ন আরও দু পা এগিয়ে গেলেন। তারপরেই কোটের বোতাম খুলে দু পাশে সরিয়ে দিয়ে সাদা ওয়েস্ট কোট পরা বুকখানাকে মেলে ধরলেন, ধীরে অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ সম্রাটকে হত্যা করতে চাও তা হলে হত্যা কর, আমি এখানে··· ।"

কী ছিল ঐ কথায় আর ঐ মানুষটির সর্ব অবয়বে! কী ছিল

মার্সাই সঙ্গীতে। সামনের রাজকীয় সেনাবাহিনী কলরব করে উঠল। হিংসার উল্লাসে নয়, ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে। তাদের প্রিয় সম্রাট নেপোলিয়নকে তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। সম্রাট দু হাত বাড়িয়ে তাদের আহ্বান জানাচ্ছেন, আর তারা থাকতে পারে! রাজ-পক্ষের সৈন্য দল, যারা কিনা এসেছিল তাদের "কর্তব্য পালন" করতে, তারাই এবার সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন।" একমুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র রূপান্তরিত হল উৎসবক্ষেত্রে, মিলনক্ষেত্রে। আর এর পর থেকেই শুরু হল দলে দলে রাজকীয় সেনাবাহিনীর এগিয়ে আসা আর নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেদের লুটিয়ে দেওয়া। ঐতিহাসিক লুডউইগ এই দৃশ্যে নেপোলিয়নকে যথার্থ তুলনা করেছেন হ্যামেলিনের সেই বাঁশীওয়ালার সঙ্গে।

ভালোবাসার আনুগত্যে নেপোলিয়নের বুক আবেগে ভারি হয়ে উঠল। দু চোখ ঝাপসা হয়ে এল। রাজ্য, রাজধানী, সিংহাসন যত দূরেই থাক, মানুষগুলি যে এত কাছের, এত অন্তরঙ্গ কই আগে তো এতটা বোঝেননি! নেপোলিয়ন যতই এগিয়ে যেতে থাকলেন ততই তাঁর স্বেচ্ছাসৈন্যের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ইতিহাসের পাতায় এমন ঘটনা বড় একটা ঘটে না।

অষ্টাদশ লুইয়ের ভাই আর্তোয়া লিয়োঁতে সব সৈন্য সামন্ত নিয়ে কামান সাজিয়ে নেপোলিয়নকে বাধা দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন! কিন্তু সব কিছু ঠিক ঠিক করবার মতো সময় পেলে তো! নেপোলিয়ন কি বাতাসে ভর করে আসছেন! নইলে এ কদিনের মধ্যে গ্রেনোব্‌ল্‌ এর মতো অমন সুরক্ষিত নগর কেমন করে নিয়ে নিল লোকটা। লোকটা কি আর নিল? আর্তোয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভাবেন, লোকটার হাতে তো তুলে দেওয়া হল। কী মন্ত্র পড়ছে লোকটা যে অমন জাঁদরেল জাঁদরেল সেনাপতি-সেনাবাহিনী একেবারে ভেড়া বনে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছে! আর্তোয়া সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ডকে নির্দেশ দিলেন, তাঁর অধীনে যে তিন ডিভিশন ন্যাশনাল গার্ড আছে তাদের বলে কয়ে একটু চাঙ্গা করে নিতে পারেন

কিনা, তাদের একটু বোঝাতে পারেন কিনা, অষ্টাদশ লুই-ই হলেন ফ্রান্সের ঠিক বৈধ রাজা, আর নেপোলিয়ন নামে লোকটা হল সিংহাসন দখলকারী লুঠেরা ডাকাত··· !

ম্যাকডোনাল্ড মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে সৈন্যদের প্যারেড দেখলেন। তারপর গলা ছেড়ে তাদের সামনে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়লেন। বক্তব্য ঐ একটাই—"বুরবোঁ রাজবংশের ওপর যেন তোমাদের অটুট আনুগত্য থাকে। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তোমরা সব রুখে দাঁড়াবে"···ম্যাকডোনাল্ড এরপর উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, "বল সব, বুরবোঁ রাজা দীর্ঘজীবী হোন···বল।"

আশ্চর্য, সৈন্যদের মুখে এতটুকু রা নেই! সব কি বোবা হয়ে গেছে!

ম্যাকডোনাল্ড আবার চিৎকার করে বললেন, "বুরবোঁ রাজা দীর্ঘজীবী হোন···সবাই বল।" সৈন্যরা যেমন ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি রইল।

এবার আর্তোয়া এগিয়ে গেলেন। একজন অশ্বারোহীকে ডেকে তার দলের অন্যান্য অশ্বারোহীদের রাজাকে সম্মান জানানোর নির্দেশ দিতে বললেন। অশ্বারোহীটি তাল ঠুকে বলল, "রাজা দীর্ঘজীবী হোন।" সেই এক দৃশ্য। কেউ কিছু বলল না। সেই চুপ করে থাকার পালা এখনও চলল।

আর্তোয়ার বুঝতে আর কিছু বাকী রইল না। তিনি সেখানে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে সোজা গিয়ে উঠলেন নিজের ছোট গাড়িটিতে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল। গাড়িটা টগ্‌বগ্‌ করতে করতে ছুটে চলল প্যারিসের দিকে।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সেই অতি পরিচিত ধূসর বর্ণের ইউনিফর্ম পরা লোকটি লিয়োঁ নগরে প্রবেশ করলেন। সকলের প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থিত হলেন। নেপোলিয়নকে রুখবার জন্য বন্দুক বা কামান থেকে একটাও গুলি বা গোলা বেরোল না। বরং নেপোলিয়নকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা জানাবার জন্য লোকের মুখে গান রচনা হল—

Roule ta boule
Roi cotillon
Rends La couronne a Napoleon

যার ভাবার্থ— রাজা চলে যাক,
আস্থন নেপোলিয়ন,
চলো তাঁর কাছে।

এমনি আগমনী গান তৈরী হয়েছিল তিন হাজারের ওপর।

নেপোলিয়ন এবার পৌঁছলেন বার্গাণ্ডিতে। সেখানে গিয়েই যাঁর কথা মনেপড়ল, যাঁকে এই সময় অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে হল, তিনি হলেন সেনাপতি নে। ইতিমধ্যে সেনাপতি নে কিন্তু বুরবোঁ দলে যোগ দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও নেপোলিয়ন সেনাপতি নে-কে তাঁর আগমন বার্তা জানালেন। আর আশ্চর্য, সেনাপতি নে তৎক্ষণাৎ চলে এলেন নেপোলিয়নের কাছে। এ কি নিছকই ভাবালুতা! তা অবশ্য নয়। একটা জিনিস নে ঠিকই বুঝেছিলেন যে, বুরবোঁ রাজবংশ আসবার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতদের যে প্রাধান্য ঘটেছে, তাতে নে, যতবড় সেনাপতিই হোন না কেন, সমাজে সম্মান পাবেন না, যোগ্য মর্যাদা পাবেন না, বিশেষ করে যে মর্যাদা তিনি নেপোলিয়নের কাছে পেয়েছেন।

১৬ই মার্চ, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ। অষ্টাদশ লুই অনেক মুখস্থ করে, অনেকবার রিহার্সাল দিয়ে এসেম্বলি সভায় তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। বক্তৃতার মূল বক্তব্য ছিল, নেপোলিয়ন নামে এক জুজু আসছে গৃহবিবাদ লাগাতে। তাকে তাড়াতে হবে, যেমন করেই হোক ··। উপস্থিত সকলে রাজার প্রতি যথারীতি অটুট আনুগত্যের শপথ নিলেন।

অষ্টাদশ লুই অবশ্য দু'দিন পরেই পালালেন। ও সব ছেঁদো আনুগত্য-ফানুগত্যে তিনি বিশ্বাস করেন না। নইলে অমন যে সেনাপতি নে, যার ওপর কিনা অত নির্ভরতা, সে-ও চলে গেল ঐ লোকটার দিকে! এর পরেও যে রাজপ্রাসাদে, রাজসিংহাসনে বসে থাকে সে অতি বড়ো নির্বোধ।

১৯শে মার্চ। রাত্রিবেলা। কাউকে না জানিয়ে, এমনকি মন্ত্রীদেরও কিছু না খবর দিয়ে, না বলে, অষ্টাদশ লুই টুক করে খসে পড়লেন ট্যুইলারীর প্রাসাদ থেকে। গাড়ি গড়গড়িয়ে চলল সোজা বেলজিয়াম। পথে আবার একটা স্যুটকেস খোয়া গেল। সম্রাট অষ্টাদশ লুই প্রায় কেঁদে ফেললেন, "ঐ স্যুটকেসের মধ্যে আমার শোবার ঘরের ব্যবহার করা চটিজুতো আছে, এখন কি হবে! ওরা যে আমার পায়ের ছাপ পেয়ে যাবে ··!"

সত্যিই ভয়ের কথা। পায়ের ছাপ পেয়ে গেলে সেই পায়ের মালিককে ধরতে কতক্ষণ!

নেপোলিয়ন ছুটে আসছেন বার্গাণ্ডি থেকে। ২০শে মার্চ তাঁকে প্যারিসে পৌঁছতেই হবে। সেদিন যে বড়ো শুভদিন। সেদিন "কিঙ্ অব রোম"-এর জন্মদিন। তাই-ই হল। 'অসম্ভব' বলে যখন কোন কথা নেই, তখন ২০শে মার্চ প্যারিসে পৌঁছতেও কোনো অসুবিধে হল না। তখন রাত ন'টা। ট্যুইলারী প্রাসাদের সামনে নেপোলিয়নের গাড়িখানা থামতেই চারদিক থেকে সোল্লাস অভিনন্দনে তিনি অভিভূত হলেন। এক বিরাট জনতা গাড়ি ছেঁকে ধরল, তারা তাদের প্রিয় নেতাকে একবার স্পর্শ করবে···।

নেপোলিয়ন গাড়ি থেকে নামলেন। দশমাস পরে নেপোলিয়ন আবার পা রাখলেন ট্যুইলারী প্রাসাদের সিঁড়িতে। অষ্টাদশ লুই পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগত কর্মচারীরাও প্রাসাদ ত্যাগ করেছিল। সুতরাং নেপোলিয়নকে কারও পক্ষে বাধা দেবার কোন প্রশ্নই ছিল না।

প্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে যখন নেপোলিয়ন ওপরে উঠছিলেন, তখন তিনি দুচোখ বুজে ছিলেন, হাত দুটি সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ধীর অচঞ্চল। সব মিলিয়ে তাঁর মুখে শুধু একটি ভাবই ফুটে উঠেছিল···এই দেখ, আমি ফিরে এসেছি। আমাকে তোমরা গ্রহণ কর···।

নেপোলিয়ন, সেই অতি পরিচিত নেপোলিয়ন তাঁর প্রিয় আবাস-

ভূমিতে ফিরে এলেন এবং এসেই শাসন-সংস্কারে মন দিলেন। কারণ অষ্টাদশ লুই ফরাসী দেশকে যে ভাবে পেয়েছিলেন, সেই ভাবে তাকে রক্ষা করতে পারেননি, বরং তাকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ কয়েক বছর আগেকার ইতিহাসে। সুতরাং নেপোলিয়ন আবার কাজ শুরু করে দিলেন। আবার শাসন সংস্কারে মন দিলেন। দুই-কক্ষ বিশিষ্ট আইন-সভা হল, তাতে নির্বাচিত সদস্যদের থাকবার ব্যবস্থা হল, জুরীর সাহায্যে বিচার করার নীতি প্রবর্তিত হল, আর অধিকার দেওয়া হল বাক-স্বাধীনতার। ওদিকে কাউন্সিল অব স্টেট তো রইলই।

নেপোলিয়নের একদিকে এই কর্মযজ্ঞ, অন্যদিকে তিনি দূত পাঠালেন মেটারনিকের কাছে। শান্তি চাই, বন্ধুত্ব চাই। আর যুদ্ধ নয়, রক্তপাত নয়। নেপোলিয়ন নিজের হাতে চিঠিখানা লিখে খামের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পত্রবাহক গেল। ফিরে এল। চিঠিখানা যে মুখবন্ধ অবস্থায় গিয়েছিল, সেই অবস্থাতেই ফিরে এল। মেটারনিক কোনো কথা তো বলেনইনি, চিঠিখানা নিতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন। নেপোলিয়ন ভালো করেই বুঝতে পারলেন তিনি যে সিংহাসন ফিরিয়ে নিয়েছেন, সেটি দাঁড়িয়ে আছে বারুদের স্তূপের ওপর। এখন শুধু একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে দেবার অপেক্ষা।

ঠিক আছে, নেপোলিয়ন যে-কোন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।

নেপোলিয়ন এবার সানুনয় অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন অস্ট্রিয়া-রাজ ফ্রান্সিসকে। শ্বশুরমশাইকে। তিনি যেন অতি অবশ্য মেয়ে মারি লুইজা ও নাতি বাচ্চা নেপোলিয়নকে প্যারিসে পাঠিয়ে দেন। নেপোলিয়ন কত দিন স্ত্রী আর ছেলেকে দেখেননি! নেপোলিয়ন চিরকালের সঙ্গী কলিনকোর্টকে পাঠালেন অস্ট্রিয়ার দরবারে। রাজা ফ্রান্সিস কি তাঁর মেয়ে আর নাতির স্বার্থ দেখবেন না! ফরাসী সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারী তো তাঁর নাতিই, আর মেয়েই তো রাজপ্রতিনিধি!

নেপোলিয়ন মারি লুইজাকে চিঠি লিখলেন, "আমার মিষ্টি মারি, তুমি আমার ছেলেকে নিয়ে চলে এস। তোমার ঘর সাজিয়ে রেখেছি। তোমাদের না দেখে আমার যে সব শূন্য মনে হচ্ছে…।"

এই মর্মে চিঠি আরও গেল। কিন্তু নেপোলিয়ন কোন উত্তর পেলেন না। পাওয়ার কথা নয়। কারণ পথেই চিঠিগুলি হস্তান্তরিত হয়ে অন্য ঠিকানায় চলে যাচ্ছিল। এর কিছুদিন পরেই খবর এল মারি লুইজার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই প্যারিসে নেপোলিয়নের কাছে ফিরে আসার। মারি লুইজা আর ফিরবেন না, খুবই স্বাভাবিক। কারণ মারি লুইজা তখন কাউন্ট নীপার্গের শয্যাসঙ্গিনী। উপরন্তু মেটারনিকের নির্দেশে তাঁর ছেলেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ভিয়েনায়। মেটারনিকের বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ। তীক্ষ্ণ না হলে তিনি কী করে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন, আবার মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে! এবং চিরকালের জন্য…।

নেপোলিয়নের বুক চিরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। এল্‌বা থেকে দারুণ বিপদ মাথায় নিয়ে সমুদ্রে জাহাজ ভাসানো, তারপর ইউরোপের মাটিতে পা দিয়ে ঝড়ের গতিতে এতদূর এগিয়ে আসার পেছনে তো স্ত্রী-পুত্রকে আবার দেখতে পাওয়ার আশাই মস্ত অনুপ্রেরণার কাজ করছিল! এত বড় বিশ্বে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হল।

তবে নেপোলিয়ন মনের সব কিছু অনুভূতি পেছনে ঠেলে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। খবর এসেছে রাইন সীমান্তে নাকি ইংল্যাণ্ড ও প্রাশিয়া সৈন্য সাজাচ্ছে। অস্ট্রিয়া আর রাশিয়া সাজব-সাজব করছে। নেপোলিয়ন নিজের মনেই একবার হাসলেন। আশ্চর্য, তিনি যুদ্ধ চান না। তিনি শান্তি চান, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সৌহার্দ্য চান। অতীতে চেয়েছেন, এখনও চান, ভবিষ্যতেও চাইবেন। অথচ এমনই ভাগ্যের পরিস্থিতি যে তাঁকে শুধু যুদ্ধই করতে হচ্ছে। কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। আর ইতিহাসে তিনি রূপায়িত হচ্ছেন রক্ত-পিপাসু, 'যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী নেপোলিয়ন', 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেপোলিয়ন' এই নামে।

১২ই জুন নেপোলিয়ন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যুদ্ধের ডাক এসেছে। আর্থার ওয়েলেসলি—ডিউক অব ওয়েলিংটন এবং ব্লুকার একসঙ্গে নেপোলিয়নকে সম্মুখসমরে আহ্বান জানিয়েছেন। সুতরাং নেপোলিয়ন আর দেরী করলেন না। একলক্ষ পঁচিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু সেনার ওপর। লিগ্‌নীর যুদ্ধে নেপোলিয়ন প্রুশীয়দের সাংঘাতিকভাবে হারিয়ে দিলেন। এই যুদ্ধে ব্লুকার নেপোলিয়নের হাতে বন্দী হতে হতে বেঁচে গেলেন।

অন্যদিকে নেপোলিয়ন সেনাপতি নে-কে বলেছিলেন কাত্র্ ব্রা-এ গিয়ে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে একেবারে আটকে ফেলতে, যাতে তারা কিছুতেই প্রুশীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে না মিলতে পারে। সেনাপতি নে এই ব্যাপারে এগিয়ে যেতে প্রথমটায় একটু ইতস্ততঃ করলেন, একটু ভয় পেলেন। শেষ পর্যন্ত নে ওখানে যখন গেলেন, তখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে এবং যা ক্ষতি হবার হয়েছে। ততক্ষণে ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটন এসে গেছেন। সেনাপতি নে তাঁর দেরীর জন্য নেপোলিয়নের নির্দেশ অনুযায়ী ইংরেজ সেনাবাহিনীকে আটকাতে পারলেন না। এই একটু দেরী, এই ভুল, নেপোলিয়নের জীবনে মারাত্মক পরিণতি টেনে নিয়ে এল।

লিগ্‌নীর যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন সমস্ত ছাউনি পরিদর্শন করলেন। চারদিকে প্রচুর আহত প্রুশীয় সৈন্য। নেপোলিয়ন নির্দেশ দিলেন আহত প্রুশীয়দের চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়। সৈন্য যখন আহত, তখন শত্রু-মিত্র কোনো ভেদাভেদ নেই। বেশ খানিকটা সময় এতে গেল।

শত্রু-মিত্র কোন বিচার না করে আহতদের সম্পর্কে এই সতর্কতা এই যত্নবোধ পরম মহত্ত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। কিন্তু গুরুতর ও বৃহত্তর যুদ্ধ যেখানে আসন্ন সেখানে এতখানি সময় দেওয়া মানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করা। নেপোলিয়নের পরবর্তী কাজে এগিয়ে যেতে বেশ খানিকটা দেরী হয়ে গেল।

নেপোলিয়ন সেনাপতি গ্রাউচির ওপর ভার দিয়েছিলেন লিগ্‌নী থেকে পালিয়ে যাওয়া প্রুশীয়দের পিছনে ধাওয়া করে যেতে। একদিকে এই, অন্যদিকে যদি সেনাপতি নে কাত্র্‌ ব্রা দখল করতে পারতেন, তা হলে ওয়াটর্লুর যুদ্ধ বলে কোন যুদ্ধ হত কিনা সন্দেহ আছে।

কাত্র্‌-এর ব্যর্থতায় নেপোলিয়ন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। কি আর করা যাবে। তিনি এর পর সেনাপতি নে-কে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন ব্রুসেল্‌স্‌-এর দিকে যেখানে বিপুল ইংরেজ সেনাবাহিনী জড়ো হয়েছে। পথের মধ্যে মাঝে মাঝেই আগুনে রকেট ছুঁড়ে নেপোলিয়নের বাহিনীকে ঘায়েল করার চেষ্টা হল। ঘায়েল যে একেবারে হল না, তা নয়।

অবশেষে নেপোলিয়ন উপস্থিত হলেন বেলজিয়মের মধ্যে ওয়াটর্লু বলে একটা গ্রামে। চোখে পড়ল মন্ট সেন্ট জঁা বলে একটা উঁচু জায়গা। সেখানে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছেন স্বয়ং ওয়েলিংটন।

নেপোলিয়ন আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেন। লা বেল এলায়েন্স নামে একটি জায়গায় গিয়ে থামলেন, ছাউনি গাড়লেন। পথে আসতেই শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। নেপোলিয়নের জীবনে, তার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, প্রকৃতির সেই রুদ্র রোষ—এটা নেপোলিয়নের যুদ্ধজীবনে কিছু নতুন নয়।

নেপোলিয়ন চিন্তায় পড়লেন। মাটি শুকনো না হলে নেপোলিয়ন কামান সাজাবেন কী করে! কামান ব্যবহার করবেন কী করে! নেপোলিয়ন প্রথমে বৃষ্টির জলে ভেজা সপ্‌সপে জামা-কাপড় ছেড়ে দিলেন শুকোবার জন্য। এর পর ভিজে কাদার ওপর বিছিয়ে দিলেন খড়। সমস্ত রাত ধরে বার বার ঘর থেকে বেরিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর যুদ্ধ-ছাউনি, তাঁর সেনাবাহিনী।

তার পরদিন। ১৮ই জুন, ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ। ভোর ছ'টার সময় অন্যান্য সেনাপতিদের নিয়ে একসঙ্গে নেপোলিয়ন চা খেলেন। সঙ্গে

ভাই জেরোম ছিলেন। জেরোম বললেন তিনি নাকি শুনেছেন প্রুশীয় সৈন্য ওয়েভার থেকে জোর কদমে এগিয়ে আসছে ওয়েলিংটনের সঙ্গে মিলবে বলে।

"অসম্ভব কথা কেন বলছ!" নেপোলিয়ন উত্তেজিত হলেন। "যারা লিগ্‌নীর যুদ্ধে অমন মার খেয়ে পেছন ফিরে ছুট লাগিয়েছে, তারা আবার এগিয়ে আসবে, ইংরেজদের সঙ্গে মিলবে…! তুমিও যেমন, জিতব আমরাই দেখে নিও। দেখছ না, বৃষ্টি ধরে গেছে, মাটি এবার শুকিয়ে উঠবে…!" আত্মবিশ্বাসে ভরপুর নেপোলিয়ন তখন অন্য কোন দিকে তাকাবার আর অবসর পাচ্ছেন না। একেই বোধহয় নিয়তির খেলা বলে, বলে দুর্ভাগ্য।

চা খাওয়ার পর নেপোলিয়ন ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সৈন্য-সেনাপতিরা কী ভাবে কোথায় নিজেদের সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখছেন, তাই দেখতে বেরোলেন। বেলা দশটার সময় ফিরে এলেন। জেরোমকে বললেন, "একটু ঘুমোতে যাচ্ছি। এক ঘণ্টা ঘুমোবো। এগারোটার সময় যদি না উঠি, আমাকে জাগিয়ে দিয়ো।" নেপোলিয়ন শুতে গেলেন। বেলা এগারোটার সময় ঘুম থেকে উঠলেন। বিশ্রাম করে একটু ঘুমিয়ে শরীরটা বেশ তাজা, ঝরঝরে লাগছে…। এবার যুদ্ধ।

এ কোন্ নেপোলিয়ন? যিনি কি না এক নাগাড়ে ষোল-আঠারো ঘণ্টা কাজ করেও কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লান্ত হননি! বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি, তিনি কোথায় এসে কী করলেন! ভিজে মাটিতে খড় বিছোলেন, নিজে ঘুমিয়ে নিলেন! যখন কিনা এক মিনিটও সময় নষ্ট করার কথা ছিল না! চরম সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে এ ধরনের শৈথিল্য কী করে নেপোলিয়নকে বশীভূত করল, জানি না, তবে নেপোলিয়নের জীবনে এই ভুল চরম ভুল। ইতিহাস নেপোলিয়নের এই ভুলকে কখনই ক্ষমা করেনি। নেপোলিয়নের আরেকটি দুর্ভাগ্য, তাঁর সব চাইতে আস্থাভাজন ও অভিজ্ঞ সেনাপতি বার্থিয়ার এ যুদ্ধে ছিলেন না। এলবা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বার্থিয়ার

নেপোলিয়নের দলে যোগ দেননি। ওদিকে ভাই জেরোমও খুব বুদ্ধির সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা করতে পারেননি।

বেলা এগারোটার সময় নেপোলিয়ন তৈরী হলেন। মাটি অনেকটাই শুকিয়ে উঠেছে। তবু পায়ের তলায় খড় বিছানো আছে, পাছে পা পিছলে যায়। এখান থেকেই তিনি যুদ্ধ চালনার যা কিছু নির্দেশ দেবেন।

নেপোলিয়নের হাতে আছে বাহাত্তর হাজার সৈন্য আর দু'শ ছেচল্লিশটি কামান। ওয়েলিংটনের অধীনে আটষট্টি হাজার সৈন্য আর একশ ছাপ্পান্নটি কামান। নেপোলিয়ন স্থির করলেন আগে শত্রুপক্ষের বাঁ দিক আক্রমণ করবেন, তারপর ঠেলে বেরিয়ে যাবেন। এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট হলে নেপোলিয়ন কামান দাগতে আদেশ দিলেন। ভাই জেরোমের ওপর আদেশ হল সে যেন অতি অবশ্য শত্রুবাহিনীর ডানপাশ আক্রমণ করে যাতে বাঁদিকে ওয়েলিংটনের শক্তির চাপটা একটু কম হয়। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রথমটায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে গোলাগুলি চলল। এবার নেপোলিয়ন অপরপক্ষকে পুরোপুরি আক্রমণ করবার জন্য তৈরী হলেন। তিনি একশ ষাট গজ অন্তর চার ডিভিশন পদাতিক সেনাবাহিনী সাজালেন। সামনে সার দিয়ে কামান রাখলেন। নেপোলিয়ন খুশি হলেন—প্রথম চোটে কামান থেকে যা গোলা ছুঁড়েছেন, তাতেই তো এতক্ষণে ওয়েলিংটন চোখে অন্ধকার দেখছেন আর হতাহতের সংখ্যা গুণছেন। এইবার আরও কিছু খেলা দেখাবেন নেপোলিয়ন। এ আর কী হয়েছে!

বড় বেশী আত্মবিশ্বাস মাঝে মাঝে কত মারাত্মক হয়ে ওঠে, এক্ষেত্রে সেটা আশ্চর্য ভাবে দেখা গেল। নেপোলিয়ন একবারও লক্ষ্য করলেন না, বুঝলেন না, শত্রু-সেনাপতি ওয়েলিংটন কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান লোক। ওয়েলিংটন যে ইতিমধ্যেই নেপোলিয়নের শক্তিতে ক্ষয় ধরিয়েছেন, সেটা নেপোলিয়ন ধরতেই পারেন নি। আগের কয়েকটি যুদ্ধে ওয়েলিংটন লক্ষ্য করেছিলেন যে অতি-কৌশলী যোদ্ধা নেপোলিয়ন প্রথমেই কামান দেগে শত্রুপক্ষকে সামনের দিক

থেকে বেশ খানিকটা হঠিয়ে দেন, তারপর তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেটা লক্ষ্য করেই এবার প্রথম থেকেই ওয়েলিংটন সতর্ক হয়েছিলেন। সৈন্য সাজাবার জায়গাটি বেছেছিলেন বড় সুন্দর—উঁচু পাহাড়ে একটা সমতল জায়গা। পেছনে পাহাড়ের ঢালু জমি। সেই ঢালু জমিতে তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা সাজিয়েছিলেন। ফলে কামান থেকে বার বার আগুন নিক্ষেপ করে নেপোলিয়ন শত্রুপক্ষের যতটা ক্ষতি করবেন বলে ভেবেছিলেন, ততটা করতে পারেন নি। অথচ নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী যখন ওয়েলিংটনের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এল, দেখা গেল ওয়েলিংটনের সৈন্য উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বন্দুকের নিখুঁত নিশানায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করছে।

মাথার ওপর থেকে আক্রমণের ফলে ফরাসী সেনাবাহিনী কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্দান্ত অশ্বারোহী সৈন্যের দল। তারা তো এতক্ষণ দিব্যি বহাল তবিয়তে ওপরে পাহাড়ের ঢালু জমিতে ছিল। বারোশ' অশ্বারোহী সৈন্য তাড়িয়ে নিয়ে চলল ফরাসী যোদ্ধাদের। এই অবস্থা দেখে নেপোলিয়ন সঙ্গে সঙ্গে দু' ডিভিশন সৈন্য ওদের সাহায্যে পাঠালেন, নইলে ঐ মুহূর্তেই নেপোলিয়নকে শিবির গুটিয়ে ফেলতে হত। তবে নেপোলিয়নের ক্ষয়ক্ষতি হল যথেষ্ট। ঐ সময়টুকুর মধ্যেই পাঁচ হাজার ফরাসী সৈন্য হয় বন্দী হল, না হয় মারা গেল। নেপোলিয়নের পক্ষে এটা শুভ সূচনা নয়।

বেলা দেড়টার সময় নেপোলিয়ন অবাক হয়ে দেখলেন ওপক্ষের ছাউনিতে কারা যেন দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে এবং তারা এদিকের ডানদিক লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পরেই নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন ওরা প্রুশীয় সেনাবাহিনী, ব্লুকারের দল। লিগ্‌নীর অমন যুদ্ধে ব্লুকারের দল শেষ তো হয়ইনি, উপরন্তু ওরা যাতে ওয়েলিংটনের দলের সঙ্গে কিছুতেই না মিলতে পারে, তার জন্যে অত কাণ্ড করে লিগ্‌নীর যুদ্ধে জয়লাভ কোন কাজেই এল না। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন, হিসেবে কোথায় যেন কি একটু ভুল হয়ে গেছে। তাই এবার সব কাজে শুধু গরমিল হওয়ার পালা।

যুদ্ধ ভয়াবহ চেহারা নিল। নেপোলিয়ন প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। তবে অবস্থা ভাল ঠেকল না। যে কটি ঘোড়াতে চেপে তিনি যুদ্ধ করছিলেন, পর পর সব কটি ঘোড়া মারা পড়ল। নেপোলিয়ন তাঁর রিজার্ভ ফোর্স থেকে দশ হাজার সৈন্যের একটি দল পাঠালেন লড়াই করতে। সেনাপতি নে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় লা হে সেন্টি নামে একট গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করতে সক্ষম হলেন। অবস্থার একটু যেন উন্নতি হয়েছে বলে মনে হল।

এবার নেপোলিয়ন ওয়েলিংটনের বিরুদ্ধে শক্তির চাপ পুরোমাত্রায় বাড়ালেন। কিছুতেই যেন ব্লুকারের আর কোন নতুন বাহিনী ওয়েলিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। কিছুতেই না। নেপোলিয়ন এবার তাঁর ইনভিনসিব্‌ল্ গার্ড বা অজেয় ইম্পিরিয়াল গার্ডকে যুদ্ধে নামালেন। একসঙ্গে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য। তাদের ষাটজন করে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে এবার মন্ট সেন্ট জাঁ-তে আরোহণ করবার নির্দেশ দিলেন। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে নেপোলিয়নের বড় গর্বের অজেয় বাহিনী পাহাড়ের গা বেয়ে উঁচুতে উঠতে লাগল। ওপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এল গুলি। এর ফল সহজেই অনুমেয়। অজেয় বাহিনীর প্রচুর সৈনিক প্রাণহীন দেহ নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল নিচে।

ইতিমধ্যে ওয়েলিংটন ফরাসী আক্রমণে অস্থির হয়ে বার বার খবর পাঠাচ্ছিলেন ব্লুকারকে··· "শিগগীর করে সেনা বাহিনী পাঠিয়ে দিন, নেপোলিয়নের অজেয় বাহিনীর এক একজন সৈনিক দশ দশটা বাঘের মতো লড়াই করছে···শিগগীর··· ।"

এবার নেপোলিয়নের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এল। দেখা গেল ব্লুকার-চালিত একটি তাজা প্রুশীয় বাহিনী এসে যোগ দিয়েছে ওয়েলিংটনের সঙ্গে। তারা এসেই সাংঘাতিক ভাবে আক্রমণ চালালো ফরাসী বাহিনীর ডান দিকে।

আর পারা গেল না। সাধ্যেরও তো একটা সীমা আছে! রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যে

সব ফরাসী সৈন্য তখন নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে পিছু হটে যাচ্ছিল, নেপোলিয়ন ক্লিষ্ট কণ্ঠে তাদের একবার শেষ আহ্বান জানালেন, "হতাশ হয়ো না, সুসংবদ্ধ ভাবে চল, আবার আমরা প্রস্তুত হব···।" নেপোলিয়নের কানে ভেসে এল—ইংল্যাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত···"God save the king···" ঈশ্বর রাজাকে দীর্ঘজীবী করুন—শুনলেন, প্রুশীয় সেনানী গাইছে "Herr Gott, Dich loven wir···?—হে ঈশ্বর, তোমার বন্দনা করি···

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ শেষ হল। শেষ হল নেপোলিয়নের কর্মবহুল, বহু যুদ্ধ-খ্যাত জীবনের একটি বিরাট অধ্যায়। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন তাঁর এই জীবনের সকল কাজের এখন সারা, এবার জীবনের শেষ অঙ্ক শুরু হবে অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে।

নেপোলিয়ন ফিরে এলেন প্যারিসে। ফেরার পথে মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে ভেবেছেন আবার কী কিছু একটা করা যায় না! না, আর কিছুই করবার ছিল না। ২১শে জুন সকালবেলা নেপোলিয়ন তাঁর বড় সাধের রাজধানী প্যারিসে ফিরে এলেন। আগের রাত কেটেছে নিদ্রাহীন, বড় যন্ত্রণায়। যন্ত্রণা শুধু মনের নয়। তীব্র যন্ত্রণা হয়েছিল পাকস্থলীতে। মনে হচ্ছিল এই বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। সুখ-দুঃখের সঙ্গী কলিনকোর্টের মনে হল নেপোলিয়নের গায়ের রং কেমন যেন ফ্যাকাসে, হলদেটে হয়ে গেছে।

যুদ্ধ-মন্ত্রী এসে খবর দিলেন এসেম্বলি সভা ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তাকে এখনই ভেঙে দিতে হবে।

"সে কি! আমি তো এখনও মরিনি! আমি বেঁচে থাকতেই আমার এসেম্বলিকে ভেঙে দিতে হবে···!" নেপোলিয়ন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন।

শুধু কি এইটুকু! একজন প্রিভি-কাউন্সিলর এসে বললেন, "সিংহাসন ত্যাগ করুন, নইলে কোন উপায় নেই।"

সত্যিই উপায় ছিল না। কারণ নেপোলিয়ন যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন, শান্তি আসবে না, শত্রুপক্ষ শান্তি আসতে দেবে না। শত্রু-

সৈন্য প্যারিস অভিমুখে ছুটে আসছে। নেপোলিয়ন যতক্ষণ সিংহাসনে বসে থাকবেন, ততক্ষণ ইউরোপের সকলেই ফ্রান্সের শত্রু।

"সিংহাসন ত্যাগ না করলে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত হতে হবে···।"

নেপোলিয়নকে বলা হল এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয় তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে দেবেন, নইলে তিনি বিতাড়িত হবেন। সময় নেই, মাত্র এক ঘণ্টা···।

নেপোলিয়ন উত্তেজনায় একবার লাফিয়ে উঠলেন। তার পরমুহূর্তেই একেবারে শান্ত হয়ে ভাই লুসিয়েনকে ডেকে তাঁর সিদ্ধান্ত লিখে নিতে বললেন।

নেপোলিয়ন বললেন, লুসিয়েন লিখলেন,—আমার প্রিয় ফরাসীগণ, আমি যখন স্বদেশভূমির স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলাম, তখন আমি সকল শক্তিমান পুরুষের সমবেত চেষ্টা, ইচ্ছা এবং সাহায্যের ওপর নির্ভর করেছিলাম। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, তাই আমাকে আজ ফরাসীদেশের শত্রুবর্গের ঘৃণার কাছে আত্মাহুতি দিতে হচ্ছে। আমার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটেছে। আমি আমার ছেলে দ্বিতীয় নেপোলিয়নকে ফরাসী জনগণের সম্রাট বলে ঘোষণা করছি।"

তিনদিন পরে নেপোলিয়ন চলে গেলেন মালমেইসন প্রাসাদে। তখনও মনে আশা, এমন একটা কিছু ঘটবে যাতে জীবনের মোড় ঘুরে যাবে, নিদেন পক্ষে যদি নেপোলিয়ন একজন সেনানায়ক হয়েও দেশের মাটিতে থাকবার অনুমতি পান ··।

কিছুই হল না। অষ্টাদশ লুইকে ফিরিয়ে আনার সব রকম ব্যবস্থা করা হল। প্যারিসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন ডিউক অব ওয়েলিংটন স্বয়ং। অর্থাৎ বাচ্চা নেপোলিয়ন, বাপের বড় সাধের "কিঙ অব রোম" কোনদিনই আর দ্বিতীয় নেপোলিয়ন নামে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবেন না। যা হবার হয়ে গেছে···।

নেপোলিয়নের ভাগ্যে কী আছে! নেপোলিয়ন জানেন তাঁকে

আবার নির্বাসনে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়···! আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গেলে হয় না! এখনই যদি পালানো যায়! শত্রুরা প্যারিসে ঢুকেই তো সব কিছু গুঁড়িয়ে দেবে! পালাবার পথ কোথায়! ইংরেজরা তো ইংলিশ চ্যানেল আটকে রেখেছে। একমাত্র পথ বিস্কে উপসাগর।

মালমেইসনের দুঃখের দিনে মারি ওয়ালস্কা ছেলের হাত ধরে আবার এলেন। সকাতর অনুরোধ জানালেন, তিনি নেপোলিয়নের নির্বাসন জীবনের সঙ্গিনী হবেন···।

নেপোলিয়ন একবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন মারি ওয়ালস্কার দিকে। তিনি মারি ওয়ালস্কাকে কোনদিনই স্ত্রীর সম্মান দেননি, তবু কী অপূর্ব ভালোবাসা। নেপোলিয়নের জীবনে এই-ই কি কম ঐশ্বর্য! কিন্তু যা হবার নয়, তা আর কী করে হবে ··!

২৯শে জুন। নেপোলিয়ন এবার শেষ ঝুঁকি নিচ্ছেন। নেপোলিয়ন এবার প্যারিস থেকে, প্যারিসের মাটি থেকে শেষ বিদায় নিয়ে মালমেইসনের প্রাসাদ ত্যাগ করে যাচ্ছেন। নেপোলিয়ন গাড়িতে উঠে বিস্কে উপকূলের উদ্দেশে চললেন। একটানা চললেন। মাঝখানে খাবার জন্য কয়েক পাউণ্ড চেরীফল কিনে নিলেন। ৩রা জুলাই সকালবেলা নেপোলিয়ন রকফোর্ট পৌঁছলেন। আর রকফোর্টে পৌঁছেই অবাক হয়ে দেখলেন, সেখানেও পথ বন্ধ। পথ বন্ধ করে আছে তিনখানা ইংরেজ জাহাজ। একটা বেশ বড় যুদ্ধ জাহাজ, নাম 'বেলরোফোন।' "আশ্চর্য, যেখানে জল, সেখানেই ইংরেজ?" নেপোলিয়ন নিজের মনে বিড়বিড় করলেন।

কী করবেন এখন নেপোলিয়ন! কোনো মালবাহী জাহাজে করে পালিয়ে যাবেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে? কিন্তু আর কতদূর, কতদূর পালাবেন নেপোলিয়ন! নেপোলিয়নের দু চোখ জলে ভরে এল। একবার আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর চেয়ে দেখলেন সমুদ্রের ফেনিল জলরাশির দিকে। মনে হল আকাশ, সমুদ্র, চারদিকের প্রকৃতি—সব কিছু যেন নেপোলিয়নের সামনে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা

হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কোন আশা নেই, সুতরাং নেপোলিয়নের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, এবার সব কিছুর অবসান, সব কিছুতে ছেদ। তবু নেপোলিয়ন একখানা চিঠি লিখলেন ইংল্যাণ্ডের কাছে… নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডের আশ্রয়প্রার্থী। তিনি আশা করেন ইংল্যাণ্ড তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও আতিথেয়তা দানে বিরূপ হবে না…।"

চিঠিখানা গেল সামনে সমুদ্রে ভেসে থাকা ইংরেজ জাহাজ "বেল-রোফোন"-এর ক্যাপ্টেন মেইটল্যাণ্ডের হাতে। মেইটল্যাণ্ড মুখে বলে পাঠালেন, নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডে যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হবেন। ইংরেজরা বন্ধুবৎসল, মহৎ ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী…

নেপোলিয়ন স্থির মনে, ধীর পদে এগিয়ে গেলেন 'বেলরোফোন' জাহাজের দিকে। জাহাজের ক্যাপ্টেন মেইটল্যাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটল।

'বেলরোফোন' জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিল। নেপোলিয়ন বেশীর ভাগ সময় নিজের ঘরে থাকতেন। মাঝে মাঝে জাহাজের পেছন দিকে সর্বশেষ প্রান্তে উঁচু ডেকের ওপর উঠে দাঁড়াতেন, ভাবতেন ইংল্যাণ্ড থেকে কবে তাঁর চিঠির উত্তর আসবে। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে! লিখবে, ইংল্যাণ্ড তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেবে! কবে এমন চিঠি আসবে!

দশদিন সমুদ্রপথে চলবার পর 'বেলরোফোন' নোঙর করল ইংল্যাণ্ডের প্লিমাউথ বন্দরে। বন্দর শুদ্ধ লোক ভেঙে দেখতে এল। ইউরোপের সিংহ নাকি ঐ জাহাজে বন্দী হয়ে আছেন! তিন দিন কেটে গেল। চারদিনের দিন কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী নেপোলিয়নের কেবিনে প্রবেশ করে তাঁর টেবিলে একটা চিঠি রাখল। ইংল্যাণ্ডের রাজাকে লেখা নেপোলিয়নের সেই চিঠির উত্তর। রাজা নিজে লেখেননি। লিখেছে ইংরেজ সরকার। নেপোলিয়ন সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত ঐ চিঠিতেই আছে।

আশাবাদী নেপোলিয়ন বুকভরে নিশ্বাস নিয়ে চিঠিখানা খুললেন,

পড়লেন, তারপর নীরবে কাগজটি টেবিলের ওপর রাখলেন। ইংল্যাণ্ড ও তার মিত্রপক্ষের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবার নেপোলিয়নের নির্দিষ্ট আশ্রয়-স্থল সেণ্ট হেলেনা। ফ্রান্স থেকে পাঁচ হাজার মাইল, আর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে এগারোশ' চব্বিশ মাইল দূরে বিক্ষুব্ধ আটলান্টিকের বুকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ। স্বদেশভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সেণ্ট হেলেনা··· !

নেপোলিয়ন রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমি তো যুদ্ধবন্দী নই। আমি এই জাহাজে স্বেচ্ছায় এসেছি। কারণ আমি আপনাদের সৌজন্য ও আতিথেয়তায় বিশ্বাস করেছিলাম। আমি তো অনায়াসে আমার সৈন্যদের মাঝখানে ফিরে গিয়ে অনেক বছর নিজেকে গোপন করে রাখতে পারতাম। ক্যাপ্টেন কথা দিয়েছিলেন আমাকে নাকি ইংল্যাণ্ড সম্মানের সঙ্গে আশ্রয় দেবে! আজ আমি বঞ্চিত, প্রতারিত। ইংল্যাণ্ডের এই আচরণ তার জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করছে, অপমান করছে।"

একটু থেমে নেপোলিয়ন আবার বললেন, "আমি বাঁচবো না··· সেণ্ট হেলেনা আমাকে তিন মাসের মধ্যে মেরে ফেলবে··· ।"

নেপোলিয়ন বাঁচবেন, কি ক'মাসের মধ্যে মারা যাবেন, এই নিয়ে ইংল্যাণ্ড বা তার মিত্রপক্ষের কোন মাথাব্যথা ছিল না। তারা ফিরেও তাকায়নি নেপোলিয়নের মানসিক অনুভূতির দিকে। তাই একদিন যখন নেপোলিয়নের কাছ থেকে তাঁর যা কিছু ব্যক্তিগত টাকা পয়সা ও অন্য সব জিনিসপত্র নিয়ে নেওয়া হল, তখন কারও মনেও হল না, কতখানি ব্যথায়-ভরা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন 'সম্রাট নোপোলিয়ন' !

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হল। নেপোলিয়নকে 'বেলরোফোন' থেকে 'নর্দাম্বারল্যাণ্ড' নামে আরেকটি জাহাজে স্থানান্তরিত করা হল। নেপোলিয়নের সঙ্গে রইল তিনজন কর্মচারী, একজন ডাক্তার আর বারো জন ভৃত্য··· ।

অগাস্ট মাসের এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকালবেলায় 'নর্দাম্বারল্যাণ্ড' তুলে

উঠল। তারপর জল কেটে কেটে চলতে শুরু করল। ইউরোপের তীরভূমি দূরে দূরে সরে যেতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমুদ্রের জল গাঢ় হল। ইউরোপ মুছে গেল। প্যারিস, প্রিয় প্যারিস কোথায় পড়ে রইল। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন একবার ঊর্ধ্ব আকাশে তাকিয়ে দেখলেন। রাতের কুয়াশায় আকাশের তাঁরা ম্লান, অস্পষ্ট। চারদিকে শুধু ঘন অন্ধকার···।

বিদ্যুৎগতি অশ্বপৃষ্ঠে সদা-ধাববান জীবন এবার শুধু দিন যাপনের ক্লান্তিতে নিস্তেজ। ঈগল পাখীর বিস্তৃত পক্ষ এখন গুটিয়ে যাচ্ছে সাড়ে দশ মাইল লম্বা, সাড়ে ছ মাইল চওড়া সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে। একটা এব্ড়ো-খেবড়ো রুক্ষ পাথুরে দ্বীপ। কোন্ প্রাচীন অতীতে আগুন উদ্গীরণ করত, আগুন নিভে গিয়ে সেই আগ্নেয়গিরি এখন হয়েছে দ্বীপ। এক মৃত আগ্নেয়গিরিতে আশ্রয় নিয়েছেন আরেক মৃত অগ্নিগর্ভ মানুষ। বিশাল সমুদ্রে জাহাজে ভেসে যাওয়া-আসার পথে এটা ছিল ক্ষণিকের বিশ্রামস্থল। অবশ্য এখানে বিশ্রাম হলেও শ্রান্তি যেত না, বরং মন ভার হয়ে উঠত জমাটবাঁধা লাভার কালো কালো পাথর দেখে। দূর থেকে দ্বীপটাকে মনে হত ভূতুড়ে, বিশ্রী একটা গা-ছম্ছমে চেহারা। ক্রমে জাহাজ চলাচল যখন বাড়ল, দেশে-বিদেশে জিনিস-পত্রের আনাগোনা নিয়মিত হল, তখন সেণ্ট হেলেনাতেও কিছু কিছু চাষ-আবাদ হতে লাগল। গাছ বসানো হল। কিছু কিছু বাড়িঘর হল। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা হল পাঁচশ', আর তাদের সেবা করবার জন্য ক্রীতদাস হিসেবে রইল বারোশ নিগ্রো আর কিছু চীনা।

সেণ্ট হেলেনায় স্থায়িভাবে দূরে থাক, সেখানে একটানা কয়েক বছর বাস করাই দুরূহ ছিল। কারণ ওখানকার আবহাওয়ায় প্রবল জীবনীশক্তিকে মৃতপ্রায় করে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। ওখানে বাস করে পঞ্চাশের কোঠায় পা দেওয়াটা ছিল রীতিমতো চমকের ব্যাপার। ওখানকার হাওয়ায় আর মাটিতে ছিল অভিশাপ। তাই অধিবাসীদের

মধ্যে অধিকাংশের সঙ্গের সাথী ছিল রোগগ্রস্ত লিভার, উদরাময়, জ্বর, আর বুক ধড়ফড়ানি। সব মিলিয়ে সেণ্ট হেলেনা ছিল শয়তানের নরক। মাথায় শয়তানী বুদ্ধি না জাগলে কেউ কাউকে এই নির্বাসন দিতে পারে না। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে পা দিয়ে নেপোলিয়ন মন্তব্য করেছিলেন, "এখানে থাকতে হলে আমাকে আরও শক্তি, আরও সাহস ধরতে হবে···নইলে···"

প্রথম কয়েকদিন নেপোলিয়নকে একটা বেসরকারী বাড়িতে বাস করতে দেওয়া হল। তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল ইংরেজ সরকারের নির্দিষ্ট বাসস্থানে। বাড়িটার নাম "লঙ উড"। ষোলশ' ফুট উঁচু একেবারে রুক্ষ খোলা একটা মালভূমির ওপর বাড়িটা। আগে ছিল গোলাবাড়ি আর তার সঙ্গে লাগোয়া গোয়াল-ঘর, এখন হয়েছে নির্বাসিত সম্রাটের প্রাসাদ! পঞ্চাশ বছর আগের তৈরী বাড়িটা নড়বড়ে আর স্যাঁতস্যাঁতে।৷ "নর্দাম্বারল্যাণ্ড" জাহাজে যে ছুতোর মিস্ত্রীরা ছিল, তাদের বলা হল ঐ বাড়ির মেঝেতে তক্তা পেতে একটু ঠুকে দিতে। তারা তক্তা পেতে দিল ঠিকই, তবে তার তলায় অনেকদিন থেকে জমে ওঠা গোময় ও অন্যান্য নোংরা জঞ্জাল পরিষ্কার করার প্রয়োজন মনে করল না। সুতরাং নেপোলিয়ন ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা যখন ওখানে ঢুকলেন, পায়ের চাপে তক্তা বসে গেল এবং তার সঙ্গে অতীতের পুঞ্জীভূত রুদ্ধ পূতিগন্ধে চারদিক ভরে গেল। নেপোলিয়ন নাকি পরিষ্কার পরিবেশ পছন্দ করতেন! বিশেষ করে যে-কোন গন্ধ সম্বন্ধে নাকি তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ছিল অত্যন্ত সজাগ! যার জন্য তাঁর প্রাসাদে বসবার, শোবার, খাবারঘরে সুগন্ধী নির্যাস ছড়ানো হত। সুগন্ধী কাঠ জ্বালানো হত।

সত্যিই, সেণ্ট হেলেনায় থাকতে হলে নেপোলিয়নকে অনেক সাহস, অনেক শক্তি ধরতে হবে।

লঙ্ উডের বাড়িতে ছিল খাওয়া-শোওয়া ইত্যাদির জন্য খান চারেক ঘর। এ ছাড়া স্নানের ঘর। ঘরের দেয়ালে বাদামী রংএর কাপড় মারা। নোনা লেগে জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। দেয়ালের পাশে

ছিল লোহার খাট, এককোণে ফায়ার প্লেস, তার কাছে একটা সোফা। নেপোলিয়নের অধিকাংশ সময় এই ঘরে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে কাটত। নেপোলিয়ন ম্যাণ্টেলপীসের ওপর সাজিয়ে রেখেছিলেন দুখানা ছবি। একটা মারি লুইজার, আরেকটি ছেলের।

খাবার ঘরখানা ছিল প্রায় অন্ধকার। তার লাগোয়া ছিল এক ফালি ঢাকা জায়গা। সেখানে ছিল বিলিয়ার্ড খেলার একটা পুরনো টেবিল।

বসবার ঘরটিও সাজানো ছিল বৈকি। সেখানে ছিল পোকায়-খাওয়া মেহগনি কাঠের সোফাসেট।

কাছেই ছিল ভৃত্য-পরিচারকদের ঘর। সেই ঘরের ছাদ ছিল ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে চুঁইয়ে পড়ত যখন-তখন ঝরে-পড়া বৃষ্টির জল।

লঙ উডের গোটা বাড়িটা ভর্তি ছিল বাদামী রঙের ইঁদুর। খাওয়ার সময় খাবারঘরে বড় বেশী ছুটোছুটি করত।

রাজার বাড়িই বটে।

চারপাশে গাছপালার সংখ্যা ছিল বিরল। চোখে সবুজ রং বুলিয়ে দিত শুধু কয়েকটি ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ।

শোবার ঘর আর বসবার ঘরের মাপ ছিল চৌদ্দ ফুট লম্বা, বারো ফুট চওড়া। মাথার ওপর ছাদ দশ ফুট উঁচু। কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের "অন্ধকূপ" নামে ঘরখানা কিন্তু এর চাইতে আরেকটু বড় ছিল। তার মাপ ছিল চৌদ্দ ফুট দশ ইঞ্চি চওড়া আর আঠারো ফুট লম্বা। তাই নিয়ে তো ইংরেজদের কত অভিযোগ, কত গল্প-কাহিনী।

ভোর ছ'টায় নেপোলিয়ন ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা বা কফি খেতেন। তারপর দাড়ি কামিয়ে, দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে পোশাক পরতেন। পোশাকের ওপর ছড়িয়ে দিতেন ওডিকোলন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ঘোড়ায় চড়ে একটু বেড়াতে যেতেন। বেলা দশটায় দুপুরের খাওয়া খেতেন। খাওয়ার মেনু ছিল স্যুপ অথবা ডিম মেশানো

গরম দুধ, একটু মাংস, সব্জী, তার সঙ্গে পনীর আর সকলের শেষে এক কাপ কফি।

দুপুরবেলা ঘণ্টা তিনেক ধরে নেপোলিয়ন মুখে মুখে বলে যেতেন তাঁর জীবনকাহিনীর ইতিহাস। একজন টুকে নিতেন। এরপর নেপোলিয়ন স্নান করতেন। বাথ-টবে গলা পর্যন্ত গোটা শরীর ডুবিয়ে থাকতেন ঘণ্টা দেড়েক। ঐ অবস্থাতেই সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করতেন, মনটাকে হাল্‌কা রাখতেন। সন্ধ্যার দিকে আবার বেরোতেন। এবার যেতেন গাড়িতে। বাড়ি ফিরে এসে দুপুরে-লেখা ইতিহাসের অংশটি নিয়ে দেখতেন, সংশোধন করতেন।

নেপোলিয়ন রাতের খাওয়াটা প্রায়ই খেতেন সেণ্ট হেলেনায় তাঁর সঙ্গের সঙ্গী প্রতিবেশীদের নিয়ে। মোমবাতির আলোয় রাতের ডিনারটি নেপোলিয়নের ভালো লাগত।

সেণ্ট হেলেনায় আসবার সময় নেপোলিয়ন সঙ্গে করে এনেছিলেন হাজার দেড়েক বই। রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর প্রায়ই নানা বই থেকে নেপোলিয়ন আবৃত্তি করতেন, ভালো ভালো অংশ পড়ে শোনাতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, এই দ্বীপের অসীম ক্লান্তিময় নির্জনতা কাটাতে অন্ততঃ ষাট হাজার বই দরকার। রাত এগারোটার সময় "শুভ রাত্রি" জানিয়ে তিনি শুতে যেতেন।

সেণ্ট হেলেনায় নেপোলিয়নের গতিবিধি ছিল একেবারে নিয়ন্ত্রিত, অত্যন্ত কড়া দৃষ্টিবদ্ধ। দিনের বেলায় এক শ' পঁচিশজন, রাত্রিবেলা বাহাত্তর জন প্রহরী অতন্দ্র পাহারা দিত খাঁচায় আটকানো সিংহকে। সিংহটি নাকি পালিয়ে যাবার অনেক কৌশল জানে।

নেপোলিয়ন নিজের মনে মাঝে মাঝে বলে উঠতেন, "আশ্চর্য, ওরা আমাকে একমুহূর্তের জন্য ভুলতে দেবে না যে আমি ওদের হাতে বন্দী।"

নেপোলিয়ন যখন প্রথম সেণ্ট হেলেনায় এলেন, তখন ওখানকার ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারীটি ছিলেন অ্যাডমিরাল ককবার্ন। ককবার্ন লোক ভালো ছিলেন। নেপোলিয়ন মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে গল্প

করতেন, হাসতেন, বেড়াতেন। তবে ককবার্ন ছিলেন মাত্র ছ'মাস। তারপর যিনি সেণ্ট হেলেনায় গভর্নর হয়ে এলেন, তাঁর নাম হাডসন লো। নেপোলিয়নের বাকী জীবনের সমসাময়িক ছিলেন এই হাডসন লো। বয়স গোটা ছেচল্লিশ। রোগাটে মুখ। ছিপছিপে চেহারা। ঝুলে-পড়া ভ্রূর নিচে চক্‌চকে, সরু, কোঁচকানো চোখ। মাথার চুল পাঁশুটে। ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ায় স্নেহবস্তুর সঙ্গে হাডসন লো-এর বিশেষ পরিচয় ছিল না। আলাপে-ব্যবহারে ছিলেন অতি ভাবলেশহীন। নেহাত মৌখিক সৌজন্য যতটুকু না দেখালে নয় ততটুকুই দেখাতেন। হাডসন লো জীবনে যুদ্ধ করেছেন অনেক, অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। ফরাসী ও ইতালীয় দু ভাষাতেই কথা বলতে পারতেন। নেপোলিয়ন প্রথমটায় ইতালীয় ভাষায় কথা বলে হাডসনের মনের গতিবিধি বুঝে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। তাঁর আবেগহীন, ঠাণ্ডা ব্যবহারে নেপোলিয়ন পরে মন্তব্য করেছিলেন, "লোকটা সোজা দৃষ্টিতে তাকাতে পারে না। আর মুখ দেখে বোঝা যাবে না ওর মনের মধ্যে কী আছে।" অর্থাৎ হাডসন যে সহজ সরল পথের লোক নন, সেটা নেপোলিয়ন প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। প্রথম প্রথম নেপোলিয়ন হাডসনকে একটু খুশ মেজাজে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে লঙউডের চারদিকে যে সুদীর্ঘ পাঁচিল দেওয়া আছে, তার বাইরেও তিনি একা স্বাধীন ভাবে বেড়াতে পারেন ···। নেপোলিয়ন হাডসন লোর কাছে অনুরোধ জানালেন ঐটুকু স্বাধীনতা তাঁকে দেওয়া হোক।

"আমি ঘোড়ায় চড়ে ইচ্ছেমতো বেড়াতে পারি না, এই দ্বীপের লোকদের সঙ্গে একটু মন খুলে কথা বলতে পারি না, বলুন তো এইভাবে কি শরীর মন ঠিক থাকে? আপনি পারেন না এই নিষ্ঠুর নিয়ম তুলে দিতে!" নেপোলিয়ন বড়ো আশায় হাডসন লো-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হাডসন লো যথারীতি ভাবলেশহীন মুখে উত্তর দিলেন, "এ তো সরকারের নির্দেশ। সরকারের নির্দেশ তো পালন করতেই হবে—।"

"তার মানে আপনি কিছুই করবেন না! আমার এই দেয়ালের বাইরে পা দেবার অধিকার থাকবে না! আমি তা হলে এই ক্লান্তিকর দিনগুলি কাটাব কি করে! আমি এখান থেকে কোন লোকের মুখ দেখি না, গাছপালা, জল···কিছু দেখতে পাই না···।" নেপোলিয়নের কণ্ঠস্বরে অনুনয়, অভিযোগ দুই-ই ঝরে পড়ল।

"আমরা আপনাকে একটা নতুন বাড়ি তৈরী করে দেব তাকে নতুন ফার্নিচার দিয়ে সজিয়ে দেব।" সেই তাপ উত্তাপহীন সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা উত্তর। কী কৌশলেই না নেপোলিয়নের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়া!

নেপোলিয়ন সেদিন চিৎকার করে বলেছিলেন, "আমি সামরিক লোক, আপনিও তাই। আপনি তো জানেন, ফার্নিচার নতুন কি পুরনো, সোফায় ঢাকনা, ভেলভেটের কি সুতীর তাই নিয়ে আমরা সৈনিকরা মাথা ঘামাই না···!"

নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন তাঁর এই উত্তেজনা, এই কথাবার্তা বুঝি হাডসন লো-এর মনের অনুভূতির তারে আঘাত করবে, এই আঘাতে বুঝি সেই তারে কোন নতুন সুর বেজে উঠবে। কিন্তু হায় রে, নেপো-লিয়ন জানতেন না, হাডসনের মনে অনুভূতি-টুতি বলে কিছু ছিল না, তাঁর বে-তার মনে কোন কিছুরই সুর বাজত না। তাই নেপোলিয়নের এত কথার একটিরও কোন উত্তর না দিয়ে হাডসন তাঁর সামনে থেকে নীরবে উঠে চলে গেলেন। নেপোলিয়ন হাডসনের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ঝুলে-পড়া ভ্রূর নিচে বিষ মাখানো দুটি তীরের ফলা।

সামনে এক কাপ কফি ছিল। নেপোলিয়নের মনে হল হাডসন লো-এর চোখের দৃষ্টিতে ঐ কফি বিষিয়ে গেছে। তিনি ভৃত্যকে ডেকে ঐ কফি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বললেন। আর সেদিন থেকে দুজন, দুজনকে বিষের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। ছুঁতো-নাতায় দুজনের সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হতে লাগল। সামান্য কথায় দুজনের মধ্যে ঝগড়া পেকে উঠল। হাডসন লো নেপোলিয়নের সঙ্গে ঠিক বন্দী-শত্রুর মতোই ব্যবহার করতে লাগলেন

এরপর থেকে নেপোলিয়নের ওপর পাহারাদারি আরও কড়া হল। প্রহরীর সংখ্যা আরও বাড়ল। ক্রমে নেপোলিয়নের বিকেলবেলা একা বেরোনোর যে স্বাধীনতাটুকু ছিল, তাও বন্ধ হল। গুপ্ত চক্ষু চারদিক থেকে নেপোলিয়নকে লক্ষ্য করতে লাগল, আর সমানে গভর্নরের কাছে খবর যেতে লাগল, "জেনারেল বোনাপার্ট সীমানার বাইরে বেড়াচ্ছেন," "বোনাপার্ট একা বেড়াচ্ছেন", "বোনাপার্টের সঙ্গে লোক আছে", "বোনাপার্ট আজ অসুস্থ", "বোনাপার্ট আজ সুস্থ..." ইত্যাদি আরও কত কী!

এছাড়া অনুমতি পত্র ছাড়া লঙউডের ধারে কাছে কাউকে আসতে দেওয়া হত না। সেন্ট হেলেনার শহর জেম্‌স্ টাউনের রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল—খবরদার! কেউ যেন ঐ ফরাসী লোকটার সংস্পর্শে না আসে, ওর সঙ্গে কথা না বলে। সমুদ্রে কোন আগত জাহাজের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হত। পাঁচশ' কামান সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হত তাদের কর্তব্য পালনের জন্য। দুখানা জাহাজ সব সময় সজাগ সতর্ক থাকত।

একটা বিশেষ নীল রং-এর ফ্ল্যাগ একেবারে ঠিক করে রেখে দেওয়া হয়েছিল যদি বোনাপার্ট কখনও পালিয়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাগটা ওপরে তুলে দিয়ে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এমন কি নেপোলিয়নের নামে যখন তাঁর এক বন্ধু "১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের ফরাসী দেশ" বলে একখানি বই লিখে উপহার পাঠালেন, সেটি পর্যন্ত হাডসন লো আটকে ফেললেন। অপরাধ সেন্ট হেলেনায় আসবার পর তো নেপোলিয়ন "সম্রাট" ছিলেন না, ছিলেন বড় জোর "জেনারেল", তা হলে কেন ঠিকানায় লেখা হয়েছিল "সম্রাট নেপোলিয়ন"!

ইংল্যাণ্ডের রাজপ্রতিনিধির কাছে নেপোলিয়ন চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন কেমন আছে তাঁর স্ত্রী আর ছেলে। সেই চিঠিখানা পর্যন্ত হাডসন আটকে ফেললেন, মিথ্যে মিথ্যে খবর পাঠাতে লাগলেন নেপোলিয়নের মতিগতি ভালো নয়, কেমন যেন কিছু একটা করবার মতলব...। আর এর পরেই এল নেপোলিয়নের জীবনে, তাঁর ব্যক্তিত্বে

চরম ধাক্কা। নেপোলিয়ন সেদিন বাড়ির সামনে পায়চারি করছিলেন। হাডসন কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঠাণ্ডা, নিরুত্তেজ গলায় বললেন, "লর্ড উডের খরচটা একটু বেশী হচ্ছে। বিশেষ করে খাওয়ার খরচ। ঐটে কমাতে হবে।"

রাগে দুঃখে নেপোলিয়নের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বেরোল না। তারপর চিৎকার করে বললেন "আপনাকে কে বলেছে আমাকে খাওয়াতে হবে! আমি এখনই ঐ সেনানিবাসে চলে যাচ্ছি। গিয়ে বলছি আমি ইউরোপের বয়োজ্যেষ্ঠ সৈনিক। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমরা আমাকে দুটি খেতে দিও।"

নেপোলিয়ন সেখানেই থামলেন না। তিনি আরও বললেন, "মনে রাখবেন যখন ইংল্যাণ্ড থাকবে না, ইউরোপ থাকবে না, যখন আপনাকে সবাই ভুলে যাবে, তখনও সম্রাট নেপোলিয়ন বেঁচে থাকবেন। তাঁকে বন্দী করে রাখবার অধিকার আপনার নেই, আপনি কে! আপনি যদি সত্যিই ইংরেজ হতেন, তা হলে এই ব্যবহার করতে পারতেন না···।"

আশ্চর্য, এত কথার উত্তরে হাডসন লো বললেন, "আপনি আমাকে হাসালেন।"

"আমি আপনাকে হাসালাম?" নেপোলিয়ন ভেবে পাচ্ছিলেন না লোকটার নির্লজ্জতা আর কতদূর যাবে।

"হ্যাঁ, আপনি আমাকে হাসিয়ে ছাড়লেন। আমাকে কি সব বললেন, কত কড়া কড়া কথা ছুঁড়লেন। এই সব দেখে শুনে আমার অনুকম্পা হচ্ছে···যাক সে কথা, আপনার দিন ভালো যাক।"

হাডসন লো চলে গেলেন। তাঁর মুখখানা আগুনের মতো লাল।

এইবার শুরু হল অপমানের পর অপমান, আঘাতের পর আঘাত। লর্ড উডের সীমানা-পাঁচিল সরিয়ে এনে এনে বাড়ির চারদিকের পরিধি সঙ্কুচিত করা হল। নেপোলিয়নের গতিবিধি আরও নিয়ন্ত্রিত হল। চরম অপমান আর সবচাইতে বেদনাময় শাস্তি হল যখন নেপোলিয়নের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় টান ধরানো হল। জেম্স্

টাউন থেকে প্রতিদিন নেপোলিয়ন ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের জন্য যে টাট্‌কা মাংস, টার্কী, ডাকপাখী, মাখন ও বোতল বোতল শ্যাম্পেন আসত, তার জন্য বছরে খরচ পড়ত বিশ হাজার পাউণ্ড। এবার নির্দেশ এল, এখন থেকে নেপোলিয়নের খাদ্য খরচ বাবদ ইংরেজ সরকার দেবে বছরে বারো হাজার পাউণ্ড। তার বেশী খরচ হলে নেপোলিয়ন যেন নিজের গাঁট থেকে দেন।

কিছুদিন পরে হাডসন আবার জানলেন জেম্‌স্‌ টাউনে ফরাসী লোকদের জন্য যে তহবিল ছিল, তা ফুরিয়ে গেছে। এবার কিছু কিনতে কাটতে হলে ওঁরা যেন নগদা-নগদ কেনেন এবং বলাই বাহুল্য পয়সা নিজেদের পকেট থেকে দেবেন।

একটা লোকের নীচতা কতখানি যেতে পারে! নেপোলিয়ন অপমানের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের যা কিছু রুপোর বাসনপত্র ছিল, সব হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে জেম্‌স্‌ টাউনের বাজারে বিক্রি করতে পাঠালেন। এইভাবে শতধা হল রুপোর ঈগল পাখী আর যা কিছু দামী ধাতুর অস্ত্রাদি ছিল অতীতের চিহ্ন স্বরূপ, সব, সব কিছু···

নেপোলিয়ন নাকি খেদের সঙ্গে বলেছিলেন···"এরপর বাকি রইল আমার গায়ের পোশাক···এগুলিও একদিন বিক্রি করতে হবে···।"

এইবার টান ধরানো হল লঙ উডের কয়লা এবং কাঠে। সেণ্ট হেলেনার স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় লঙ উডের বাড়িতে জুতো, জামা, কাপড় সব কিছু ভিজে উঠতে লাগল। কয়লা, কাঠ আরেকটু বাড়ানোর দাবী জানাতে হাডসন লো বাড়তি কয়লার জন্য খরচা দিলেন, কিন্তু কাঠ সম্পর্কে বললেন সেণ্ট হেলেনায় ও জিনিস বাড়ন্ত। সুতরাং অতিরিক্ত কাঠের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। নেপোলিয়ন এবার তাঁর ক্রোধের আগুনে আহুতি দিলেন নিজের খাট আর র‍্যাকের কাঠ। যতক্ষণ ওগুলো পুড়তে লাগল, নেপোলিয়ন জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

অপমান চরমে উঠল যখন ইটালী থেকে মার্বেল পাথরে তৈরী নেপোলিয়নের ছেলের একটি আবক্ষ মূর্তি গোপনে সেণ্ট হেলেনায় পাঠানো হল। ছেলেকে একবারটি শুধু চোখে দেখবার জন্য নেপো-লিয়নের আর্তি সারা ইউরোপবাসীদের কাছে অজানা ছিল না। সেই কথা মনে করে, নেপোলিয়নকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা করে কোন এক সদাশয় ব্যক্তি এই মূর্তিটি পাঠিয়েছিলেন। হাডসন লো মূর্তিটিকে আটকে তো ফেললেনই, উপরন্তু শোনা যায় তিনি নাকি মূর্তিটিকে ভেঙে ফেলারও আদেশ দিয়েছিলেন। এই সব জানতে পেরে নেপোলিয়ন এত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে এই অত্যাচার, অবিচারের কাহিনী জানিয়ে খোদ ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষকে লিখবেন বলে একটা পুস্তিকা লিখতে বসলেন। হাডসন লো তখন বেগতিক বুঝে মূর্তিটা ফেরৎ দিলেন। নেপোলিয়ন ছেলের আবক্ষ মূর্তিটিকে বার বার বুকে চেপে ধরলেন, আদর করলেন, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "এমন জিনিস যে ভেঙে ফেলতে চায়, সে আসল মানুষটিকে পেলে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে···।" তবে এর পরেই নেপোলিয়নের রাগ নিভে গেল, পিতৃস্নেহ সব কিছু ভুলিয়ে দিল ···।

নেপোলিয়ন ক্রমে বাইরে যাওয়া কমিয়ে দিলেন। ইচ্ছে থাকলেও যেতেন না। বড় বিরক্ত লাগত, অস্বস্তি হত। কারণ যখনই বাইরে যেতেন, সঙ্গে যেত প্রহরী, একটু ঘাড় ফেরালেও ওরা ফিরে তাকাত। মনের স্বাধীনতা এইভাবে বিসর্জন দিয়ে আর যাই হোক, মুক্ত বায়ু সেবন করা যায় না। কিন্তু নেপোলিয়ন প্রতিদিন চব্বিশটি করে ঘণ্টা কি করে কাটাবেন!

নেপোলিয়ন হঠাৎ উঠে পড়ে লাগলেন বাগান করার জন্য বাড়ির সামনে, এই রুক্ষ পাথুরে জায়গায় দেখাই যাক না সবুজ কিছু ফলানো যায় কি না। কিছুদিন পরেই দেখা গেল একটা স্ট্রহ্যাট মাথায় দিয়ে, শার্ট-ট্রাউজার পরে, পায়ে লাল চটি দিয়ে নেপোলিয়ন ভোর থেকে মাটি কোপাচ্ছেন, ঘাসের চাপড়া তুলছেন, গাছের বীজ বুনছেন, গাছ পুঁতছেন। মাত্র সাত মাসের মধ্যে বাগানে সত্যিই পরিশ্রমের ফল ফলেছিল। প্রহরীরা তাকিয়ে দেখত আর বিস্মিত হত। কে

বলবে ঐ ফুল-ফোটানো মানুষটি এককালে কামান দেগে গোটা ইউ-রোপকে কাঁপিয়েছে !

এর মধ্যে নেপোলিয়ন তাঁর জীবনেতিহাস সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক—অনেক ঘটনা বন্ধুকে দিয়ে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। অনেক বই পড়েছেন। মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞ হয়েছেন। আর তারই সঙ্গে কানে শুনেছেন ইউরোপের ইতিহাসে কত কী পরিবর্তন হচ্ছে। নেপোলিয়ন ভবিষ্যৎ-বাণী করলেন ইউরোপ মহাদেশের রাজ্যে রাজ্যে একদিন ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবী উত্তাল হয়ে উঠবে। বহুধাবিভক্ত জার্মানী ও ইটালী একদিন জাতীয় ঐক্য লাভ করবে। ইতিহাসে শুধু ইউরোপ নয়, পৃথিবীর অন্য রাজ্য সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। যেমন—ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে, স্বাধীন হবে ইংরেজ অধিকৃত অন্যান্য উপনিবেশ। বলেছিলেন, ঔপনিবেশিক নীতি আর চলবে না। তিনি সেণ্ট হেলেনাতেই লক্ষ্য করেছিলেন মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের বিরুদ্ধাচরণের একটা প্রধান কারণ বর্ণ-বৈষম্য এবং সমস্যা সমাধানের জন্য নেপোলিয়ন বলেছিলেন, প্রতিটি মানুষের দুটো বিয়ে করা উচিত এবং বিভিন্ন বর্ণ থেকে বউ দুটি বাছতে হবে এবং এদের গর্ভে যে সন্তানদের জন্ম হবে, তারা ছোট-বেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হলে তাদের মধ্যে আর কোন বর্ণ-বিদ্বেষ থাকবে না। আর এই ভাবেই বর্ণ-বিদ্বেষ লুপ্ত হবে। রাশিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন, পোল্যাণ্ড যদি রাশিয়ার সঙ্গে থাকে তা হলে রাশিয়া অদমনীয় শক্তির অধিকারী হবে।

নেপোলিয়ন তাঁর চিরশত্রু ইংল্যাণ্ডের প্রশংসা করতেন। প্রশংসা করতেন ইংরেজদের সাহসের, তাদের পার্লামেণ্টারী শাসনের—"তবে বাপু, ইংরেজ চরিত্রে নিষ্ঠুরতাও আছে। দেখো না কেন, ওদের রাজা অষ্টম হেনরী যেদিন তাঁর বউ অ্যান বলিনের মাথা কাটলেন, তার পরের দিনই জেন সেমুরকে বিয়ে করলেন। এমন নিষ্ঠুরতা ফ্রান্সে কখনও হত না…।" ইউরোপীয় ইতিহাসের সব কিছু যেন নেপোলিয়নের চোখের সামনে ফুটে উঠত।

ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নেপোলিয়ন বলেছেন, "বাই-বেলে খুব ভালো ভালো কথা আছে, তবে ঘটনাগুলি বাস্তবগ্রাহ্য নয়, এই যা।" নেপোলিয়ন আরও বলতেন, "জগতে সব বস্তুকেন্দ্রিক, কোনোটা ভালো কোনোটা বা ত্রুটিযুক্ত। আর আত্মা! আত্মা তো অনেকটা বিদ্যুৎ বা চুম্বকের মতো শক্তিসম্পন্ন, যা মানুষকে আকর্ষণ করে। তবে আমি সকলের আগে পুজো করব সূর্যদেবকে। সূর্যই তো জীবনদেবতা, সকল জীব-শক্তির মূল।" নেপোলিয়ন কথাগুলি একটু রসিকতা করে বলতেন সেণ্ট হেলেনায় তাঁর অন্যতম সঙ্গী ধর্মপ্রাণ গুরগাউডকে।

তবে জীবনের শেষ অধ্যায়ে ধর্মচিন্তা তাঁকে কৌতূহলী করে তুলে-ছিল। বিশেষতঃ নরক কী এবং খ্রীস্টধর্মকে না মেনে চললে মুক্তি আছে কি নেই—এই দুটি বিষয় তাঁকে অত্যন্ত জিজ্ঞাসু করে তুলে-ছিল। নেপোলিয়ন. আরেকজন সঙ্গী বার্টর‍্যাণ্ডকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়েছিলেন যাতে সেণ্ট হেলেনায় অতি অবশ্য একজন, শিক্ষিত উদার দৃষ্টিসম্পন্ন যাজককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আর তার সঙ্গে এক-জন ভালো ডাক্তার। বছর দেড়েক পরে নেপোলিয়নের অনুরোধ রক্ষা করা হয়েছিল। দুজন কর্সিকাবাসী যাজককে পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে একজনের বয়স সত্তরের কাছাকাছি জরাগ্রস্ত, কানে শোনেন না, কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যায়, কোন মতে প্রার্থনা বাণী আউড়ে যান। আরেকজন ছিলেন ছোকরা। লেখাপড়া জানতেন সাধারণ। সুতরাং এই দুজনের কেউ-ই ধর্ম সম্বন্ধে নেপোলিয়নের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করার যোগ্যতা নিয়ে আসেননি। আর ডাক্তার হিসেবে যাঁকে নিয়ে আসা হল, তাঁর অভিজ্ঞতা কতখানি! তিনি কর্সিকায় লাশকাটা ঘরে সহকারী কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর গোটা কাজটাই ছিল মৃতদেহ নিয়ে, জীবিত মানুষকে নিয়ে তিনি কোনদিন নাড়াচাড়া করেননি।

এঁদের কাউকেই নেপোলিয়নের ভালো লাগল না। তবু যখন এসেই গেছেন, একটা কিছু করা দরকার। নেপোলিয়ন তাঁর খাওয়ার ঘরটিকেই ধর্মঘর করলেন। সেখানেই প্রতি রাববার নিয়মিত প্রার্থনা

পুস্তক পড়া হত, ধর্মীয় আলোচনা হত অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে সেণ্ট হেলেনার দুঃস্বপ্নের দিনগুলি কাটিয়ে যাওয়া, আর কিছু নয়।

দিন কাটতে লাগল। সময় পার হতে লাগল তীব্র যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে। নেপোলিয়নের অমন পেটাই করা স্বাস্থ্য এতদিন পর্যন্ত এতটুকু ক্ষয়ে যায়নি। কিন্তু তারপরেই সেণ্ট হেলেনার ভিজে অথচ রুক্ষ আবহাওয়া শরীরের মধ্যে কেমন যেন সব বানচাল করে দিল। মাঝে মাঝেই বহুদিনের একটা ব্যথা পেটের ডানদিকটাকে অসাড় করে দিত। এর ওপর আবার চিরকাল ছুটে বেড়ানো কর্মব্যস্ত নেপোলিয়নের প্রতি মুহূর্তের চলাফেরা হাডসন লো-এর রক্তচক্ষুর নিয়ন্ত্রণে এমনভাবে বাধা পেতে লাগল যে তাঁর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খিল ধরে গেল। পেটের ডান দিকের যন্ত্রণা দিন দিন তীব্রতর হতে লাগল। তার সঙ্গে কেমন গা-বমি-বমি ভাব আর মাথা ঘোরা।

ডাক্তার এলেন। ডাক্তার স্টোক, নৌ-বাহিনীর ডাক্তার। স্টোক খুব যত্ন করে খুঁটিয়ে নেপোলিয়নকে দেখলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক কিছু খবর নিলেন। তারপর বললেন—লিভারের অসুখ। হেপাটাইটিস।

"অসুখটা কি খারাপ!" নেপোলিয়ন জিজ্ঞেস করলেন। ডাঃ স্টোক একবার তাকিয়ে দেখলেন শুয়ে থাকা, অসুস্থ 'সম্রাট' নেপোলিয়নকে। তারপর বললেন, "লিভার পেকে গেলে, পুঁজ হলে খারাপ। আরও খারাপ যদি লিভার ফেটে যায় এবং স্টমাকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আর, তাহলে মৃত্যু তাড়াতাড়িই আসবে"।

"অথচ এই অভিশপ্ত জায়গায় না থাকলে আমি আশি বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচতাম"। নেপোলিয়ন হাত দুটি মুঠো করে বললেন।

ডাক্তার স্টোক একটু বেশী যত্ন নিয়ে দেখেছিলেন নেপোলিয়নকে। হাডসন লো-এর হায়না চোখে এটা খুব ভালো ঠেকল না। কয়েকদিন পরে সামরিক বিচারালয়ে স্টোকের ডাক পড়ল। সেখানে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। অতএব তাঁর চাকরি গেল।

এরপর দীর্ঘ আটমাস কেটে গেল বিনা ডাক্তারে, বিনা চিকিৎসায়।

একমাত্র ডাক্তার ছিলেন সেই লাসকাটা ঘর-ফেরত মানুষটি, যাঁর সঙ্গে জীবিত মানুষের কোন সম্পর্ক ছিল না।

১৮২০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস। নেপোলিয়ন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবার রোগের দাপটটা বড় বেশী। সেই লিভারে ব্যথা। নেপোলিয়নের ভাষায়—ছুরি দিয়ে খোঁচানোর ব্যথা। তার সঙ্গে সর্বক্ষণ গা-বমি-বমি। লাশকাটা ডাক্তার এণ্টোমারসিও রায় দিলেন হেপাটাইটিস। আগের থেকে রোগের নাম বোধহয় জানা ছিল। যাই হোক, চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। নেপোলিয়নকে নাকি প্রচুর ব্যায়াম করতে হবে, আর তাঁকে সমানে বিরেচক ওষুধ খেতে হবে। তবে এ রোগ জব্দ হবে।

জব্দ হওয়া দূরে থাক রোগের প্রকোপ আরও বাড়ল। নেপোলিয়নের অমন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, ওজন হ্রাস পেল। নেপোলিয়ন রোগশয্যায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলেন···বড়ো একা, কাছে স্ত্রী নেই, ছেলে নেই, বড়ো একা।

১৮২১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাস। নেপোলিয়নের অসুস্থতা বেড়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত বমি হচ্ছে, কিছু খেলে পেটে থাকে না। পেটের ডান দিকে অসহ্য ব্যথা। স্যুপ, বার্লি আর তার সঙ্গে একটু জেলী, এই হল নেপোলিয়নের বর্তমানে খাওয়ার মেনু। এই খেয়ে মানুষের শরীরে কোন জোর থাকতে পারে না। নেপোলিয়নের চেহারায় শীর্ণতার ছাপ পড়ল।

১৭ই মার্চ। নেপোলিয়ন সামান্য সুস্থ বোধ করে গাড়ি করে বাইরে একটু বেড়াতে গেলেন। এই তাঁর শেষ বেড়িয়ে আসা: সামান্য বেড়ানোটুকুও ঐ শরীরে সহ্য হল না। নেপোলিয়ন বাড়ি ফিরে এসেই শয্যা নিলেন। অবিরত বমি করে করে প্রায় মুমূর্ষু হয়ে পড়লেন। পরের দিন ডাক্তার এণ্টোমারসি এসে নেপোলিয়নকে পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বললেন—গ্যাসট্রাইটিজ, অর্থাৎ অন্ত্রের প্রদাহ। ডাক্তার যখন, তখন ওষুধ নিশ্চয়ই দেবেন। ওষুধ অবশ্য একই রকম, সেই বিরেচক ওষুধ, এবার একটু বেশী জোরালো।

এর পরের অবস্থা অবর্ণনীয়। তীব্র যন্ত্রণায় নেপোলিয়ন ঘরের মেঝেতে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। তাঁর কাতর আর্তনাদে লঙ-উডের ঐ ছোট্ট ঘরটা খান্‌খান্‌ হতে লাগল। নেপোলিয়নের মনে হল অন্ত্রের ভেতরটা কে যেন ক্ষুর দিয়ে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটছে। এণ্টো-মারসি প্রকৃত রোগটা না ধরতে পারলেও নেপোলিয়ন কিন্তু ঠিক বুঝে-ছিলেন—আসলে তাঁর যা হয়েছে, তার নাম ক্যানসার, স্টমাকের ক্যানসার। তাঁর বাবা চার্লস বোনাপার্ট ঐ একই রোগে মারা গেছেন।

রোগশয্যা যে মৃত্যুশয্যা হতে যাচ্ছে, এ বোধ নেপোলিয়নের মনে জেগেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পা-পা করে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। তিনি কয়েকবার বলে ছিলেন, "মৃত্যু আছেই, আমি মরণে ভয় পাই না। মনে শুধু আশংকা মৃত্যুর পর ইংরেজরা আমার দেহটা নিয়ে না ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে একটা প্রদর্শনী দেয়, আর বলে, 'দেখ, আমাদের যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার'।"

ক্রমে লঙ উডের জীর্ণ গায়ে একটা হিম শীতলতা নেমে এল। কেউ জোরে কথা বলে না, কেউ হাসে না। কান্নায়-ভরা বুক চেপে চলাফেরা করছে নেপোলিয়নের সঙ্গী সাথী, তাঁর পরিচারক সেবকেরা।

১৩ই এপ্রিল, ১৮২১। নেপোলিয়ন উইল করলেন। প্রথমটা নিজের হাতে লেখার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, তারপর মুখে বলে গেলেন—"ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী পরিবারের মধ্যে আমি জন্মেছিলাম, সেই বিশ্বাস নিয়েই আমি যাচ্ছি। মৃত্যুর পর আমাকে যেন ফরাসী-দের মধ্যে সীন নদীর ধারে সমাধিস্থ করা হয়।…" উইলের মধ্যে নেপোলিয়ন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী মারি লুইজা যেন তাঁর পুত্রের সবকিছু দেখাশুনো করেন। পুত্র যেন বাপের মতোই বলতে শেখে—সব কিছুই ফরাসীদের জন্য! নেপোলিয়ন শ্রদ্ধা জানালেন মা ল্যাটিজিয়াকে, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানালেন পরিবারস্থ আর সবাইকে। শত্রু, বিরোধী, সবাইকে ক্ষমা করলেন। ইংরেজদের সম্পর্কে বললেন, তাদের মাত্র কয়েকজন শাসক-ব্যক্তির

কর্মনীতির ফলে আজ তিনি অকালে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন, জাতি হিসেবে ইংরেজ নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ নেবে।

একটা ফরাসী ব্যাঙ্কে নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত সঞ্চয় সত্তর লক্ষের কিছু বেশী ফ্রাঁ জমা ছিল। তিনি ছেলেকে কিছু টাকা দিলেন, এ ছাড়া ছেলেকে দিলেন নিজের ব্যবহৃত অস্ত্র, ঘোড়ার জিন, রেকাব, পোশাক ও অসংখ্য বই। সঙ্গী মনথোলনকে দিলেন বিশ লক্ষ ফ্রাঁ, বারট্র্যাণ্ডকে পাঁচ লক্ষ ও ভৃত্য মারচ্যাণ্ডকে দিলেন চার লক্ষ। অন্যান্য পরিচালকদের কিছু কিছু দিলেন। শেষের দিনে বড় বিশ্বস্ত সঙ্গী ওরা, ওদের না দিলে হয়! দিতে তো ইচ্ছে করে আরও অনেককে, যাঁরা সহকর্মী ছিলেন, সেনাপতি ছিলেন, যাঁরা সৈন্য হয়ে যুদ্ধ করেছেন, যাঁরা নেপোলিয়নের সুখে হেসেছেন, তাঁর দুঃখে ব্যথায় সমব্যথী হয়েছেন! উইলের শেষ কটি পাতায় কেবল এঁদের নাম, এঁদের কাজের উল্লেখ। নেপোলিয়ন প্রতিজনকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করেছেন মৃত্যুকালীন এই অভাবনীয় উইলে।

বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়ন, ভলটেয়ার রুশোর শিষ্য নেপোলিয়ন তথাকথিত ধর্মনীতি নিয়ে কখনও মাথা ঘামাননি, ধর্মে বিশ্বাস করেননি। কিন্তু অকূল সমুদ্রের মাঝখানে এই রুক্ষ দ্বীপে লঙ উডের বাড়িতে কিছু দিন বাস করবার পর নেপোলিয়ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে-ছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন জন্মান্তরবাদে। হয়তো নিজের গোটা জীবনটাকে ব্যাখ্যা করে, বিশ্লেষণ করে এই বিশ্বাসই হয়েছিল যে মানুষ যত বড়োই হোক, যতই সে আস্ফালন করুক, আর বিজয়-দম্ভে যতই সে মেদিনী কাঁপিয়ে দিক, সকলের ওপরে সত্য একমাত্র নেমে-সিস—নিয়তি, যে কোন-এক অদেখা অচেনা ঈশ্বরের বিধানে চলে। নইলে নেপোলিয়নের শেষ কটি বছর এমনভাবে কাটবে কেন? কেন তাঁর অন্তিম মুহূর্তের এমন ইতিহাস তৈরী হবে?

নেপোলিয়ন ধর্মযাজককে ডেকে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি ভাবে পালন করতে হবে তার নির্দেশ দিলেন, "আমি ক্যাথলিক, অতি

বিশ্বস্ত ক্যাথলিক খ্রীস্টান। আমার মৃত্যুকালীন অনুষ্ঠানে যেন কিছু ফাঁক না থাকে।”

মনথোলনকে ডেকে তাঁকে দিয়ে একখানা চিঠি মুসাবিদা করে দিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর যেন ঠিক ঐ ভাষাতেই একখানা চিঠি পাঠানো হয় ঐ লোকটাকে, যার নাম হাডসন লো।…“গভর্নর বাহাদুর, অনেকদিন অতি কষ্টকর অসুস্থতা ভোগ করে…তারিখে নেপোলিয়ন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সম্রাটের আদেশে আমি আপনাকে এই সংবাদ দিচ্ছি এবং একই সঙ্গে তাঁর শেষ ইচ্ছাও আপনাকে জ্ঞাপন করছি… ।” কেবল তারিখটি বসানো, আর কিছু না। নেপোলিয়ন নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে রেখে গেলেন।

নেপোলিয়ন বারট্র্যাণ্ডকে কাছে ডাকলেন। তাকে বললেন, মৃত্যুর পর তাঁর ‘হৃৎপিণ্ড’ বা “কলিজা”টিকে মদে ভিজিয়ে সংরক্ষিত করে যেন পারমায় মারি লুইজার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়…“তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তুমি তাঁকে বোলো, আমি তাঁকে চিরকাল ভালো-বেসেছি এবং এই ভালোবাসা-থেকে আমি কখনও বিচ্যুত হইনি… ।”

নেপোলিয়ন জানতেন না, তাঁর “হৃদয়ের” দান মারি লুইজা কখনই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করবেন না। এ দান তিনি ফিরিয়ে দেবেন।

রোগ আরও ভয়ঙ্কর হল। নেপোলিয়নের সত্যিই ক্যানসার হয়েছিল। ক্যানসার পাকস্থলীতে, যার মতো ব্যথা নাকি আর কিছুতে নেই। এই দুর্দমনীয় ব্যথা, তার ওপর অবিরত বমি। কণামাত্র খাদ্যও নেপোলিয়ন পেটে রাখতে পারছিলেন না। অথচ খিদের অনুভূতিটা তো ছিল।

নেপোলিয়ন শীর্ণ হতে শীর্ণতর হতে লাগলেন। কোনদিন খান একটু প্যান কেক, জেলি। কোনও দিন বা একটু মাংস কিমা করে রান্না।

শেষ শয্যায় শুয়েও নেপোলিয়ন ভাবতেন একটু বেশী বেশী খেয়ে শরীরে কি আবার শক্তি ফিরিয়ে আনা যায় না। জীবন, সেই আগেকার কর্মবহুল, উদ্দীপ্ত জীবন, সে কি আর ফিরে আসবে না! ··

কিছুই ফিরে এল না, বরং কত কী হারিয়ে গেল, চলে গেল, ঝরে পড়ল··· !

শেষের কটা দিন শীর্ণ, রুগ্ন নেপোলিয়নের বড়ো শীত করত। পা ছুখানা শীতে যেন জমে যেত। নেপোলিয়ন ভাবতেন কেন এত ঠাণ্ডা! সূর্যদেবের তাপ কি নিভে গেছে! কিছুদিন আগেও তিনি ভোরবেলা উঠে পূবদিকের জানলা খুলে উদীয়মান সূর্যকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন, "সুপ্রভাত সূর্যদেব, আমার অভিবাদন গ্রহণ কর বন্ধু।"

সেই উষ্ণ-হৃদয় বন্ধু কি নিভে গেছেন! তাঁর তাপেই তো নেপোলিয়ন আবার উত্তপ্ত হবেন, আবার উদ্দীপ্ত হবেন!

২৬শে এপ্রিল। ভোরবেলা। নেপোলিয়ন মনথোলনকে কাছে ডাকলেন। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "জানো, জোসেফাইন এসেছিল···।"

"জোসেফাইন এসেছিলেন··· !" মনথোলনের কণ্ঠে বিস্ময়।

"হ্যাঁ, তখনও ভোর হয়নি। জোসেফাইন আমার কাছে এল, আমাকে বলল আবার আমাদের দেখা হবে। আমরা আর কখনো কেউ কাউকে ছেড়ে যাব না।" নেপোলিয়নের শীর্ণ মুখ খুশির আমেজে এক মুহূর্তের জন্য ঝলমলিয়ে উঠল। মনথোলন বুঝলেন আর বেশী দেরী নেই। ওপারের ছায়া এবার নেপোলিয়নকে ঢেকে ফেলেছে। ডাক এল বলে।

২৭শে এপ্রিল। নেপোলিয়ন বীভৎস বমি করলেন। কফির তলানির মতো গাঢ় রং। সন্দেহ হল স্টমাকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে বমির রং ঐরকম।

নেপোলিয়নের পা ছুটো এত ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে গরম তোয়ালে দিয়ে পায়ের ওপর চেপে ধরা হল। আর ব্যথা! ব্যথার যে উপশম হয় না। পেটের মধ্যে এতো ব্যথাও আছে!

নেপোলিয়ন ছটফট করতে লাগলেন। সঙ্কীর্ণ শয্যাটি মনে হলো অসহ্য। "বাতাস—একটু বাতাস চাই। এই ঘরে এতটুকু হাওয়া নেই। আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে চল···" নেপোলিয়ন একটু হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অনুরোধ করলেন। পরদিন সবাই ধরাধরি করে

নেপোলিয়নকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। নেপোলিয়ন ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে এলেন।

২৯শে এপ্রিল। বমির ভয়াবহতা আরও বেড়ে গেল। নেপোলিয়ন সেদিন আটবার বমি করলেন। নেপোলিয়নের দেহ থেকে সব কিছু যেন নিংড়ে বেরিয়ে গেল। অবসন্ন, মুমূর্ষু নেপোলিয়ন বার বার জল খেতে চাইলেন। একটু কমলা ফুলের মধু দেওয়া হল। নেপোলিয়ন মুখ বিকৃত করলেন। ভালো লাগছে না। একটু কফি খেতে ইচ্ছে করছে। ডাক্তারের নিষেধ। কফি কিছুতেই না।

"একটু দাও, এক চামচ…"

সামান্য এক চামচ কফির জন্য নেপোলিয়নের এই আকুতিতে বারট্র্যাণ্ডের চোখে জল এল। এই নাকি সেই শালপ্রাংশু সিংহবাহু নেপোলিয়ন।

"কি খাব, বাদামের শরবত, না লেমনেড!" নেপোলিয়ন বাচ্চা ছেলের মতো জিজ্ঞেস করলেন বারট্র্যাণ্ডকে।

"বাদামের শরবত একটু ভারী…" বারট্র্যাণ্ড উত্তর দিলেন।

"লেমনেড ভাল, তাই না… !"

"হ্যাঁ…।"

"চেরী ফল দিয়ে তৈরী কোনো পানীয় নেই… !" নেপোলিয়নের বড় প্রিয় চেরী ফল।

"হ্যাঁ, আছে…" বারট্র্যাণ্ডের গলা রুদ্ধ হয়ে আসে নেপোলিয়নের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে। কী ব্যথা আর কী খিদে নেপোলিয়নের পেটে! তাই খাওয়া নিয়ে এত কৌতূহল, এত জিজ্ঞাসাবাদ।

"আচ্ছা, আপেলের কোনো পানীয় হয়?"

"হয় ‥।"

"নাসপাতির… ?"

"তাও হয়…"

"আর আখরোটের ?"

"না, আখরোটের কোনো পানীয় হয় না।"

নেপোলিয়ন আবার জিজ্ঞেস করলেন চেরী ফল দিয়ে কোনো পানীয় হয় কিনা। কতবার যে নেপোলিয়ন এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করে চললেন, তার ঠিক নেই। কোন্ পানীয়টা ঠাণ্ডা, যা খেলে তাঁর খিদে যাবে, জ্বালা যাবে!

৩রা মে। নেপোলিয়নের অবস্থার আরও অবনতি হল। ডাক্তারের নির্দেশে ধর্মযাজকরা মৃত্যুকালীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করলেন, "হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি তোমার সেবকের আত্মার মুক্তি দাও যেমন দিয়েছিলে মিশরীয় রাজা ফারাওয়ের হাত থেকে মোজেসের আত্মার মুক্তি। হে ঈশ্বর, তুমি একদা যেমন সাধু পিটার ও সাধু পলকে কারাগৃহ থেকে উদ্ধার করেছিলে তেমনি—তোমার এই সেবককে উদ্ধার কর।"

৪ঠা মে। সেদিন সকাল থেকে আরম্ভ হল অঝোর ধারায় বৃষ্টি। তার সঙ্গে উত্তাল ঝোড়ো হাওয়া। সমস্ত দিন নেপোলিয়ন বুকের ওপর হাত দুখানা জড়ো করে, নিথর হয়ে শুয়ে রইলেন। রাত থেকে শুরু হল আরেকটি উপসর্গ। প্রচণ্ড হিক্কা। তার সঙ্গে ভুল বকা। সকলেই বুঝলেন, এখন শুধু অপেক্ষা করা, শুধু মুহূর্ত গোণা। নেপোলিয়ন দু'বার জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ছেলের নাম কী?" কাছে অপেক্ষমান ভৃত্য কান্না চেপে উত্তর দিল ·· "আপনার ছেলের নাম নেপোলিয়ন।"

নেপোলিয়ন মাঝে মাঝেই ভুল বকে যাচ্ছেন। তারই মধ্যে মনথোলন একবার শুনলেন, নেপোলিয়ন বলছেন, "ফ্রান্স,···সেনাবাহিনী···জোসেফাইন···।" এর পরেই নেপোলিয়ন অত্যন্ত ছটফট করে উঠলেন।

৫ই মে। নেপোলিয়ন সকাল থেকে বড় বেশী শান্ত, বড় নীরব। প্রথমদিকে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছিল অতি ধীরে, অতি মৃদুভাবে। দিনের আলো ক্রমে ম্লান হয়ে আসতে লাগল। মনথোলন এক টুকরো স্পঞ্জ চিনির জলে ডুবিয়ে বার বার ভিজিয়ে দিতে লাগলেন নেপোলিয়নের শুকনো দুটি ঠোঁট। একটু পরে নেপোলিয়ন জোরে জোরে নিঃশ্বাস

নিতে লাগলেন। শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হল। নেপোলিয়নের ডান হাতখানা বিছানার বাইরে ছড়ানো ছিল। চোখ দুটি ছিল স্থির, অপলক। মুখখানা শান্ত—যন্ত্রণার কোন চিহ্নই সেখানে ছিল না। গোটা দেহটা ছিল নিশ্চল, নিস্তেজ।

পাঁচটা একচল্লিশে সূর্য অস্ত গেল। দূর থেকে একবার কামানের আওয়াজ শোনা গেল। নেপোলিয়ন জোরে একটা নিশ্বাস ফেললেন। আরও দু তিনবার। তারপর আর না। আর কোনোদিনই নেপোলিয়ন নিশ্বাস ফেলবেন না। ডাক্তার এণ্টোমারসি নেপোলিয়নের চেয়ে-থাকা শান্ত, অপলক চোখদুটি আস্তে বুজিয়ে দিলেন। ঘড়ির কাঁটা অচল করে দিয়ে শেষ মুহূর্তটিকে ধরে রাখলেন।

সময়টা ছিল বিকেল পাঁচটা উনপঞ্চাশ।

তারিখ—৫ই মে, ১৮২১ খ্রীস্টাব্দ।

বয়স—বাহান্ন, তাও পুরো হয়নি।

হাডসন লো খবর পেলেন সেদিনই। এলেন পরদিন। খাটের ওপর নেপোলিয়ন শেষ শয্যায় শায়িত, হাডসন লো-এর চির-অবাধ্য বন্দী। বন্দী এখন নিস্তেজ নিদ্রিত। হাডসন লো এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, তবু নেপোলিয়ন উত্তেজিত হচ্ছেন না, হাডসন লো-কে তাতিয়ে দিচ্ছেন না। হাডসন লো-এর মাথা নত হল···আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ কর বন্ধু, সেণ্ট হেলেনার বড় উদ্ধত, বড় গর্বিত আপোষহীন বন্দী···।

পোস্টমর্টেম হল। শব ব্যবচ্ছেদ। সম্রাটের অন্তিম ইচ্ছা তাই-ই ছিল, "আমার মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখো, আমার সত্যিই ক্যানসার কিনা। যদি ক্যানসার হয়ে থাকে, তাহলে আমার অন্তিম অনুরোধ রইল তোমরা আমার ছেলেকে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করবে। এই রোগের বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রতিকার ব্যবস্থা নেবে। আমার ছেলে যেন সুস্থ দেহে বেঁচে থাকে।"

পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে জানা গেল ক্যানসারের দংশনে পাকস্থলীতে মারাত্মক ক্ষত বেড়ে গিয়ে অন্ত্রের গায়ে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কী নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে সম্রাট নেপোলিয়ন মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন ভাবা যায় না।

ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রে নেপোলিয়নের মৃত্যু সংবাদ বেরোল। ছবি ছাপা হল। "এই নেপোলিয়ন! এত সুন্দর! এত প্রশান্ত...!"

ইংল্যাণ্ডবাসীদের এই মন্তব্য ছিল স্বতঃপ্রণোদিত। তারা দেখলো নেপোলিয়ন শয়তান নন, দানব নন, নেপোলিয়ন অর্ধেক ইউরোপীয়, অর্ধেক নিগ্রোও নন। নেপোলিয়ন শক্তিমান, নেপোলিয়ন সম্রাট।

এবার সমাধি। মরদেহটিকে ম্লান-হয়ে আসা, রং-জ্বলে-যাওয়া, কত ব্যবহৃত, পুরনো অতি প্রিয় সামরিক সবুজ কোটটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। বহু যুদ্ধ বহু বিজয়কাহিনীর সাক্ষী আরেকটি সামরিক পোশাক দিয়ে নেপোলিয়নের পায়ের ওপর ঢাকা দেওয়া হল। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের নৌসেনাবাহিনী, স্থল-সেনাবাহিনী, সামরিক কর্তা-ব্যক্তিরা সব এসে দাঁড়ালেন। মাথা নত করলেন। মৃত্যুর পরেও মুখে এত মহত্ত্ব থাকে!

সামরিক কর্মচারীরা হাঁটু গেড়ে বসে ওষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করলেন নেপোলিয়নের পায়ের ওপর মেলে-দেওয়া আচ্ছাদনীটি। চোখ জলে ভিজে উঠল। এই নাকি সেই মহাত্রাস সৃষ্টিকারী দুর্দান্ত নেপোলিয়ন...! কোন মানুষ পারে এত নিশ্চিন্ত, এত সুন্দর মুখে শেষ মুহূর্তটিকে বরণ করতে?

মেহগনি কাঠের কফিনে সাটিনের চাদর বিছিয়ে নেপোলিয়নকে তার ওপর ধীরে ধীরে শুইয়ে দেওয়া হল। দেহের পাশে রইল ঈগল পাখী ক্ষোদিত কাঁচের আধারে নেপোলিয়নের "হৃদয়", পাঠিয়ে দেওয়া হবে মারি লুইজার কাছে, অবশ্য যদি তিনি স্বামীর "হৃদয়" গ্রহণ করতে চান। পাশে রাখা হল "নেপোলিয়ন" নামাঙ্কিত মুদ্রা আর

নেপোলিয়নের শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁর তরবারি। স্থানীয় গির্জার মধ্যে কফিনটি রাখা হল।

এবার মাটিতে আশ্রয় নেবেন অগ্নিগর্ভ মানুষটি। নির্বাচিত স্থানটি বড় সুন্দর। নেপোলিয়নের বড়ো পছন্দের জায়গা। উইলো গাছে ঢাকা এক টুকরো শান্তশ্রী জমি। একদিকে ঝিরঝির করে একটি ছোট্ট ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। নাম টরবেট ঝর্ণা। নেপোলিয়ন এই ঝর্ণার জল পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন। সেখানে উইলো গাছের ছায়ায় মাটি খোঁড়া হল। গভীর হল বারো ফুট। চারপাশে খানকতক বড়ো বড়ো পাথর সাজিয়ে দেওয়া হল।

মে মাসের সেদিন ন' তারিখ। বেলা তখন দশটা। পরিষ্কার দিন। সূর্য দেব সেদিন বড় উজ্জ্বল। তাঁর ভক্ত-উপাসকের দেহ যেন আতপ্ত হয়, তাঁর আত্মা যেন উদ্দীপ্ত হয়। চার ঘোড়ায় টানা শববহনকারী গাড়িটি গির্জা থেকে বহন করে নিয়ে এল নেপোলিয়নের কফিনটিকে। তাকে অনুসরণ করল নেপোলিয়নের শেষ জীবনের প্রিয় ধূসর বর্ণের ঘোড়া শেখ। রাস্তার দু পাশে অপলক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছিল ইংরেজ সেনানী! মৃতের প্রতি সম্মানার্থে তারা বন্দুকের অগ্রভাগ মাটির দিকে নিচু করে রেখেছিল। তাদের ব্যাণ্ডের অন্তিম কালীন বাজনায় সকলের চোখ বাষ্পঘন হল। যাজক মন্ত্র পড়লেন। আরও কিছু অনুষ্ঠানের পর কফিনটি ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হল মাটির নির্দিষ্ট গভীরে। সূর্য তখন মধ্যগগনে। সবটুকু তাপ যেন ছড়িয়ে পড়ে ঐ মাটিতে।

সেনাবাহিনী ঊর্ধ্ব আকাশে তিনবার গুলি ছুঁড়ল। দুর্গ এবং জাহাজ থেকে তোপ-ধ্বনি হতে লাগল। রাজমিস্ত্রী গাঁথুনি শেষ করল। কফিন সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ল। গার্ড অব অনার দেওয়া হল। মৃত আগ্নেয়গিরি সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে আবার যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, এবার নিভে গেল। উইলো গাছ নীরব কান্নায় ছায়া হয়ে তাকিয়ে রইল সমাধির মাটিটুকুর দিকে।